শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত

শ্রীশশিভূষণ বসু
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক
ইণ্ডিয়া প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ ১৯২১

[মূল্য আড়াই টাকা

প্রকাশক

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

প্রাপ্তিস্থান

১। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

ও

২। ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্

২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ-পত্র

অশেষ গুণান্বিত

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস

মহোদয়েষু—

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আপনি গুরুতর বিষয়কার্য্যে নিয়ত লিপ্ত থাকিয়াও ভক্তিধর্ম্ম সাধনে যেরূপ অনুরাগী হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অধুনা বঙ্গদেশে অতি বিরল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনার ন্যায় সুশিক্ষিত, কর্ম্মশীল, ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষের প্রভাবে বঙ্গীয় সমাজে ক্রমে ভক্তির অমৃতধারা প্রবাহিত হইবে। আমি সম্প্রতি ভক্তচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের একখানি জীবনী প্রস্তুত করিয়াছি। আপনাকেই যোগ্যপাত্র মনে করিয়া, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম।

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩২১

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
শ্রীশশিভূষণ বসু।

ভূমিকা

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত প্রকাশিত হইল। গৌর-লীলার অমৃত-ময়ী কাহিনী যখনই পাঠ করিয়াছি তখনই প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে জন্য অনেক দিন হইতে সাধারণের পাঠোপযোগী শ্রীগৌরাঙ্গের একখানি জীবনচরিত প্রণয়নে বাসনা ছিল। এত দিনের পর সে বাসনা কথঞ্চিৎ রূপে পূর্ণ হইল।

পুস্তকখানি প্রণয়নে আমি পূজ্যপাদ আদি বৈষ্ণব গ্রন্থকার-গণের রচিত গ্রন্থাবলী ও বর্ত্তমান সময়ের শ্রীচৈতন্যের চরিতাখ্যায়ক মহোদয়দিগের পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি; সেজন্য তাঁহাদের সকলেরই নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। পুস্তকখানি পাঠে যদি কেহ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার অমৃতাস্বাদনে নিজেকে সুখী মনে করেন, তাহা হইলে শ্রম সফল মনে করিব।

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩২১

গ্রন্থকার

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রায় দুই বৎসর হইল, ইহার সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে ইহার অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অনেকেই ইহার প্রথম সংস্করণ পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন, এবং বিশিষ্ট মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে উহার সন্তোষজনক মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, ইহার বর্ত্তমান সংস্করণেও সে সফলতা দর্শন করিয়া সুখী হইব।

৩এ, রাধাপ্রসাদ লেন
কলিকাত
১৩২৮

গ্রন্থকার

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

একোনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সূচীপত্র

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক দেশের অবস্থা

গৌর যখন দ্বাদশ বৎসরের বালক, তখন পাঠানবংশীয় হুসেন সা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজাশাসন করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু রাজত্ব তখন লুপ্তপ্রায়। ভারত তখন যবন অধিকারে অধিকৃত। হিন্দু রাজারা তখন মুসলমান রাজাদিগকে কর দান করিতেন, সেজন্য তাঁহাদিগের স্বাধীনতা একবারে নষ্ট হইত না, তাঁহারা অনেক স্থলেই আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন।

তখন মুসলমান রাজাদিগের অধীনে, কাজিরা, রাজপ্রতিনিধিরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেন। সুয়েদ হুসেন সা যখন বঙ্গের রাজা, তখন নবদ্বীপে চাঁদ কাজি নামে একজন রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেন। হুসেন সা চরিত্রের মাধুর্য্য গুণে, হিন্দু, মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কাঁজিরা সময়ে সময়ে বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবদিগের অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিতেন না, চাঁদ কাজিও, নবদ্বীপ-

বৈষ্ণবদিগের বাড়ীতে গমন করিয়া কীর্ত্তনের সময় তাঁহাদের খোল করতাল কাড়িয়া লইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, এবং যাহাতে তাঁহারা আর হরিনাম কীর্ত্তন না করেন, সেজন্য নানাপ্রকারে তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেন। হুসেন সার গুণে এসকল অত্যাচার হইতে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়া মুক্তভাবে ঘরে বাহিরে কীর্ত্তনের অধিকারী হইয়াছিলেন। পাঠক পুস্তকের স্থলবিশেষে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সময় যখন বঙ্গদেশ যবন করে কবলিত তখন উড়িষ্যায় স্বাধীনতার সূর্য্য একবারে অস্তমিত হয় নাই, তখনও উড়িষ্যার রাজাদিগের সহিত মুসলমানদিগের সংগ্রাম চলিতেছে। তখন উৎকলের সীমা অতিক্রম করিলেই, যবনাধিকৃত রাজ্যে পদার্পণ করিতে হইত। গৌর যখন উৎকল রাজ্যে কিছুকাল অবস্থানন্তর শিষ্যবৃন্দ সহ বৃন্দাবনধামে যাত্রা করেন, তখন উড়িষ্যাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাদিগকে নৌকা করিয়া কয়েকজন বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী লোক সমভিব্যাহারে কোন নিরাপদ স্থান পর্য্যন্ত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আইন কানুন সম্বন্ধে এই দেখা যায়, এখনকার ন্যায় সে সময়ে ফৌজদারি, দেওয়ানি, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিচার-পদ্ধতির ব্যবস্থা ছিল না। রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তিনিই আপনার বুদ্ধি ও বিবেচনানুসারে সকল প্রকার অভিযোগেরই বিচার করিতেন। তাঁহার বিচারই চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া গৃহীত হইত।

সমাজসংস্কার বিষয়ে তখন অপেক্ষা এখন অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা আমরা সকলেই দর্শন করিতেছি। পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে দেখা যায়, এখনকার ন্যায় প্যাণ্টালুন কোট সার্ট তখন প্রচলিত হয় নাই, লোকের পরিধেয় বস্ত্র জানুর ঊর্দ্ধেই অবস্থিতি করিত। বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে গোলপাতার ছাতি ব্যবহার করিত। এখনও অনেক পল্লীতে তাহা দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকেরা এখনকার ন্যায় সেমিজ জ্যাকেট

প্রভৃতি ব্যবহার না করিলেও ভদ্র গৃহের মহিলারা পরিধেয় বস্ত্রের উপর গায়ে ওড়না ব্যবহার করিতেন, তখন উহাকে দোগজা বলা হইত।

অলঙ্কারাদি বিষয়ে তখন নারীরা শাঁখা প্রভৃতি ও রূপার গহনা ব্যবহার করিতেন, অবস্থাপন্ন লোকের রমণীরা স্বর্ণালঙ্কারে অঙ্গ সুশোভিত করিতেন। কিন্তু এখনকার ন্যায় স্বর্ণালঙ্কার যে তখন প্রচলিত ছিল, তাহা বোধ হয় না। এখনও অনেক পল্লীতে নারীরা হস্তে কণ্ঠে ও পদযুগলে রজত-নির্ম্মিত অলঙ্কারই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জন্য অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে যে বিশেষ প্রভেদ ঘটিয়াছে, এমন মনে হয় না।

অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী সীতাদেবী যখন ডুলি করিয়া শিশু-গৌরকে দেখিতে যান তখন তিনি কিরূপ বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহার করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃতে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগৎ বন্দিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী ;
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা(১), চলে উপহার লঞা(২),
দেখিতে বালক শিরোমণি।
সুবর্ণের কড়ি বাউলি(৩), রজত পত্র পাশুলি(৪),
সুবর্ণের অঙ্গদ(৫) কঙ্কণ(৬) ;
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক(৭),
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ।

(১) পাঞা—পাইয়া, পেয়ে (২) লঞা—লইয়া, লয়ে।

(৩) কড়ি বাউলি—কানের গহনা বিশেষ।

(৪) পাশুলি—পাঁইজোড়, পায়ের গহনা বিশেষ।

(৫) অঙ্গদ—বাজু। (৬) কঙ্কন—হাতের গহনা বিশেষ :

(৭) মলবঙ্ক—বাঁকা মল।

ব্যাঘ্রনখ হেম জড়ি(১), কটি পট্টে সূত্র ডোরি,
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্র বর্ণ পট্ট শাড়ী, ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি(২),
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন;
দূর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন(৩), হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিঞা(৪);
বস্ত্র গুপ্ত দোলা(৫) চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কারে পেটরা ভরিয়া;
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচীগৃহে হইল উপনীত।”

খাদ্য বিষয়ে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। তখনও বঙ্গের লোকেরা ডাল, মোচার ঘণ্ট, সুক্ত, পায়স ও পিষ্টকাদি যেমন ভোজন করিত, এখনও আমাদের গৃহে আমাদের ভোজনের জন্য, এসকল দ্রব্য সেইরূপই প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে সে সময় এখনকার ন্যায় পোলাও, কালিয়া, খাজা, গজা, মিহিদানা প্রভৃতির কোনই প্রচলন ছিল না। থাকিলে, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইতাম।

তখনকার সহিত এখনকার শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, দেখা যায়, তখন অসংখ্য লোকের মধ্যে মাতৃভাষার বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয়

(১) ব্যাঘ্রনখ হেম জড়ি ইত্যাদি—সোনা দিয়া বাঁধান ব্যাঘ্রনখ সূত্রদ্বারা গাঁথিয়া কোমরপাটার ন্যায় কোমরে পরিত।

(২) ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি—রেশমের পাইড় লাগান চাদর।

(৩) গোরোচন—গো মস্তকস্থিত শুষ্ক পিত্ত।

(৪) ভরিঞা—ভরে। (৫) বস্ত্র গুপ্ত দোলা—বস্ত্রাচ্ছাদিত ডুলি।

ঘটিবার কোন ব্যবস্থা ছিল বলিয়া, বোধ হয় না। অধিকাংশ লোকেই নিরক্ষর ছিল। উচ্চবংশের অল্প সংখ্যক লোকেরা আপনাদিগের পুত্রকে পার্শী শিক্ষা দিবার জন্য মৌলবিদিগের পাঠশালায় প্রেরণ করিতেন। যে সকল ব্রাহ্মণ পৌরহিত্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা দেবদেবীর পূজার মন্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া, যজমানদিগের বাড়ীতে গমন করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক দেবসেবার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বেড়াইতেন। ইঁহাদের মধ্যে অল্পলোকেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা অবশ্য অধ্যাপকদিগের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হইত। যখন পুরুষদিগের মধ্যে অজ্ঞানতার এতই প্রাদুর্ভাব, তখন বঙ্গ মহিলারা যে অজ্ঞানতার ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিলেন, তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই বোধ হইতেছে। চারি শত বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষা সম্বন্ধে কি ঘোর পরিবর্ত্তনই সংঘটিত হইয়াছে; যে শিক্ষাতে নরনারী জ্ঞানচক্ষু লাভ করে,—মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ ধরিতে সমর্থ হয়; সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য আজ কত দেশ-সংস্কারক দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে সকল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার জ্যোতিঃ প্রবেশ করিতেছে, দেশের সাধারণ ও ভদ্র লোকদিগের জন্যও নানাস্থানে বিদ্যামন্দির সকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। পুরুষদিগের শিক্ষার সঙ্গে নারীদিগকেও সুশিক্ষিত করিবার নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইতেছে, সহরে ও গ্রামে বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সেকালের সঙ্গে একালের শিক্ষা বিষয়ে যে ঘোর যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তবে নারী জাতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই দেখা যায় যে, মুসলমানদিগের শাসনকালাবধি আর্য্যনারীদিগকে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বাড়ীর অন্তঃপুরেই বাস করিতে

হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের সময়েও সেইরূপ পর্দানশিন্ হইয়াই তাঁহারা বাস করিতেন। এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন নারীরা সামাজিক অনেক বিষয়ে প্রকাশ্য-ভাবে, পুরুষদিগের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্পই বলিতে হইবে।

তখন বাঙ্গালা ভাষার অতি শৈশবাবস্থা। লোকে মাতৃভাষায় কথা বলিত বটে, কিন্তু বহু সংখ্যক লোক পত্রাদি লিখিতে সমর্থ হইত না। চণ্ডীদাস,বিদ্যাপতি প্রভৃতি কয়েকজন গৌর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের সুললিত কবিতা দ্বারা, বঙ্গবাসীর চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেন, কিন্তু গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের কাল হইতেই আমাদের মাতৃভাষা ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

অন্য অনেক বিষয়ে তখন আমাদের প্রিয় বঙ্গভূমি পশ্চাতে থাকিলেও মানব জীবনের যে প্রধান সৌন্দর্য্য—সরলতা, অমায়িকতা, বিনয়, সৌজন্য, প্রভৃতি গুণ সকল তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট রূপেই বিরাজ করিত। অতিথি সেবা, তখন গৃহস্থেরা একটা পারিবারিক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াই মনে করিত। গৃহস্বামী বা গৃহিণীর আহারের পূর্ব্বে মধ্যাহ্ন কালে কেহ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা ফলমূলাদি আহার করিয়াও, আপনাদের ক্ষুধার অন্ন তাঁহাদিগকে দান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। বিবিধ কারণে এখন আমাদের আর সে দৃশ্য দেখিবার উপায় নাই; তবে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে এ দৃশ্য একেবারে বিরল বলিয়া মনে হয় না। অনেক প্রাচীন প্রাচীনারা অতিথি সেবা এখনও পরমধর্ম্ম, বলিয়া তাহার অনুষ্ঠানে বিরত থাকেন না।

তখনকার সহিত নরনারীর নৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা

করিলে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এরূপ মনে হয় না। তখনও জাল, জুয়াচুরি, পরদারগমন প্রভৃতি যেমন ছিল, এখনও সেইরূপই দৃষ্ট হয়। তবে তখন অপরাধীর, সমাজ কর্ত্তৃক শাস্তির ব্যবস্থা হইত; এখন তাহা অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। মানবের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার প্রভাবে শাসন-দণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। গৌতম বুদ্ধের তিরোভাবের পর হইতেই পুরাণকর্ত্তাদিগের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কল্পনা-প্রভাবে ভারতে দেবদেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হয়, এবং এই পৌরাণিক মূর্ত্তি পূজা হইতেই ধীরে ধীরে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সূর্য্যোপাসকেরা সৌর, গণপতির উপাসকের গাণপাত্য, শিবের উপাসকেরা শৈব; বিষ্ণুর উপাসকেরা বৈষ্ণব, ও শক্তির উপাসকেরা শাক্ত নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই প্রভাব প্রবল হইয়া উঠে। আবার-তন্মধ্যে শাক্তেরা প্রবলতর হইয়া শত শত লোককে আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভারতের বৈদিক আর্য্যঋষিরা প্রকৃতির চারিদিকে সেই আদ্যাশক্তিকে দর্শন করিয়া, তাঁহারই পূজায় রত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল শক্তিমন্ত্রের *সাধকেরা, তন্ত্র শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন।* এই তন্ত্র শাস্ত্রগুলি যে ঠিক কোন্ সময়ে, কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এই শক্তি-উপাসকেরা দুই ভাগে বিভক্ত। পশ্বাচারী ও বীরাচারী বা বামাচারী। যাঁহারা দেবদেবীর পূজা, হোম, বলিদান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাঁহারা পশ্বাচারী, ও যাঁহারা মদ্য, মাংস, ও গণিকা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা বীরাচারী বা বামাচারী বলিয়া অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ বলেন, তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। থাকিতে পারে, কিন্তু এই শেষোক্ত বামাচারী তান্ত্রিক সাধকেরা জীবনে

তাহার পরিচয় দান করিতে সমর্থ হন নাই। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে চারিদিকে তন্ত্রোক্ত সাধনার প্রভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চমকার সাধনার দৃষ্টান্তে বঙ্গদেশে কদাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, অপক্ষপাতী নীতিবান ব্যক্তিরা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

একদিকে যেমন শাক্তেরা লোকদিগকে আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে লাগিলেন, অপর দিকে বিষ্ণূপাসকেরাও ভক্তি-ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য, তেমনি প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য, চারিজন ভক্তিধর্ম্ম বিস্তারের জন্য আপনাপন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সকলেরই উদ্দেশ্য, সরস ভক্তিভাব দেশ মধ্যে বিতরণ করা।

এই বৈষ্ণবাচার্য্যেরা যে তৎকালীন তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালীর গতি-রোধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মতের বিরুদ্ধেও ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহাদিগের জীবনপ্রদ ভক্তি-ধর্ম্মের মত দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দেশও সে প্রভাব গ্রহণে বঞ্চিত রহিল না। মধ্বাচার্য্য মঠের পরম ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী বঙ্গদেশে শান্তিপুরে আগমন করতঃ গুণানুরাগী ধর্ম্মনিষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য্যকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অদ্বৈতকে ভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া, মাধবেন্দ্রপুরী শক্তিমন্ত্রে উপাসিত শুষ্ক বঙ্গভূমিতে যেন প্রেমের বন্যা বহিবার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গেলেন।

তখন লোকের ভূত, প্রেত ও ডাইনিতে খুব বিশ্বাস ছিল; কোন নারী মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হইলে অনেক সময় উহা অপদেবতারই কার্য্য বলিয়া লোকে মনে করিত; এবং সে অপদেবতার হস্ত হইতে, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য, সে নারীর প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হইত। ওঝারাই ভূত ছাড়াইবার জন্য আহূত হইতেন। লোকে সর্পের ভয়ে

বিষহরির পূজা দিত; এবং কবির লড়াই ও মঙ্গলচণ্ডীর গান শ্রবণে অপার আনন্দ অনুভব করিত।

অনেক পরিবারে সত্যনারায়ণের কথা হইত। লোকে অতি নিষ্ঠার সহিত তাহা শ্রবণ করিত। কথা শেষ হইলে, ময়দা ও গুড় মিশ্রিত সিন্নি প্রস্তুত হইত। শ্রোতারা তাহা ভক্তি পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেন।

তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বড়ই প্রবল প্রতাপ ছিল। লোকে ব্রাহ্মণদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিত। তাঁহারাও নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ব্রাহ্মণদিগের সহিত কোন নিম্নবর্ণের লোকের কোন বিষয়ে মনান্তর বা বিবাদ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণেরা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন, এবং আপনাদিগের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া, বিরোধীকে অভিসম্পাৎ করিতেন। অজ্ঞ লোকেরা তাহা অব্যর্থ মনে করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িত। তখন ব্রাহ্মণেরাই সমাজের সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন। সমাজের ধর্ম্ম নিয়ম পরিচালনের ভার তাঁহাদিগেরই উপর ন্যস্ত ছিল। কেহ কোন প্রচলিত ধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে তাহার শাসনের ব্যবস্থা তাঁহারাই করিতেন। প্রায়শ্চিত্তের বিধি তাঁহারাই বিধান করিতেন।

তখনকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা স্মরণ করিলে শরীর যেন শিহরিয়া উঠে। সুবুদ্ধি রায় যখন গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন, তখন হুসেন সা, তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন; তাঁহার কোন অপরাধের জন্য রাজা সুবুদ্ধি রায় হুসেনের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করেন। কালের অপূর্ব্ব গতি! পরে হুসেন সা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিলেন। গৌড়েশ্বর তখন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সুবুদ্ধি রায়ের মুখে কাওরার জল নিক্ষেপ করেন। যবনের জলে রায় জাতচ্যুত হইলে, ব্রাহ্মণেরা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার তপ্ত ঘৃত পানের ব্যবস্থা করেন। সুবুদ্ধি রায় এরূপ ব্যবস্থা জীবন-সঙ্কট-মনে করিয়া বারাণসীধামে গমন

করিয়া বাস করিতে থাকেন। যখন গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনধামে গমন করেন, তখন সুবুদ্ধি রায় তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার অপরাধ এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণদিগের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। প্রেমাবতার গৌর, ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—তুমি বৃন্দাবনে যাইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কর, তোমার অপরাধ বিদূরিত হইবে। ভূতপূর্ব্ব মনক্লিষ্ট সুবুদ্ধি রায় যেন নবজীবন লাভ করিলেন। গৌর-বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার নির্দ্দেশানুসারেই জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

তখন জাতিভেদের কঠিন বন্ধনে লোকে আবদ্ধ ছিল। নমঃশূদ্রদিগের দ্বারা স্পর্শেও লোকে স্নান করা আবশ্যক মনে করিত। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে অন্নগ্রহণ করা দূরে থাকুক, সমবর্ণের লোকের মধ্যেও স্থলবিশেষে পরস্পরের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন।

দেশের এই দুর্গতির অবস্থায় একজন আদর্শ জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিক পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানানুসারে, সে সময় এক মহাপুরুষ নবদ্বীপ নগরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপ

নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি ও তাঁহার লীলার প্রথম ক্ষেত্র। নবদ্বীপ বঙ্গ-ইতিহাসে চিরদিনই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের জন্য এই স্থানের মাহাত্ম্য ও গৌরব আরও বৃদ্ধি

পাইয়াছে। "নবদ্বীপ" নাম উচ্চারণেই অনেক ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্তিলীলার মনোহর ছবি উদিত হইয়া, তাঁহাদের প্রাণকে ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া তুলে।

বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে একটী সুদীর্ঘ দিঘী ছিল। লোকে তাহাকে "বল্লাল দিঘী" বলিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজা লক্ষ্মণ সেন যখন এই স্থানের রাজা ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ সুবিখ্যাত বল্লালসেনের নামে এই স্থান উৎসর্গীকৃত করেন। সেই হইতেই ঐ দিঘীটী বল্লাল দিঘী নাম ধারণ করে। এই দিঘীর পূর্ব্ব পার্শ্বে লোকের বসতি ছিল, এবং উহার উত্তর দিকে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় ইষ্টক ও প্রস্তরের একটী স্তূপ ছিল। বল্লাল দিঘীর ন্যায় লোকে এই স্তূপটীকেও বল্লাল স্তূপ নামে অভিহিত করিয়াছিল। ক্রমে ভাগীরথীর স্রোত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হওয়াতে অধিবাসীরা আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। সেনবংশীয়দিগের নবদ্বীপ ধীরে ধীরে গঙ্গা-সলিলে নিমগ্ন হইয়া, আপনার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া ফেলিল। সে সময় মায়াপুর, আতোপুর, গঙ্গানপুর, সিমুলিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর সমাবেশে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর গঠিত হইয়া উঠে। এই নবগঠিত নবদ্বীপেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গ-দেশের মধ্যে নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চ্চা, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রের জন্য বিশেষ-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপের এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রসিদ্ধি লাভের জন্য মিথিলাকেই প্রধান কারণ বলিতে হয়। বিদ্যার্থিগণ, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য মিথিলায় গমন করিতেন। তাঁহাদের পাঠ সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা ন্যায়ের কোন গ্রন্থ সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে আগমন করিতে পারিতেন না। নবদ্বীপ, পাছে ন্যায়শাস্ত্রে মিথিলার সমকক্ষ হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

যখন মিথিলা ন্যায়শাস্ত্রে এইরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তখন নবদ্বীপেও কয়েকটী চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইত। কিন্তু নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রে মিথিলার অতি পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া, বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে জনৈক উৎসাহী ও মেধাবী যুবা পুরুষ, এক সুন্দর উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি এই সংকল্প করিলেন যে, মিথিলায় গমন করিয়া, ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া, স্বদেশ প্রত্যাগমন করিবেন। এই সুদৃঢ় সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তিনি ন্যায় অধ্যয়নার্থ মিথিলায় গমন করিলেন। বাসুদেব, এমন মনোনিবেশ সহকারে উহা পাঠ করিতে লাগিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রের প্রত্যেক ছত্র ও পদ সকল তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, সুবৃহৎ ন্যায়গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে।

সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, বাসুদেব নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বঙ্গদেশের শিক্ষার ইতিহাসে সে এক চির-স্মরণীয় দিন! তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির বিষয় চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করিয়া ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

মানব যখন কিঞ্চিৎ পরিমাণে জ্ঞানের আস্বাদন করে, তখন তাহার চিত্ত সংসারের ঐশ্বর্য্য, ও মান মর্য্যাদা অপেক্ষা তাহারই অনুশীলনে অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। নবদ্বীপবাসীরা সেই আনন্দের অধিকারী হইবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা যখন পরস্পর পথে চলিতেন, তখন তাঁহারা আর কোন দিকে বিশেষ দৃষ্টি না করিয়া, তর্কের মীমাংসায় রত হইতেন,—দিবাভাগে ছাত্রেরা জাহ্নবীর জলে স্নান করিতে যাইয়া, গাত্রমার্জ্জনের দিকে অধিক দৃষ্টি না রাখিয়া, চিত্তের উৎকর্ষ সাধনের দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের কোন এক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া,

তদ্বিষয়ের বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। স্রোতস্বিনী বক্ষে দাঁড়াইয়া, এইরূপে অধিকাংশ সময় তাঁহারা যাপন করিতেন। সময়ে সময়ে বিতণ্ডা এত ঘোরতর হইয়া দাঁড়াইত যে, পরস্পরের মধ্যে কেবল রসনার বিচারেই তাহার পরিসমাপ্তি না হইয়া হাতাহাতি পর্য্যন্তও হইয়া যাইত। সত্য নির্ণয়ই ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সত্য নির্ণয়ের জন্য ছাত্রেরা ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চ্চা ও ন্যায়-শাস্ত্রের প্রধানতম ক্ষেত্র বলিয়া, বঙ্গদেশের চারিদিকে উহার নাম বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

নবদ্বীপ হিন্দুরাজত্বের শেষ লীলাভূমি! যবন সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজির আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইলে, যেদিন লক্ষ্মণ সেন তদীয় সৈন্যসামন্তের সহিত যুদ্ধ করিতে অপারক মনে করিয়া, কাপুরুষের ন্যায় নিজ দেশ ছাড়িয়া গোপনে নৌকারোহণে পলায়ন করেন, সেই দিন হইতেই বঙ্গদেশের অধঃপতন সূচিত হইয়াছে। নবদ্বীপের গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে! বিধাতার বিধানে যেন নবদ্বীপ ভাগীরথীর স্রোতে আপনার অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া সে কলঙ্ক মোচন করিতে যত্ন করিয়াছেন; —ভীরু স্বভাব লক্ষ্মণ সেনের নবদ্বীপ নগর চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে!

কিন্তু নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি বলিয়া চিরদিনই আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষা করিবে। ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমের লীলাভূমি বলিয়া, নবদ্বীপ সকল সময়ই, ভারতের ধর্ম্ম-ইতিবৃত্তে স্বর্ণাক্ষরে আপনার নাম অঙ্কিত করিয়া রাখিবে।

প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক যোগী পুরুষ এইস্থানে আগমন করেন। তাঁহার সাধনা ও সাধুতার গুণে অনেক লোক তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিত। এইরূপ কথিত আছে যে, এই সাধু পুরুষ নবদ্বীপে এক দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইঁহার নাম "পোড়ামা।" শ্রীচৈতন্যের সময় নবদ্বীপবাসী নর নারী সকল সময়ে ও সকল শুভানুষ্ঠানে, এই পোড়ামার

সমীপে গমন করিয়া, পূজোপহার প্রদান করিত ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত। শ্রীগৌরাঙ্গে ভক্তিপ্রবণতার অনুপ্রাণনা শক্তিও কতক পরিমাণে এই দৃশ্য হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নবদ্বীপে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পুরুষ ও নারীদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কার্য্য সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইত। যখন নবরাগে রঞ্জিত নবীন ভানু পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া, রক্তিমাবর্ণ রশ্মি-জালে চারিদিক অনুরঞ্জিত করিত, তখন ভাগীরথীর নির্ম্মল সলিলে কত লোক অবগাহন করিয়া, আপনাদিগের উপাস্য দেবতার নাম জপ করিতেন। এই স্নিগ্ধ ও মনোহর সময়ে, আবার কত লোক কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া, নানা রঙ্গে রঞ্জিত কুসুম সকল চয়ন করিতেন, ও সাজি ভরিয়া, সেই সকল পুষ্প দেবতার অর্চ্চনার জন্য গৃহে লইয়া আসিতেন, ও ভক্তিভরে চন্দন চর্চ্চিত করিয়া, আপনাদিগের আরাধ্য দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত করিতেন। বার মাসে নানারূপ পার্ব্বণে, নবদ্বীপের গ্রামসমূহ যেন সদা আন্দোলিত হইয়া থাকিত।

বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা নবদ্বীপের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, আপনাদিগের লেখনীকে চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের বর্ণিত বিষয় পাঠ করিলে, নবদ্বীপ সম্বন্ধে এই প্রতীয়মান হয় যে, মহাত্মা ভক্ত-চূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চ্চায়, বাণিজ্য, সম্পদে ও ধর্ম্মে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এ স্থলে বৃন্দাবন দাসকৃত শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে, কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

"নানা স্থানে অবতীর্ণ হইলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভার হইল মিলন॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।

যহিঁ(১) অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোসাঞি ॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥
নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥
ত্রিবিধ বৈসে(২) এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে(৩) সভে মহা দক্ষ ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা(৪) করে ॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায় ॥
অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥
রমা দৃষ্টি পাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে ॥"

যে সময় বঙ্গদেশে শাক্তধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রভাব বড়ই প্রবল ছিল, সে সময়ে নবদ্বীপে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপে কয়েকজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব বাস করিতেন। কিন্তু তৎকালীন মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার ও শাক্তদিগের অসহনীয় বিদ্রূপের ভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে আপনাদিগের ধর্ম্মমত প্রচারে তত সাহসী হইতেন না, সেজন্য তাঁহারা অনেক সময় সংগোপনে,

(১) যহিঁ—যেস্থানে; (২) ত্রিবিধ বৈসে—বিবিধ বয়সে।
(৩) সরস্বতী দৃষ্টিপাতে—সরস্বতীর কৃপায়। (৪) কক্ষা—প্রতিযোগীতা।

আপনাদিগের মতাবলম্বীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কয়েকজন পরম ভক্তের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈতাচার্য্য দেশের দুর্গতি দর্শন করিয়া, ব্যথিত হৃদয়ে কোন ভক্তাবতারের আবির্ভাবের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার সে ঐকান্তিক প্রার্থনা বিফলে যায় নাই; গৌর নবদ্বীপধামে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বংশ-পরিচয় ও জন্মের পূর্ব্বাভাস

শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণগ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে উপেন্দ্র মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সাত পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জগন্নাথ মিশ্র তৃতীয়। বাল্যজীবনেই জগন্নাথের ধীরতা, সৌজন্য, বিনয় ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। উপনয়ন-সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, জগন্নাথ জ্ঞানানুশীলনের জন্য, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া, নবদ্বীপে আগমন করেন। সে সময় যে সকল পণ্ডিতের গুণ-গ্রামে নবদ্বীপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে মহেশ্বর বিশারদ অন্যতম। জগন্নাথ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইলেন। জগন্নাথের শারীরিক গঠন ও রূপ লাবণ্য অতি মনোহর ছিল; যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। জগন্নাথের যেমন রূপ তাঁহার মেধাও তেমনি প্রখর ছিল। শ্রীহট্টের এই বালক চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিয়া, অতি যত্নসহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। এই রূপবান বালকের স্মৃতিশক্তি, তাঁহার বিনয় ও

পাঠানুরাগ দর্শন করিয়া শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য সকলে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। নবদ্বীপে তখন চতুষ্পাঠী হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি প্রদত্ত হইত। জগন্নাথ মিশ্রও আপনার অধ্যবসায়ের গুণে বিশিষ্টরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, "পুরন্দর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্রকে রূপে গুণে অতুলনীয় দেখিয়া, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার কন্যা শচীদেবীর সহিত তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। নবদ্বীপে সে-সময় শ্রীহট্টনিবাসী কয়েকজন ব্যক্তি আপনাদিগের পত্নী ও পুত্র-কন্যা সহ নগরের কোন অংশে বাস করিতেন। পুরন্দর মিশ্র সেই স্থানে যাইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করতঃ শচীদেবীকে লইয়া, পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

সে-সময়ে যে-সকল শ্রীহট্টবাসী তথায় বাস করিতেন, তন্মধ্যে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিবিশিষ্ট যুবাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার নাম মুরারি গুপ্ত। ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তরুণ যৌবনেই পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি নবদ্বীপে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুরারি অদ্বৈতবাদী ছিলেন, সেজন্য তিনি পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিতেন না। নিজেকে ভগবানের সহিত অভেদাত্মা মনে করিতেন। অদ্বৈতবাদীরা ভগবদ্ভক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, মুরারিও তাহা করিতেন না। ইনি অন্যকে আপন পথাবলম্বী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। গৌর যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মুরারির বয়স অনুমান পনের কি ষোল বৎসর। পরে ইনি গৌরচন্দ্রের সহিত, বিচারে আপনার অদ্বৈতমত বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার ভক্তি-লীলার সহায় হইয়াছিলেন। মুরারি গৌরচন্দ্রের আদিলীলা লিখিয়া গিয়াছেন। জগন্নাথ মিশ্রের সহিত মুরারি গুপ্তের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল।

শচীদেবী গুণবতী ছিলেন। উভয়ের পরিণয়ে যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছিল। নবদম্পতী পরম সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে

লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শচীদেবীর গর্ভে ক্রমান্বয়ে আটটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল; কিন্তু তাঁহার সমস্ত কন্যাগুলিই একে একে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইল। শোকাতুরা জননী কিছুদিন পরে এক নবকুমারের মুখ দর্শন করিলেন। গর্ভপ্রসূত সন্তানের মুখ দর্শন করিয়া, তিনি কন্যাদিগের শোকস্মৃতি কিয়ৎপরিমাণে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশু দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মাতাপিতা এই কুসুম সদৃশ পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া, অপার আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। এই নবকুমারের নাম তাঁহারা বিশ্বরূপ রাখিলেন, এবং পুত্রকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে সুখে বাস করিতেছেন, এমন সময় শ্রীহট্ট হইতে জগন্নাথের পিতা উপেন্দ্র মিশ্র, সন্তানকে সপরিবারে তথায় গমন করিবার জন্য একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। পিতার পত্র প্রাপ্ত হইয়া, জগন্নাথ শচীদেবী ও বিশ্বরূপকে সঙ্গে লইয়া, আপনার জন্মভূমিতে গমন করিলেন। উপেন্দ্র মিশ্র তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া, পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের অবস্থিতি কালে, উপেন্দ্র মিশ্র জগন্নাথের পাণ্ডিত্য, পুত্রবধূর বিনয় ও সৌজন্য এবং তাঁহাদিগের পুত্র বিশ্বরূপের লাবণ্য ও জ্ঞানস্পৃহা দর্শনে, পরম আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

যখন শচীদেবী শ্রীহট্টে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহার গর্ভধারণের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বহুদিনের পর জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মাতা, পিতা, সুহৃদ্‌বর্গ প্রভৃতির স্নেহপাশে যেন জড়িত হইয়া পড়িলেন; মাতৃভূমির মধুর আকর্ষণীশক্তি যেন তাঁহার মনপ্রাণকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। তিনি পুনরায় নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তত অভিলাষী ছিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে এ-সংকল্প উদিত হইলেও, জননীর কথায় তাঁহাকে সে-সংকল্প বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল।

শোভাদেবী রজনীতে স্বপ্ন দেখিলেন, দিব্য কান্তিযুক্ত এক মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—তোমার পুত্রবধূ শচীদেবীর গর্ভে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব তুমি তোমার পুত্র ও পুত্রবধূকে শীঘ্র নবদ্বীপে যাইতে বল।

শোভাদেবী নিশাবসানে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া, এই অদ্ভুত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সকলকে অবগত করিলেন; এবং সন্তানকে শীঘ্রই পত্নী ও পুত্রসহ নবদ্বীপে যাইতে আদেশ করিলেন। শোভাদেবীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সকলেরই মনে আনন্দ ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল। জগন্নাথ-পত্নী শচীদেবীর অন্তরেও আনন্দ ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। মাতৃবৎসল জগন্নাথ স্নেহময়ী জননী শোভাদেবীর ঈদৃশ অলৌকিক ও মনোহর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে পত্নী ও পুত্রসহ নবদ্বীপ ধামে প্রত্যাগমন করিলেন। যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাতৃগর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সে-সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও শচীর গর্ভ হইতে পুত্র কি কন্যা কিছুই ভূমিষ্ঠ হইল না। ১৪০৬ শকের মাঘ মাসে গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল; তৎপর আর এক মাঘও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ফাল্গুন মাস দেখা দিল। জগন্নাথ এই ঘটনায় চিন্তিত হইয়া, শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া আনিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপের মধ্যে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি কন্যার প্রসবের এত কালবিলম্ব দেখিয়া, ত্বরায় জামাতার গৃহে আগমন করিলেন, এবং গণনায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, শীঘ্রই শচীর গর্ভ হইতে এক দেবোপম অসামান্য বালক জন্ম গ্রহণ করিবে। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন, সেজন্য সকলের মন হইতে উদ্বেগ নিবারিত হইল। জগন্নাথ ও অন্যান্য সকলেই বুঝিলেন, ত্বরায় শচীদেবী পুত্রমুখ দর্শন করিবেন এবং তাঁহার সন্তান দেবসদৃশ হইয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জন্মোৎসব

১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীগৌরাঙ্গ শচীদেবীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। কিন্তু আজ চন্দ্রগ্রহণের দিন। দেখিতে দেখিতে পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোতি ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। পুণ্য-ভূমি ভারতে নৈসর্গিক সকল ঘটনাতেই নরনারী দেবতাদিগের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সেজন্য নবদ্বীপের সহস্র সহস্র পুরুষ ও নারী হরিধ্বনি করিতে করিতে ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিবার জন্য গমন করিতে লাগিলেন; সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে মধুর হরিনামের ধ্বনি উত্থিত হইয়া চারিদিক নিনাদিত করিতে লাগিল। নীল আকাশের চন্দ্রমা রাহুর করাল গ্রাসে কবলিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র সূতিকা-গৃহে শোভা পাইতেছেন; এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া, কোন বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন,—'যখন অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র উদিত হইলেন, তখন সকলঙ্ক চন্দ্রের কোন প্রয়োজন নাই ভাবিয়া, বিধাতা তাহাকে আকাশের অন্তরালে একেবারে লুকাইয়া ফেলিলেন।' যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে,—

"চৌদ্দ শত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি, সিংহ লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্ বর্গ, অষ্ট বর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
'অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥'

এত জানি চন্দ্র রাহু করিল গ্রহণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥
জগত ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেই ক্ষণে গৌরচন্দ্র ভূমে অবতরি ॥"

বিশ্বরূপের জন্মগ্রহণের দ্বাদশ বর্ষ পরে, এই নবকুমারকে লাভ করিয়া, মাতাপিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, পুরন্দরের গৃহে যেন আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। বাদ্যকরেরা ঢোল, সানাই প্রভৃতি আনিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। নারীগণ আসিয়া আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিলেন। এদিকে অদ্বৈতাচার্য্য, এ শিশু সামান্য শিশু নয় মনে করিয়া, আপন ভবনে, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'হরিবোল' বলিতে বলিতে সদলে মহানন্দে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন, এবং শিশুর জন্ম-উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে লাগিলেন।

"সেইকালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঁকার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেন নাচে কেহ নাহি জানে ॥
দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিলা নানা দান ॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

শচীকুমারের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে পুরন্দরের ভবন আবার যেন উৎসবময় হইয়া উঠিল। প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনেরা শিশুকে যৌতুক দিবার জন্য, নানা দ্রব্যে তাঁহার ঘর পূর্ণ করিয়া ফেলিল। অদ্বৈতাচার্য্যের

পত্নী সীতাদেবী ও শ্রীবাসের পত্নী মালিনীদেবী এই উপলক্ষে নানা দ্রব্য-সম্ভার লইয়া দোলারোহণে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। পরিশেষে সকল নারী মঙ্গলধ্বনি করিতে করিতে ধান্য, দূর্ব্বা, দধি, কলা প্রভৃতি লইয়া শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

"শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্য রত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দূর হরিদ্রা তৈল, দধি কলা নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ সঙ্গে॥"

পূর্ব্বে হিন্দু-পরিবারে জ্যোতিষীর দ্বারা শিশুর ভবিষ্যৎ গণনা করা হইত। জগন্নাথ মিশ্রও সেইজন্য শিশুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া আনিলেন। নীলাম্বর শিশুর ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিলেন, "এ শিশুর মধ্যে বত্রিশটী শুভ চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে; এ শিশু সামান্য শিশু নহে,—ইঁহার প্রভাবে নরনারী পরিত্রাণের পথে নীত হইবে।"

"লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে॥"

কিন্তু তিনি একটী কথা গোপন রাখিলেন। তিনি দেখিলেন যে, এই সন্তান ভবিষ্যতে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবে, এবং ইঁহার বিরহে মাতা-পিতা শোকে আকুল হইয়া পড়িবে; কিন্তু পাছে, এ আনন্দের সময় নিরানন্দের মেঘ পিতামাতার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেজন্য তিনি আর গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা উল্লেখ করিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাল্য-জীবন

গৌরচন্দ্র হামাগুড়ি দিতে শিখিল। শচীদেবীর আঙ্গিনায় বালক যখন হামাগুড়ি দিত, তখন তাহার মাতা একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। শিশুটীর রূপের আর তুলনা ছিল না; রং যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে; হাত পায়ের গঠন সুগোল, চক্ষু দুইটী যেন ঢল-ঢল করিতেছে; মুখখানি যেন পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়, দেখিলে বোধ হইত, যেন কোন শিল্পী বিরলে বসিয়া এই শিশুটীর শরীর গঠন করিয়াছেন। শিশুটীর সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইত; যে দেখিত, সেই গৌরাঙ্গকে একবার বক্ষে লইয়া অঙ্গ শীতল করিত। প্রতিবেশী মহিলারা সর্ব্বদাই গৌরকে কোলে লইত, সেজন্য শচী সন্তানকে অধিক সময় কোলে লইবার সুযোগ পাইতেন না।

শিশু গৌরচন্দ্র যখন ক্রন্দন করিত, তখন হরিনাম করিলে তাহার ক্রন্দন থামিয়া যাইত। এইজন্য নিমাই ক্রন্দন করিলেই, প্রতিবেশী মহিলারা 'হরিবোল' বলিত। শিশু এমন মনোযোগের সহিত সে-ধ্বনি শ্রবণ করিত যে, দেখিলে মনে হইত, কে যেন তাহার কর্ণকুহরের নিকট বীণার ঝঙ্কার করিতেছে। একদিন শচীদেবী গৃহের কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় গৌর ভয়ানক চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অন্য কেহ সে ক্রন্দন থামাইতে পারিতেছে না দেখিয়া শচীদেবী বলিলেন, 'তোমরা হরি নাম কর, দেখিবে, এখনই উহার কান্না থামিয়া যাইবে।' তাহারা তাহাই করিল, শিশুর ক্রন্দন থামিয়া গেল। শৈশব অবস্থায়

হরিনামে ক্রন্দন বন্ধ হয়, এই অপূর্ব্ববার্ত্তা নবদ্বীপের বহুঘরে প্রবেশ করিল। অনেকেই মনে করিতে লাগিল এই শিশুর মধ্যে এক অপূর্ব্ব দেবভাব বিরাজ করিতেছে।

শচী গৌরকে যখন অলঙ্কারের দ্বারা ভাল করিয়া সাজাইয়া দিতেন, তখন তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া যাইত। গৌর এই অলঙ্কার-পরিহিত দেহে নানারঙ্গে নৃত্য করিত। বালকের এই নৃত্য দর্শনে, লোকে বিমুগ্ধ হইয়া শিশুর দিকে তাকাইয়া থাকিত। কেহ কেহ, হরি-বোল হরিবোল হরিবোল বলিত, আর শিশু এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে, আরও উৎসাহের সহিত তালে তালে নৃত্য করিত।

গৌর অনেকগুলি নামে অভিহিত হইয়াছিল। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর, শচী রাখিলেন নিমাই, অন্যান্য লোকে রাখিলেন গৌর, সন্ন্যাসের সময় দীক্ষাকালীন কেশবভারতী রাখিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

নামকরণ সময়ে, ধান্য, পুঁথি, রজত ও স্বর্ণ নির্ম্মিত বস্তু সকল রাখা হইয়াছিল। জগন্নাথ সন্তানকে বলিলেন, "বাবা বিশ্বম্ভর! তুমি এই সকল জিনিষের মধ্যে যাহা ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর।" বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস বলেন, 'তিনি সে সময়, ভাগবত গ্রন্থ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন।'

"জগন্নাথ বোলে, 'শুন বাপ বিশ্বম্ভর!
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥'
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥"

গৌর যখন পঞ্চমবর্ষীয় শিশু, তখন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাকে ধরিয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়িত। বালক কখন শচীদেবার আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইত, কখন দৌড়িয়া পথের বাহির হইত, কখন গঙ্গার দিকে ধাবিত হইত। বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা বলেন, গৌর একদিন একটী সর্প

দেখিয়া, তাহাকে ধরিল। সর্প কুণ্ডলাকৃতি হইলে, গৌর তাহার উপর উপবেশন করিল। শচী ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গৌর যেন সে সর্পটী লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। এইরূপ ঘটনা কতদূর সম্ভব ঠিক বলিতে পারা যায় না।

একদিন শচীদেবী সন্তানকে খই কলা খাইতে দিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া দেখেন, সন্তান খই কলা না খাইয়া মাটী খাইতেছে। শচীদেবী সন্তানের ঈদৃশ কার্য্য দেখিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি খই কলা না খাইয়া মাটী খাইতেছ কেন?" জননীর কথা শ্রবণ করিয়া সন্তান বলিল, "মা, মাটীতে আর এই খাদ্যেতে কি প্রভেদ? সকলই ত মাটীর বিকার মাত্র।" শচীদেবী সন্তানের মুখ হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "খাদ্যের দ্বারা শরীর পুষ্ট হয় আর মাটীর দ্বারা অন্যান্য বস্তু নির্ম্মিত হয়, এইমাত্র।" তখন নিমাই মাতৃভক্ত শিশুর ন্যায় মাতার কথা অনুমোদন করিয়া, মাতৃ-প্রদত্ত খাদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। বাল্যকালেই গৌরের তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়া বৈষ্ণব লেখকেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

জগন্নাথ ও শচীদেবী সন্তানের এই সকল কার্য্য দর্শন করিয়া, পরস্পর বলাবলি করিতেন,—এ ছেলে ত সামান্য ছেলে নয়, দৈবশক্তি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। একদিন মিশ্র গৌরকে গৃহাভ্যন্তর হইতে একখানি পুস্তক আনিতে আদেশ করিলেন। পুস্তকখানি আনিবার নিমিত্ত যখন গৌর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন জগন্নাথ শুনিলেন, গৃহের মধ্যে যেন নূপুরের রুনু ঝুনু শব্দ হইতেছে—তাঁহার বোধ হইল যেন কোন ব্যক্তি নূপুর পায় দিয়া গৃহের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। গৌর পুস্তকখানি পিতার হস্তে আনিয়া দিল। জগন্নাথ কিছুক্ষণ পরে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিষ্ণু-পাদ-পদ্মের "ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ" এই ত্রিবিধ চিহ্নে গৃহতল অঙ্কিত হইয়াছে। জগন্নাথ ও শচীদেবী এ-চিহ্ন নিজ সন্তানের

পদচিহ্ন বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন; এবং এ বালক যে দেবসদৃশ, তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

একদিন কোন তৈর্থিক সাধু জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। জগন্নাথ অতিথিকে পরম সমাদর পূর্ব্বক বাটীতে স্থান দান করিলেন। তাঁহার ভোজনের জন্য দ্রব্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন করিতে লাগিলেন। রন্ধন শেষ হইলে, পাত্রে অন্ন রাখিয়া মুখে অন্নগ্রাস তুলিবেন, এমন সময় গৌর কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া, ব্রাহ্মণের ভোজনপাত্র হইতে এক গ্রাস অন্ন তুলিয়া ভক্ষণ করিল। ব্রাহ্মণের আর আহার করা হইল না। গৃহস্বামী ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং সন্তানকে প্রহার করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। গৌর ছুটিয়া পলাইয়া গেল। জগন্নাথ পুনরায় ব্রাহ্মণের খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ জগন্নাথের অনুরোধে আবার রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া যেমন আহার করিতে যাইবেন, গৌর পূর্ব্বের ন্যায় আবার সেইরূপ দৌড়িয়া আসিয়া, ব্রাহ্মণের পাত্র হইতে অন্নগ্রাস তুলিয়া নিজ মুখে প্রদান করিল। জগন্নাথ পুনরায় এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন, এবং যষ্টিহস্তে সন্তানকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। সকলে তাঁহাকে প্রহার করিতে নিষেধ করিল এবং বলিল, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর প্রহার করিয়া কি ফল হইবে?" তৈর্থিক ব্রাহ্মণও বালককে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। জগন্নাথ অতিথির আহারের এই বিঘ্ন দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, এবং গণ্ডে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক অতিথির আহারের বিঘ্ন বিষয় চিন্তা করিতে থাকিলেন।

বিশ্বরূপ এই সকল ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া, দুঃখিতান্তঃকরণে অতিথির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ছোট ভ্রাতার দোষের কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ অতি বিনীত ও

ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি বিশ্বরূপের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, "তিনি বালকের ব্যবহারে কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই।" বিশ্বরূপের অনুরোধে তিনি পুনরায় রন্ধন করিয়া ভোজনের নিমিত্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, যখন আপনার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে বসিলেন। বৈষ্ণব লেখকেরা বলেন, তখন গৌর বালগোপালের রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সে অপরূপ মোহন' মূর্ত্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র যে সামান্য বালক নহে, নরমূর্ত্তিধারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া, তিনি গৌরচন্দ্রকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব লেখকেরা গৌরের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিয়া অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এক দিবস গৌর অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। সে ক্রন্দন আর কেহ থামাইতে সমর্থ হইল না। জগন্নাথ ও শচীদেবী কত বুঝাইলেন, কত আদর করিয়া উভয়ে ক্রোড়ে লইলেন, সে কোমল চাঁদবদনে কত চুম্বন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আদর ও মিষ্ট বাক্যে বালকের ক্রন্দন কিছুতেই থামিল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্নেহশীলা শচীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তুমি কি চাও বল।" রোরুদ্যমান বালক তখন বলিল, "জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবতের বাটাতে নৈবেদ্য দেখিয়া আসিয়াছি, আমি সেই নৈবেদ্যের জিনিষ খাইব।" ব্রাহ্মণেরা গৌরাঙ্গের নৈবেদ্য ভোজনের ইচ্ছার কথা শ্রবণ করিয়া, পুলকিত অন্তরে নৈবেদ্য আনিয়া গৌরকে খাইতে দিলেন। দেবতাকে নিবেদন, আর গৌরের ভোজন, একই কথা বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

গৌরাঙ্গ চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইত। এই সুন্দর শিশুটির গাত্র নানা অলঙ্কারে ভূষিত থাকিত। একদিন দুই চোর অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিবার মানসে তাহাকে ভুলাইয়া ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গেল। এদিকে সন্তানকে না দেখিয়া, মাতা-পিতা অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ

পরে, তাহারা এই সুন্দর অলঙ্কার-শোভিত শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া, জগন্নাথের ভবনের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া যায়।

গৌর গঙ্গায় স্নান করিতে যাইয়া বড়ই চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেন। গঙ্গা-সলিলে সন্তরণ দিবার সময়, ডুব দিয়া, স্নানার্থীদিগের পা ধরিয়া টানিতেন, বিষ্ণুউপাসকেরা পূজার জন্য পুষ্প ও নৈবেদ্য রাখিয়া, জলে অবতরণ করিলে, নিমাই সুযোগ বুঝিয়া, তথায় আসন পাতিয়া বসিতেন; পুষ্পগুলি গ্রহণ করিতেন, এবং নৈবেদ্যের ফলমূলগুলি ভক্ষণ করিয়া বলিতেন, "আমাকে পূজা কর; আমিই নারায়ণ।" কখন জলকেলি করিতে করিতে, মুখে জল পুরিয়া কুলি করিতে করিতে, অনেক ব্রাহ্মণের অবগাহনের পর, তাঁহাদের গাত্রে সেই জল নিক্ষেপ করিতেন। সরলা বালিকারাও নিমাইয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। তাহারা নদী-তটে বস্ত্র রাখিয়া, গঙ্গা-জলে অবগাহন করিবার সময়, গৌর তাহাদিগের বস্ত্রগুলি একত্র করিয়া ফেলিতেন। কুমারীরা স্নানান্তে আপনাপন বস্ত্র নির্ব্বাচনে বড়ই কষ্ট পাইত। কেবল এ-সকল করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না; তাহাদের স্নাত-অঙ্গে বালি প্রদান করিয়া, বড় আনন্দ লাভ করিতেন। বালিকারা গৌরের এই ব্যবহারে কুপিত হইয়া, অতি বিনম্র বচনে বলিত, "ভাই নিমাই, তুমি এমন করিও না, গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমাদের ভাই—তোমার কি আমাদের সঙ্গে এমন করা উচিত?" কেহ যদি আপনার ধৈর্য্য হারাইয়া গৌরের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিত, তাহা হইলে গৌর বলিতেন, "তোমার বুড় বর হবে।" অল্পবয়স্কা নারীদিগের পক্ষে এ অভিসম্পাত বড়ই কষ্টকর বলিয়া বোধ হইত; সে-জন্য, তাহারা নিমাইয়ের সর্ব্বপ্রকার চঞ্চলতায়, কোনরূপ বিরক্তিসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহস করিত না।

চঞ্চলপ্রকৃতি নিমাইয়ের দৌরাত্ম্য যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লোকে আর কত দিন সহ্য করিবে। একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ

জগন্নাথ মিশ্রের নিকট ও তৎপর কয়েকটী বালিকা শচীদেবীর নিকট নিমাইয়ের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। যথা চৈতন্য-ভাগবতে,—

"'শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব!
তোমার পুত্রের অপন্যায় (১) কহি সব॥
ভালমতে না পারি করিতে গঙ্গা-স্নান।'
কেহো বোলে (২) 'জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥'
আরো বোলে 'কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে নারায়ণ মুঞি (৩) পরতেখ (৪)॥'
কেহো বোলে 'মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি।'
কেহো বোলে 'মোর লই পলায় উত্তরী (৫)॥'
কেহো বোলে 'পুষ্প দূর্ব্বা, নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ, বিষ্ণু আসন॥'

* * * * *

কেহো বোলে 'সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দেই লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥'
কেহো বোলে 'আমার না রহে সাজি ধুতি।'
কেহো বোলে 'আমার চোরায় (৬) গীতা পুঁথি॥'
কেহো বোলে 'পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥'
কেহো বোলে 'মোর পৃষ্ঠে দিয়া কান্ধে চড়ে।
মুঞি রে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥'

(১) অপন্যায়—অন্যায় ব্যবহার (২) বোলে—বলে
(৩) মুঞি—আমি। (৪) পরতেখ—প্রত্যক্ষ।
(৫) উত্তরী—গায়ের চাদর, উড়ানী। (৬) চোরায়—চুরি করে।

কেহো বোলে 'বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজায় আপনে॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাসে করয়ে বদল।
পহ্রিবার (১) বেলে (২) সভে লজ্জায় বিকল॥
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ।
নিত্য এইমত করে, কহিল তোমাত॥' (৩)
হেনকালে পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিক।
কোপ মনে আইলেন শচীদেবী যথা॥
শচী সম্বোধিয়া সভে বোলেন বচন।
'শুন ঠাকুরাণি! নিজ পুত্রের করণ॥
বসন করয়ে চুরি, বোলে বড় মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল-ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল।'
কেহ বোলে 'মোর মুখে দিলেক কুল্লোল (৪)॥

(১) পহ্রিবার—পরিধান করিবার। (২) বেলে—সময়।
(৩) তোমাত—তোমাকে।
(৪) কুল্লোল—কুলকুচোর জল, মুখের জল।

ওকড়ার ফল দেয় কেশের ভিতরে।’
কেহো বোলে ‘মোর চাহে বিভা করিবারে॥
প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার?
পুরুবে শুনিলা যেন নন্দের কুমার।
সেই মত সব করে নিমাঞ তোমার॥
দুঃখে বাপ মায়েরে বালা যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল ইহা তোমাসনে॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল॥’”

জগন্নাথ সন্তানের এই সকল দৌরাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া এক যষ্টি হস্তে করিয়া, সন্তানকে প্রহার করিবার জন্য, স্নানের ঘাটে গমন করিলেন। ইতোমধ্যে গৌর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ সন্তানকে দেখিতে না পাইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, সন্তানের গাত্রে তৈল কিম্বা জলের কোন চিহ্নই নাই; গৌর মলিন শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন; গাত্রে বিন্দু বিন্দু কালীর দাগ। জগন্নাথ, সন্তানের গঙ্গায় স্নানে যাইবার যখন কোন লক্ষণই দেখিলেন না, তখন তাঁহার মনে হইল, অভিযোগকারীরা কিরূপে তাহাদের স্নানের সময় নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের কথা আমার নিকট আসিয়া জ্ঞাপন করিল? নিমাইকেও এ-বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি তাঁহার গাত্র ও বস্ত্র দেখাইয়া, অতি অল্প পূর্ব্বে জলে থাকা অসম্ভব প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হইলেন। জগন্নাথও তাঁহার সুচতুর উত্তরে সন্তানকে আর দোষী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না।

---

(১) পুরুবে—পূর্ব্বে (২) ঝাট—শীঘ্র

নবদ্বীপে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ অধ্যয়ন করিতেন। এখন বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাদশ বৎসর। বিশ্বরূপের রূপ লাবণ্য, তাঁহার জ্ঞানানুরাগ, বিনয় প্রভৃতি গুণ দর্শন করিয়া, অদ্বৈতাচার্য্য ও তদীয় চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। বিশ্বরূপ আহারের ও শয়নের সময় ব্যতীত সকল সময়েই আচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া জ্ঞানালোচনা করিতেন। দিবাভাগে সময়ে সময়ে আহারের সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত, তবুও বিশ্বরূপ চতুষ্পাঠী হইতে বাড়ীতে আসিতেন না। যে-পর্য্যন্ত সন্তান বাটীতে আগমন না করিতেন, সে-পর্য্যন্ত শচীদেবীও আহার করিতেন না; অধিক বেলা হইলে, কনিষ্ঠ পুত্র গৌরচাঁদকে, কখন কখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। এক দিন বেলা অধিক হইলে, শচীদেবী বিশ্বরূপকে ডাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। গৌর দাদাকে ডাকিবার জন্য অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণের পুত্তলিসম গৌরচন্দ্র চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলে সকলে সে-রূপের প্রভা ও তাঁহার বদন-মণ্ডলে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দর্শনে মোহিত হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈতাচার্য্য যেন পূর্ব্ব হইতেই এই বালকের ভবিষ্যৎ দিব্যচক্ষে দর্শন করিতে-ছিলেন। তিনি সে মুখ-চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া যেন নয়ন আর ফিরাইতে পারিলেন না; ইচ্ছা হইল, সে রূপ প্রাণ ভরিয়া অধিকক্ষণ দর্শন করেন। গৌর ক্ষণকাল অদ্বৈত-সভায় দাঁড়াইয়া মধুর বচনে বিশ্বরূপকে বলিলেন, "দাদা, বেলা হয়েছে, বাড়ী এস, মা আমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়ে দিলেন।" বিশ্বরূপ গৌরকে বড় ভালবাসিতেন; তিনি তৎক্ষণাৎ পুঁথিতে ডোর বাঁধিয়া, ছোট ভ্রাতার সঙ্গে বাড়ী আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ ও গৌরাঙ্গের পাঠ বন্ধ

বিশ্বরূপ জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গৌর কনিষ্ঠ। দুইটী পুত্রই মাতাপিতার নয়নের তারার ন্যায়। দেশের প্রথানুসারে বিশ্বরূপের বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। জগন্নাথ পুত্রের জন্য পাত্রী অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বরূপের কর্ণে সে-কথা প্রবেশ করিল। জগন্নাথের পরিবারের মধ্যে ভগবৎপ্রেমের কি এক মাধুরী যে ক্রীড়া করিত তাহা বলা যায় না; বিশ্বরূপ যখন শুনিলেন তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে, তখন তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বরূপের যে বয়স, নবদ্বীপে সে-সময় সেই বয়সের সহস্র সহস্র বালক পরিবারের মধ্যে বাস করিত, কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব তাহাদের নিকট কখনই অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত না। বিশ্বরূপের মন অন্যভাবে গঠিত; তিনি ভাবিলেন, পরিণীত হইলে সংসারে জড়িত হইতে হইবে; আর মাতাপিতার কথা অগ্রাহ্য করিয়া সংসারে বাস করিলেও নিষ্কৃতি নাই, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, এবং তাহা অবহেলা করিলে, তাঁহাদের মনে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইবে! এই সকল চিন্তা করিয়া বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করাই সংকল্প করিলেন। তিনি মাতাপিতার স্নেহ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিমাইয়ের প্রেমাকর্ষণ, প্রতিবেশীদিগের ভালবাসা, সকলই বিসর্জ্জন দিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া নগরে, প্রান্তরে, বনে-উপবনে, গিরিশৃঙ্গে ও নদীতটে বিচরণ করিয়া, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন করিবেন, নানাস্থানে ভক্ত-মেলায়, ভক্ত-সঙ্গে ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিবেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া গভীর

রজনীতে নিঃশব্দে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কেহ আর জানিতে পারিল না।

প্রাতে শচী ও জগন্নাথ দেখিলেন, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৃহে নাই। জগন্নাথ চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, সকলকেই পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কেহ কিছুই বলিতে পারিল না। অদ্বৈতাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে বিশ্বরূপ সর্ব্বদাই থাকিতেন। জগন্নাথ ব্যাকুল অন্তরে তথায় ছুটিয়া গেলেন। যে বিশ্বরূপের সৌন্দর্য্যে অদ্বৈত-সভা আলোকিত হইত, সন্তানকে সেখানেও দেখিতে না পাইয়া নিরাশ মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শচীদেবী যখন শুনিলেন, সন্তানকে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না, তখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। জগন্নাথ যেন চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী সকলে দুঃখে মর্ম্মাহত হইল। অদ্বৈতাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ বিশ্বরূপের অভাবে হৃদয়ে দারুণ ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপ চলিয়া গেলে, জগন্নাথ পরিবারের আত্মীয়স্বজনেরা আসিয়া বিশ্বরূপের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী হইলেন। সকলেই নিমাইকে লক্ষ্য করিয়া যেন এই কথা বলিতে লাগিলেন, “এমন সোণারচাঁদ ছেলেকে দেখিয়া সকল দুঃখ তোমরা দূর কর। এমন ছেলে যার ঘরে আছে তাদের আর দুঃখ কি ?”

এদিকে বিশ্বরূপ সংসারের সকল মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুরী সম্প্রদায়ী কোন লোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষায় মানবের নবজীবন লাভ হয়, এই বিশ্বাসে প্রায় সকল স্থলেই দীক্ষার্থীর নূতন নামকরণ করা হইয়া থাকে। জগন্নাথ-পুত্র বিশ্বরূপও দীক্ষার পর নূতন নামে অভিহিত হইলেন। তাঁহার নাম হইল শঙ্করারণ্যপুরী।

জগন্নাথ পুত্রশোকে অস্থির; অথচ সন্তান যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন সে ব্রতে যাহাতে ব্যাঘাত না হয়, সে-জন্য তিনি বলিয়াছেন—

এই ব্রত ভঙ্গ করিয়া সে যেন গৃহে প্রত্যাগত না হয়। এইরূপ ধার্ম্মিক পিতা না হইলে কি এইরূপ ধার্ম্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করিতে পারে?

বিশ্বরূপ চলিয়া গেলে, বিশ্বম্ভর একদিন তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তিনি একটী স্বপ্ন দেখিলেন, চেতনা লাভ করিয়া, তিনি এইরূপে স্বপ্ন বৃত্তান্তটী উল্লেখ করিয়াছিলেন, "দাদা আসিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ কর। দাদার এই কথা শ্রবণ করিয়া, আমি বলিলাম, পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিব না। দাদা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তবে তুমি সংসার-ধর্ম্ম পালন কর।"

এই সকল ঘটনার মধ্যে, জগন্নাথের মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, গৌরের তাম্বূল চর্ব্বণে মূর্চ্ছিত অবস্থায় বিশ্বরূপের প্রকাশ ও ভ্রাতাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুরোধ; ইত্যাদি বিষয় তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনাই বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রধান কারণ। পুরন্দর মিশ্র এতদিন গৃহে বসিয়া, সন্তানকে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন। গৌরের প্রখর বুদ্ধি, তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি; সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় সকল বুঝিবার ক্ষমতা, এই সকল লক্ষণের পরিচয় পাইয়া, তিনি সন্তানের অসাধারণত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সন্তান ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইলে, পাছে, সে বিশ্বরূপের পথ অবলম্বন করে, এই আশঙ্কায় তিনি নিমাইয়ের পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি সন্তানকে ডাকিয়া বলিলেন, "নিমাই, বাবা! তোমার আর শিক্ষার প্রয়োজন নাই, তুমি খাও দাও, আর গৃহে থাক।" পিতৃভক্ত নিমাই পিতার কথায় কোন আপত্তি প্রকাশ না করিয়া, সম্মতি দান করিলেন।

নিমাই স্বভাবতই কিছু চঞ্চল-প্রকৃতি বালক; তাহা হইলেও, এতদিন পিতার নিকট বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন। এখন, নিমাইচাঁদ আরও

চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে কেবল আহার ও স্নানের সময় ব্যতীত, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইত! নিমাই ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার উপদ্রবে অনেকে বিরক্ত হইয়া শচী ও জগন্নাথের নিকট তাঁহার দৌরাত্ম্যের কথা জ্ঞাপন করিত। জগন্নাথ আর কিছুতেই সন্তানকে বশে রাখিতে পারেন না। অনেকেই বলিতে লাগিল, জগন্নাথ সন্তানের পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। এক দিন কোন ব্যক্তি, জগন্নাথকে বলিলেন, "তুমি ছেলের পড়া বন্ধ করিয়া দিয়া ভাল কার্য্য কর নাই। লোকের ছেলে পড়িতে চায় না আর তোমার ছেলের পাঠের প্রতি কত অনুরাগ, তুমি এমন ছেলের পড়া নিষেধ করিলে! পড়া বন্ধ করিলে, সে দুষ্টামি করিয়া বেড়াইবে না ত কি করিবে?" জগন্নাথ দেখিলেন, গৌরের পাঠ বন্ধ করা অবধি সে আরও চঞ্চল হইয়াছে,—লোকেও আমায় ভাল বলিতেছে না।

এমন সময় একটা ঘটনা উপস্থিত হইল। শচীদেবী দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের ধন গৌরচাঁদ কতকগুলি উচ্ছিষ্ট ভাঙ্গা পতিত হাণ্ডির উপর বসিয়া রহিয়াছেন; মাতা, ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এ ভাঙ্গা হাঁড়ির উপর তুমি কেন বসিলে? ছি ছি! ওর উপর কি বসিতে আছে; যাও শীঘ্র স্নান করিয়া এস।" নিমাই এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মা, জগতে কোন জিনিষই অস্পৃশ্য নহে; পরমেশ্বর সকল বস্তুর মধ্যেই বাস করিতেছেন।" যিনি ভবিষ্যতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন, বাল্যে তাঁহার পক্ষে এরূপ তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে।

শচী বালকের মুখ হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, অবাক্ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গৌর আপনার চঞ্চলতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাকে লেখাপড়া করিতে না দিলে, আমি আর কি

করিব ?” জননী, নিমাইয়ের কথা শুনিয়া, কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। জগন্নাথ এই সকল ঘটনা দর্শন করিয়া, সন্তানকে পূর্ব্বের ন্যায় নিজে বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যজ্ঞোপবীত ও পিতৃবিয়োগ

এখন গৌরাঙ্গের বয়স নয় বৎসর। জগন্নাথ, পুত্রের উপবীত দিবার দিন নির্দ্ধারণ করিলেন। ক্ষৌরকার গৌরের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলে, তাঁহাকে লাল রংএর বস্ত্র পরান হইল; এবং তাঁহার হস্তে দণ্ড ও স্কন্ধে ঝুলি দেওয়া হইল। এই ব্রহ্মচারীর বেশে যখন তাঁহাকে সাজান হইল, তখন তাঁহার অন্তরের ও বাহিরের জ্যোতিঃ যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

এই উপলক্ষে জগন্নাথ-পরিবারের অনেক আত্মীয় ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। শচীর আনন্দের সীমা নাই। অনেক নারী আজ সমবেত হইয়া আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিলেন। শচী-দেবীর গৃহ উৎসবময় হইয়া উঠিল। মৃদঙ্গ, শানাই প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বাদকেরা নাচিয়া নাচিয়া বাদ্য বাজাইতে লাগিল; শানাইদারেরা মোহনসুরে শানাইয়ের ধ্বনি ধরিল; চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে যেন মুখরিত হইয়া উঠিল। এদিকে গৌরের মোহনমূর্ত্তি কত লোক নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল, আর যেন মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিল, ‘এমন দেবতুল্য, এমন রূপবান, ব্রাহ্মণকুমার আর ত কোথাও দেখি নাই।’

এই উৎসবময় গৃহে যজ্ঞসূত্র ধারণের সময় উপস্থিত হইল। গৌরের পিতৃদেব সন্তানের কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন। নবদ্বীপে সহস্র

বালকের কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করা হইয়াছে ; কিন্তু বিশ্বম্ভরের কর্ণে সে বৈদিক মন্ত্র প্রদত্ত হইলে, এক নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল ; মন্ত্র প্রদত্ত হইবামাত্র, তাঁহার শরীরে যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইল। নিমাই হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন ; তাঁহার বদনমণ্ডল এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল ; তাঁহার শরীর হইতে, যেন এক অপার্থিব জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল ; তাঁহার চক্ষু যেন কি এক মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল। মন্ত্র-দীক্ষিত নিমাই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

তাঁহার এই সকল লক্ষণ দর্শন করিয়া, সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী বলিতে লাগিলেন,—এ বালক সামান্য নহে, ইঁহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে নিমাইয়ের জ্ঞানোদয় হইলে, তিনি শচীদেবীকে বলিলেন, "মা, একাদশীর দিন তুমি অন্নাহার করিও না।" জননী নিমাইকে সামান্য সন্তান বলিয়া মনে করেন নাই ; সন্তানের মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণমাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হাঁ বাবা, তুমি যাহা বলিলে আমি এবার হইতে, তোমার কথানুসারেই কার্য্য করিব।"

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নিয়মানুসারে তাঁহাকে কয়েক দিন নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায় তাঁহার রূপলাবণ্য যেন আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; তাঁহার আত্মা ভগবানের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল। একাদশ দিবসে তিনি যখন ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া, সকলের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইলেন, তখন, পুরুষ ও নারী, যাহার যাহা সাধ্য, তিনি তাহাই সেই ঝুলির মধ্যে প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, এক ব্রাহ্মণ সেই ঝুলির মধ্যে একটী স্থপারী ফেলিয়া দিল। স্থপারিটী প্রদত্ত হইলে, গৌর উহা ঝুলি হইতে তুলিয়া চিবাইয়া ভক্ষণ করিলেন। ভক্ষণ করিবামাত্র, তিনি হুঙ্কার রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তৎপর মাতাকে বলিলেন, "মা, আমার এই শরীর পড়িয়া রহিল দেখিও, আমি চলিলাম।"

এই কথা বলিবার পরই তিনি জ্ঞানহারা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। জননী এই বাক্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন, কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তৎপর তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করিবার জন্য, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ গঙ্গার শীতল জলে সিক্ত করাইয়া দিলেন। গৌরাঙ্গ চেতনা লাভ করিলেন; তাঁহার এই ভাবাবেশ চলিয়া গেলে, শচীনন্দন সহজ বালকের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। গৌরাঙ্গের এই অবস্থা দর্শন করিয়া, সকলে বলিতে লাগিলেন—'শ্রীকৃষ্ণ এই বালকের দেহ আশ্রয় করিয়াছেন।' উপনয়নকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু জগন্নাথ মিশ্রের মনে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর হইতেই কেমন এক আশঙ্কার উদয় হইত; এবং ইতঃপূর্ব্বে নিমাইয়ের নিদ্রিত অবস্থায় বিশ্বরূপের আবির্ভাব, ও তদীয় ভ্রাতাকে বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ; যজ্ঞোপবীতের সময় নিমাইয়ের এই ভাবাবেশ ও প্রহেলিকাপূর্ণ বাক্যাদির বিষয় মনে উদিত হইয়া, তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। তিনি নিমাইকে নিকটে বসাইয়া পড়াইতেন, আর তাঁহার অনুপম মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মনে করিতেন, নিমাই কি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে? আর নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। একদিন ব্যাকুল হৃদয়ে, রঘুনাথ ঠাকুরের নিকট প্রণিপাত করিয়া, বলিলেন, "ঠাকুর! আমার ছেলে যেন সন্ন্যাসী না হয়।" বিশ্বম্ভর তখন একটু দূরে ছিলেন, মিশ্র তাহা জানিতেন না। সন্তানের কর্ণে পিতার প্রার্থনা প্রবেশ করিল। তিনি পিতার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন।

মানুষের মনে যখন যে চিন্তা প্রবল হয়, তখন আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে উহা তাহার মনকে অধিকার করিয়া বসে। নিমাই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবে, এই চিন্তাই জগন্নাথের মনকে প্রবলরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, গৌরের মস্তক মুণ্ডিত, মধ্যে শিখা শোভা পাইতেছে; গৈরিক বসন পরিহিত; হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু,

মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে; গৌর সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত হইয়া, সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; আর অশ্রুজলে তাঁহার নয়নদ্বয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পত্নীকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। শচী দেখিলেন, স্বামীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "নিমাই আমার সর্ব্বদা পাঠে রত থাকে, সে কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে?"

দিন যাইতে লাগিল। জগন্নাথ মিশ্র বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং সেই পীড়াতেই তাঁহার দেহান্তের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইল। জগন্নাথকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার আয়োজন করা হইলে, নিমাই কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন, এবং জাহ্নবী-তীরে গমন করিয়া পিতৃদেবের মৃত্যুশয্যার নিকট বসিয়া, কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন. "বাবা! আমাদের ফেলিয়া তুমি চলিলে, আমাদের আর কে দেখিবে?" জগন্নাথ, সন্তানকে একবার স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন; তাঁহার চাঁদ বদন একবার নিরীক্ষণ করিলেন। পিতা-পুত্রের এই শেষ দেখা। পুরন্দর মিশ্র বিষ্ণু নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

জগন্নাথ পরলোক গমন করিলে, শচীদেবী সন্তানকে লইয়া যেন অকূল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। পরিবার প্রতিপালনের জন্য তিনি কিছুই ধন সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। একদিকে পতি-বিরহ, অপর দিকে সাংসারিক কষ্ট, ইহাতে তাঁহার দেহ মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত। তবু, এ কষ্টের মধ্যেও, তাহার একটু সান্ত্বনা ছিল,—সে সান্ত্বনা নিমাইয়ের মুখ দর্শন। নিমাই যখন মা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন, তখন তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন; এ সংসারে নিমাই ভিন্ন তাঁহার আর কেহই ভালবাসার পাত্র ছিল না। স্বামী নাই, আর অন্য পুত্র কন্যা কেহই

নাই, এইজন্য তাঁহার সকল স্নেহ ও ভালবাসা, তাঁহার একমাত্র পুত্র গৌরচন্দ্রেতেই বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল।

নিমাইয়ের সকল আবদারই তিনি সহ্য করিতেন। তিনি যদি ক্রোধ করিয়া সংসারের কোন বস্তু অপচয় করিতেন, শচী সেজন্য সন্তানকে তিরস্কার বা প্রহার করিতেন না। একদিন নিমাই বিষ্ণুপূজা করিবার জন্য মাতার নিকট হইতে,মালা চাহিলেন ; মাতা মালাকারের নিকট হইতে মালা আনিতে যাইবেন বলাতে, গৌর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং এতক্ষণ মালা আনা হয় নাই বলিয়া, লগুড় হস্তে গৃহের সমস্ত বস্তু ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। চাউল, ডাইল, লবণ প্রভৃতি গৃহতলে ছড়াইয়া ফেলিলেন। ঘৃত ও তৈলের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলাতে, ঘৃত ও তৈল, চারিদিকে গড়াইয়া পড়িল। কেবল ও-সকল নষ্ট করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না,—গৃহ-দেয়ালের অধিকাংশ স্থলের মাটি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নিমাই যখন ক্রোধপরবশ হইয়া, লাঠি হস্তে গৃহের দ্রব্যাদি ভগ্ন করেন, তখন শচী দূরে লুকাইয়া ছিলেন। এখন সন্তান নিদ্রাভিভূত হইলে, আস্তে আস্তে নিকটে আসিয়া, স্নেহভরে পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি পুত্রের জন্য মালাকারের নিকট হইতে মালা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এই প্রাণসম পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! এই মালা নাও, আর বিষ্ণুপূজা কর।" নিমাইয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি দেখিলেন, পুত্রবৎসলা শচীদেবী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার গাত্রে হাত বুলাইতেছেন। নিমাই মাতার হস্ত হইতে, মালা গ্রহণ করিয়া, গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন, এবং আপনার ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। যখন আহার করিতে বসিলেন, তখন শচী মিষ্ট বাক্যে ক্রোধের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বাবা! রাগ করিয়া

কি আপনার ঘরের জিনিষ এইরূপে নষ্ট করিতে হয়, আমাদের ঘরে আর অন্নের সংস্থান নাই।" নিমাই মাতার কথায় আপনার ক্রোধের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কিন্তু সংসারের অভাবের জন্য তাঁহাকে কোন চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেন।

কথিত আছে, সেদিন সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন-স্থান হইতে বাড়ী আসিবার সময়, তিনি কিছুকালের জন্য জাহ্নবী-তটে গমন করেন, এবং তথা হইতে দুই তোলা স্বর্ণ আনিয়া মাতাকে প্রদান করেন। এইরূপে সময়ে সময়ে সংসারের অভাব হইলে, তিনি জননীকে স্বর্ণ আনিয়া দিতেন। পুত্র কোথা হইতে স্বর্ণ আনিয়া, তাঁহাকে প্রদান করিতেছে, জননী তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না।

জগন্নাথের পরলোকগমনের পর, নিমাইয়ের জননী শোকে অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সন্তানের জন্য তিনি সে শোকের আবেগ সম্বরণ করিতেন। তিনি জানিতেন যে, নিমাইয়ের হৃদয় অতি কোমল ও স্নেহপ্রবণ; তিনি স্বামি-শোকে অধৈর্য্যা হইয়া ক্রন্দন করিলে, সন্তানের মনে পিতৃশোক উদ্দীপ্ত হইয়া, তাহার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিবে। এই পতিপ্রাণা নারী তাঁহার এই একমাত্র পুত্রের মুখ দেখিয়াই শোকাবেগ হৃদয়েই আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।

কিন্তু স্বাভাবিক গতিকে একেবারে কে রোধ করিতে পারে? সময়ে সময়ে তাঁহার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া সে বেগ উথলিয়া উঠিত; শচীদেবী তখন ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন। তখন নিমাই মাকে অনেক সান্ত্বনা দিতেন, বলিতেন, "মা, যিনি সকলের অভাব মোচন করেন, তিনিই আমাদের দেখিবেন।" শচীদেবী পুত্রের মুখ হইতে মধুর ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা শ্রবণ করিয়া, নিজের অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিতেন, আর তাঁহার এই নয়নচাঁদকে ক্রোড়ে লইয়া, সে চাঁদ বদনে চুম্বন করিয়া, প্রাণে শান্তি অনুভব করিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

গৌর পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পুরন্দর মিশ্র পরলোক গমনের পূর্ব্বেই সন্তানকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। গৌর এখন আবার পাঠার্থ গঙ্গাদাসের নিকট গমন করিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যাকরণে নবদ্বীপের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন; তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল। পুরন্দর মিশ্র পরলোক গমন করিলে, শচীদেবী তাঁহার বাটীতে গমন করেন, এবং গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পিতৃহীন নিমাইয়ের প্রতি তিনি স্নেহদৃষ্টি রাখিয়া, তাহার শিক্ষা দানে মনোযোগী হন, এ-বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। গঙ্গাদাস শচীদেবীর কথা শ্রবণ করিয়া বলেন, "নিমাইয়ের ন্যায় ছাত্র পাইয়া তিনি পরম সুখী হইয়াছেন; এইরূপ ছাত্র পাইয়া তিনি নিজেকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।" পুরন্দর-পত্নী অধ্যাপকের মুখ হইতে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

নিমাই কেবল যে তাঁহার জননীর আদরের সামগ্রী, তাহা নহে; নিমাইকে সকলেই ভালবাসিত। তাঁহার মুখ দেখিলেই লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। গঙ্গাদাস পণ্ডিত কি এমন ছাত্রকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার চিত্তহারী রূপ দেখিয়া তিনি ত মুগ্ধ হইতেনই, তদুপরি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দর্শন করিয়া, তিনি সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেন। তিনি আপনার সন্তানের ন্যায় গৌরাঙ্গকে ভালবাসিতেন।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে মুরারি গুপ্ত পাঠ করিতেন। গৌরের সঙ্গে তাঁহার তর্ক বাধিয়া যাইত। মুরারি গৌরের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু তিনি এই প্রতিভাশালী বালকের নিকট পরাস্ত হইতেন। গৌর হাসিয়া বলিতেন, "যাও, লতা পাতা লইয়া থাক, ব্যাকরণে বুৎপত্তি লাভ করা সামান্য নহে।" এই সকল কথা বলিয়া, গৌর তাঁহার সহিত আমোদ করিতেন, আর হাসিতে হাসিতে প্রেমের সহিত তাঁহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিতেন। সে সুকোমল হস্তের স্পর্শে মুরারির শরীর যেন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তিনি সে মনোহর মুখখানি অনিমিষ লোচনে দর্শন করিতেন, আর বলিতেন, 'এ বালক কি নরলোকের না কোন দেবকুমারের ?'

নিমাই অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্যাকরণে, চতুষ্পাঠীর সকল ছাত্রের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। এই ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ব্যাকরণের একখানি টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এই টিপ্পনীর সাহায্যে চতুষ্পাঠীর অনেক ছাত্র বিশেষ উপকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে টিপ্পনীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

তখন নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা গঙ্গায় স্নান করিতে যাইয়া, শাস্ত্রাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। গৌর তর্কযুদ্ধে কেশরী ছিলেন। তিনি স্নানের সময় অন্যান্য চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। সময়ে সময়ে ঘোরতর তর্ক বাধিয়া যাইত, কিন্তু সকল সময়েই নিমাই সকলকে পরাস্ত করিয়া, আপনার বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় দান করিতেন।

গঙ্গাদাসের এই প্রতিভাশালী ছাত্র কেবল যে বুদ্ধিমত্তার ও প্রতিভার পরিচয় দানে শিক্ষকের মুখ উজ্জ্বল করিতেন তাহা নহে, গৌর সন্তরণ বিদ্যাতেও বেশ পটু ছিলেন। জাহ্নবীর বক্ষে কোমরে গামছা

বাধিয়া সঙ্গীদিগের সঙ্গে আমোদ করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত সন্তরণ দিয়া যাইতেন। কখন কখন সন্তরণ দিয়া এপার হইতে ওপারে গিয়া উপস্থিত হইতেন।

গৌরাঙ্গের ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হইল। এই ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই তাঁহার অদ্ভুত বুদ্ধির প্রশংসা করিত। গৌর গঙ্গাদাসের নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক চতুষ্পাঠী হইতে বিদায় লইলেন। বিশারদ সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠী তখন নবদ্বীপের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্র আলোচনার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নিমাই এখন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিলেন। সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে অন্যান্য ছাত্রের মধ্যে রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। নিমাই যখন চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন রঘুনন্দন ভাবিলেন, গৌরের নিকট তাঁহার বুদ্ধি অতি ক্ষীণপ্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাঁহার জ্ঞান-গরিমা খর্ব্ব হইয়া যাইবে, যে-স্থানে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরি-গণিত হইতেন, সে-স্থানে গৌরের প্রতিভা জয়যুক্ত হইবে। এই সকল তাঁহার মনে উদিত হইয়া, তাঁহার হৃদয়ে এক কালিমার রেখা নিপতিত হইল। গৌর সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া অতি উৎসাহের সহিত ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে গৌর ব্যাকরণে যেমন প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্রেও সেইরূপ প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। সকল স্থলেই গুরু ও তাঁহার সমপাঠীরা তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ও সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেন।

গৌর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া একখানি ন্যায়ের টীকা রচনায়

প্রবৃত্ত হন। ইতঃপূর্ব্বেই, রঘুনাথ একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি এই টীকা রচনা করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার টীকা সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, এবং তিনিই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইবেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে, গৌরও একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন তখন তাঁহার আশার প্রদীপ যেন নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আসিল। তিনি উৎসুক হইয়া গৌরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমিও নাকি একখানি ন্যায়ের টীকা প্রস্তুত করিয়াছ?" রঘুনাথ যখন শুনিলেন যে, তিনিও একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তখন তিনি গৌরের টীকা শুনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গৌর তাহা করিতে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—যখন ওপারে নৌকা করিয়া যাওয়া হইবে, তখন আমি তোমাকে উহা পাঠ করিয়া শুনাইব। উভয়ে যখন গঙ্গাবক্ষ দিয়া, তরণী করিয়া যাইতেছিলেন, তখন রঘুনাথ উহা শ্রবণ করিবার জন্য গৌরকে অনুরোধ করিলেন। গৌর টীকা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথ নিবিষ্ট মনে উহা শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রঘুনাথের চক্ষু দিয়া জল বহিতে লাগিল, তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌর রঘুনাথকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিলেন, "ভাই, কাঁদ কেন? কি হয়েছে বল।" এই বলিয়া তাঁহার গাত্রে আপনার সুকোমল হস্ত স্থাপন করিলেন। রঘুনাথ ভগ্নহৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই, নিমাই, আমি দীধিতি লিখিয়া মনে করিয়াছিলাম, আমার টীকাই সর্ব্বজন-আদৃত হইবে—সকল চতুষ্পাঠীতে আমার টীকা পঠিত হইবে। এখন দেখিতেছি, তোমার টীকার কাছে, আমার টীকা স্থান পাইবার উপযুক্ত নয়। আমি এক পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি, তুমি দুই একটী সূত্রের মধ্যেই তাহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছ। তোমার টীকা প্রকাশিত হইলে, আমার টীকা আর কে গ্রহণ করিবে?" উদার-

হৃদয় পণ্ডিতবর নিমাই সকরুণ বাক্যে বলিলেন, "এর জন্য আর দুঃখ কি ?" এই বলিয়া স্বরচিত হস্তস্থিত টীকাখানি ভাগীরথীর খরতর স্রোতে চিরদিনের জন্য নিক্ষেপ করিলেন।

প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গৌরচন্দ্রের ন্যায়ের টীকা গঙ্গার জলে নিক্ষেপের কথা, কেবল নবদ্বীপে নয়, দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই কথা শ্রবণে সকলেরই কণ্ঠ হইতে সরবে বা নীরবে, এ-কথা উত্থিত হইয়াছিল—"নিমাই পণ্ডিত কি মানুষ না দেবতা ?"

গৌর বিশারদের চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধির জন্য তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। নবদ্বীপ নগরে সকল চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে তাঁহার নাম সর্ব্বোপরি শোভা পাইতে লাগিল। তিনি জয়-পতাকা হস্তে লইয়া, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠী হইতে বহির্গত হইলেন।

এই প্রতিভাশালী জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি কি জ্ঞান বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারেন ? নিমাই নিজে চতুষ্পাঠী স্থাপনের সংকল্প করিলেন। নবদ্বীপের মুকুন্দ সঞ্জয় নামক এক ধনী ব্যক্তির চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই পণ্ডিত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। প্রতিভা অপূর্ব্ব পদার্থ! উহা যে মানবকে স্পর্শ করে তাহার শক্তি সাধারণ লোক অপেক্ষা, অধিকতররূপে ফুটিয়া উঠে। নিমাই পণ্ডিত যখন মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোল বৎসর মাত্র। তৎকালে নবদ্বীপে অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতদিগের চতুষ্পাঠী ছিল; কিন্তু নিমাই পণ্ডিত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছেন, শুনিয়া, দলে দলে পাঠার্থীরা তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল। তাঁহার শিক্ষার প্রণালী, ছাত্রদিগের

প্রতি তাঁহার মিষ্ট ব্যবহার, এই সকল গুণে তাঁহার চতুষ্পাঠীর প্রশংসা সকলের মুখে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। গৌর কেবল চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, তিনি বহুসংখ্যক ছাত্র লইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় জাহ্নবী-তটে গমন করিতেন, এবং এই সকল ছাত্রদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া, শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে সহস্রাধিক ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

নিমাই বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে গাম্ভীর্য্য দেখা যাইত না। তাঁহার সময়ে শ্রীহট্টের আরও অন্যান্য লোক নবদ্বীপে আসিয়া বাস করে। অনেকে সংস্কৃত শিক্ষার এই প্রধান স্থানে অধ্যয়নার্থ আগমন করিতেন। মুকুন্দ দত্ত একজন শ্রীহট্টবাসী। তিনি অন্য চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। মুকুন্দ একজন সুগায়ক ছিলেন, তিনি, অদ্বৈতাচার্য্য-প্রমুখ বৈষ্ণবদলের সঙ্গে মিলিত হইয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্ম আলোচনা করিতেন, এবং অবসর সময় মধুর স্বরে গান করিয়া, বৈষ্ণবদলের তৃপ্তি সাধন করিতেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ পথে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে মুকুন্দ তাঁহাকে দেখিয়া, পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছেন, গৌর নিকটস্থ লোকদিগকে বলিলেন, "এ আমায় দেখিয়া এইরূপ ভাবে পলাইয়া যায় কেন?" এই কথা বলিয়া তিনি মুকুন্দকে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি আমায় দেখিয়া পলাইয়া যাও কেন? আমি তোমাকে এমন করিয়া আবদ্ধ করিব যে তুমি আর আমায় ছেড়ে পলাইতে পারিবে না।" মুকুন্দ মনে করিলেন নিমাই ত ব্যাকরণে দক্ষ, ইনি ত আর অলঙ্কার ভাল জানেন না, এখন ইঁহাকে অলঙ্কার বিষয়ে প্রশ্ন করা যাক্, তাহা হইলে ইনি পরাস্ত হইবেন। এই স্থির করিয়া, তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। গৌর তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন। মুকুন্দ প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া, অবাক্ হইয়া গেলেন, আর মনে মনে

বলিতে লাগিলেন, "এমন পণ্ডিত ত আর দেখি নাই, সকল বিষয়েই ইঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিতেছি ; এমন লোক যদি ভক্তিপথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে, বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ মঙ্গল হয়।" গৌরাঙ্গ সকলের সমক্ষে বলিলেন, "আমি যদি বৈষ্ণব হই, তাহা হইলে এমন বৈষ্ণব হ'ব যে দেবতারাও সেরূপ হইতে পারিবেন না।"

আর একদিন গৌর গদাধর মিশ্রকে পথে দেখিতে পাইলেন। ইনি ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতেন, গৌরাঙ্গ তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুক্তি কাহাকে বলে ?" গদাধর বলিলেন, "আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নাম মুক্তি।" গৌর প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিয়া, মুক্তি বিষয়ে অতি বিশদরূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে এক ঘটনা ঘটিল। নিমাই গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় একটি পরমাসুন্দরী বালিকা গৌরাঙ্গের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যায়। সুন্দরী, গৌরের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিল। গৌরও মেয়েটির দিকে তাকাইয়া তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন। গৌরেরও প্রাণ তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। সেদিন এই পর্য্যন্ত। আর একদিন বনমালী ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে গৌর বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়, ঘটনাক্রমে ঐ মেয়েটি তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। প্রেমের মিলন কে নিবারণ করিতে পারে ? মেয়েটিকে দেখিবামাত্র, গৌরের হৃদয়ে ভাবতরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিল। তিনিও সেই সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকান, আর সেই মেয়েটিও, এই অপরূপ-রূপলাবণ্য-জড়িত যুবা পুরুষের চক্ষের উপর আপনার চক্ষের পলক ফেলিতে লাগিল। বনমালী সবই দেখিলেন, আর উভয়ের মনের ভাব পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এ মেয়েটি বল্লভাচার্য্যের কন্যা, নাম লক্ষ্মী। বনমালী একজন ঘটক।

বনমালী শচীদেবীর নিকট যাইয়া, বল্লভাচার্য্যের এই লক্ষ্মী নাম্নী

কন্যার সহিত গৌরের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। শচীদেবী এই প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, "আমার নিমাই, এখন বালক, এখন বিদ্যা শিক্ষা করুক।" এই সকল কথার দ্বারা তিনি বিবাহের অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বনমালী নিরাশ মনে চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে, গৌরের সহিত তাঁহার দেখা হইল। গৌর বনমালীকে একটু বিরক্ত-বদনে যাইতে দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, সকলই অবগত হইলেন। গৌর আর কিছু না বলিয়া, বাড়ীতে গেলেন, এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, বনমালী আমাদের বাটীতে এসেছিলেন শুনিলাম, তিনি কেন এমন বিমর্ষ মনে ফিরিয়া যাইতেছেন?" জননী সন্তানের কথায় সকলই বুঝিলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া, বনমালীকে ডাকিয়া, বল্লভাচার্য্যের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বলিলেন। এমন গুণবান সন্তানকে কে না কন্যা দিতে ইচ্ছা করে? বল্লভাচার্য্য বনমালীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে শুভ লগ্নে বিবাহের দিন স্থির হইল। শচীর গৃহে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন মিলিত হইলেন; নারীরা আসিয়া সমবেত হইলেন। আনন্দ-কোলাহলে বাটীর প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইল। শচী সকলের নিকট বিনীতভাবে বলিলেন, "আমরা দরিদ্র, তাহাতে আবার নিমাই পিতৃহীন, আমি তোমাদের উচিত মত সেবা করিতে পারিব না।" এমন সময়ে শচী দেখিলেন, বিশ্বম্ভর বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। শচী, সন্তানকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, দৌড়িয়া আসিয়া নিজের অঞ্চল দিয়া, তাঁহার চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "বাবা, কাঁদ কেন, তোমার কি হইয়াছে?" গৌর, ভ্রাতা ও পিতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আজ, বাবা দাদা থাকিলে কত আনন্দ হইত!" জননীও কাঁদিতে কাঁদিতে সন্তানকে সান্ত্বনা দিলেন।

বিবাহের সকল আয়োজন স্থির হইলে, গৌর বল্লভাচার্য্যের বাড়ীতে গমন করিলেন। লক্ষ্মী, গৌরের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। শঙ্খধ্বনি ও

নারীদিগের হুলুধ্বনির মধ্যে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। পরদিবস গৌর লক্ষ্মী সহ আপনার বাটীতে আগমন করিলেন। শচী, নব বধূকে আপনার অঙ্কে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে মুখচুম্বন করিলেন। কুলনারীদিগের মঙ্গল ধ্বনির মধ্যে লক্ষ্মী স্বামি-গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৌর পত্নীকে লইয়া গৃহস্থালী করিতে লাগিলেন।

পরম ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য ঈশ্বরপুরী একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। এখানে ঈশ্বরপুরীর একটু পরিচয় দান করা আবশ্যক। ইনি হালিসহর গ্রামে বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরম ভক্ত ছিলেন। সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। ইনি রসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নামক একখানি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ভক্ত পুরী দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। এ-সময় তিনি নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং বৈষ্ণবদিগের শিরোভূষণ অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। অদ্বৈত-প্রমুখ বৈষ্ণবেরা প্রথমে তাঁহার কিছুই পরিচয় পান নাই। অদ্বৈত, পুরীর গম্ভীর, প্রশান্ত ও ধর্ম্মভাব-পূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া, তিনি বৈষ্ণব কিনা, এবিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। পুরী তদুত্তরে বলেন যে, তিনি সামান্য লোক ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরে তাঁহারা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। ঈশ্বরপুরী সুপণ্ডিত ও অনুরাগী বৈষ্ণব। তিনি অদ্বৈতা-চার্য্যের ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী তাঁহাকে পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন, এবং এই পণ্ডিত ও ভক্তের নিকট ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যবৃন্দের সহিত প্রায়ই নগর ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। একদিন ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। নিমাই পণ্ডিতের নাম চারিদিকেই প্রচারিত হইয়াছিল। পুরী গৌরকে দেখিয়া যেন বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। উভয়ের কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর তাঁহারা

পরস্পর বিদায় লইলেন। এই সাধু পুরুষকে দেখিয়া, গৌরের হৃদয়ে ভক্তি-তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রতিদিন অদ্বৈত-ভবনে এই পরম ভক্তকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিবার জন্য গমন করিতে লাগিলেন।

পুরী, "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একদিন গৌরাঙ্গকে বলিলেন, "আমার রচিত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কোন দোষ থাকে তাহা আমাকে বলিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবে না।" গৌর, পুরীর ঈদৃশ অনুরোধ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আপনি ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহাতে আর দোষ কি? ইহার ত্রুটি দেখাইলে অপরাধ হইবে।" পরে পুরীর অনুরোধে তিনি পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কোন কোন স্থলে ব্যাকরণ দোষ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরপুরী ও শ্রীগৌরাঙ্গ, উভয়ের মধ্যে যেন এক অদৃশ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে পুরী নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচার

নবদ্বীপে পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারার্থ এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগমন করেন। ইঁহার নাম কেশব। নিবাস কাশ্মীরে। এই জন্য ইঁহাকে কেশব কাশ্মীরী বলা হইত। পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী নবদ্বীপে

আগমন করিয়া, পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিতে প্রস্তুত হন। তিনি নবদ্বীপে আগমন করিয়া বলেন, পণ্ডিতেরা আমার সহিত বিচার করুন, অথবা তাঁহারা আমার নিকট পরাস্ত হইলেন বলিয়া, আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিন। দিগ্বিজয়ী বলিলেন যে, তিনি সকল শাস্ত্র বিষয়েই বিচার করিতে প্রস্তুত আছেন। কেশব কাশ্মীরী সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া বিদিত। ইঁহার আগমনে নবদ্বীপের খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা, কেহই ইঁহার সহিত বিচারে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন, দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচারে পরাস্ত হইলে, নবদ্বীপের কলঙ্ক হইবে। কেশব কাশ্মীরী দেখিলেন, কেহই তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে সমকক্ষ নয় বলিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন না।

গৌর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময় তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে দিগ্বিজয়ীর আগমন-বার্ত্তা ও তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিলে, নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন, এইরূপ জয়পত্র তাঁহাকে লিখিয়া দিতে হইবে।" নিমাই পণ্ডিত ছাত্রদিগের মুখ হইতে দিগ্বিজয়ীর কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর অহঙ্কারীর অহঙ্কার চিরদিনই চূর্ণ করিয়া থাকেন।"

নিমাই সন্ধ্যার সময় জাহ্নবীর তীরে শিষ্যবৃন্দের সহিত বসিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত আছেন, চন্দ্রালোকে চারিদিক আলোকিত; এমন সময়, দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরী দূর হইতে, নিমাই পণ্ডিত শিষ্যবৃন্দের সহিত গঙ্গার তীরে রহিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর ও তদীয় শিষ্যেরা সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী গৌরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমারই নাম নিমাই পণ্ডিত? তুমি না ব্যাকরণে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছ?"

গৌর। ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু এখনও উহার তাৎপর্য্য ভাল-করিয়া বুঝিতে সমর্থ হই নাই।

দিগ্বিজয়ী। না, আমি শুনেছি, তুমি ব্যাকরণে অদ্বিতীয়।

তৎপরে দিগ্বিজয়ী তাঁহার সহিত গৌরাঙ্গকে শাস্ত্রালোচনা করিতে বলিলেন। গৌর বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে শাস্ত্র-বিষয়ে আলোচনা করি, আমার এমন কি ক্ষমতা আছে? আপনি দিগ্বিজয়ী, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে শাস্ত্রের কথা কিছু বলুন।"

দিগ্বিজয়ী। কোন্ শাস্ত্র? কোন্ বিষয় তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর?

গৌর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এই গঙ্গার মাহাত্ম্য বিষয়ে আপনি কিছু বর্ণনা করুন।" দিগ্বিজয়ী গৌরের কথা শুনিয়া গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন।

দিগ্বিজয়ী গঙ্গার মাহাত্ম্য বিষয়ে প্রায় একশত শ্লোক বলিয়া গেলেন। বলা শেষ হইলে গৌর তাহার মধ্যে একটি শ্লোক উল্লেখ করিয়া দিগ্বিজয়ীকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কেশব কাশ্মীরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "শত শ্লোক বলিয়া গেলাম, ইহার মধ্যে তুমি কিরূপে উহা স্মরণ করিয়া যথাযথ শ্লোকটি উল্লেখ করিলে?" গৌর একটু হাসিয়া বলিলেন, "সরস্বতীর বরে কেহ শাস্ত্র-বেত্তা হয়, আর কেহ বা শ্রুতিধর হয়।"

গৌর। যাহা হউক, আপনি শ্লোকটির দোষ গুণ বিচার করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

দিগ্বিজয়ী। শ্লোকের দোষ দেখি না।

গৌর তৎপর বিনীতভাবে দোষ গুণ প্রদর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া শ্লোকটির মধ্যে ব্যাকরণের ও অলঙ্কার-ঘটিত দোষগুলি দেখাইয়া দিলেন, এবং যাহা প্রশংসনীয় সে-বিষয়ও উল্লেখ করিলেন।

দিগ্বিজয়ী, গৌরের মুখ হইতে শ্লোকের বিবিধ দোষের উল্লেখগুলি

যথাযথ মনে করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। গৌরের শিষ্যেরা দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কার চূর্ণ হইল দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। গৌর তাঁহাদিগকে একটু মৃদুস্বরে ভৎ´সনা করিয়া, দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি এজন্য দুঃখিত হইবেন না। আপনি যে অল্পকালের মধ্যে একশত কবিতা অনর্গল বলিয়া গেলেন, ইহাতে আপনার আশ্চর্য্য কবি-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠদিগেরও কবিতার দোষ দৃষ্ট হয়। আপনার কবিতায় সামান্য দোষই প্রকাশ পাইতেছে।"

দিগ্বিজয়ী অবশেষে গৌরের জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তুমি অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও অলঙ্কারে এত জ্ঞান লাভ করিয়াছ, এই আশ্চর্য্যের বিষয়।" এই বলিয়া দিগ্বিজয়ী চলিয়া গেলেন।

কেশব কাশ্মীরী সর্ব্বজন-সমক্ষে এক তরুণ বয়স্ক যুবাপুরুষের নিকট পরাভূত হইয়া মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার আরাধ্যা দেবী সরস্বতীকে বলিলেন, "মা, তুমি আজ বালকের নিকট আমাকে অপমানিত করিলে?" বীণাপাণি তদুত্তরে বলিলেন, "গৌর যে ভগবানের অবতার।" প্রভাতের সূর্য্য আকাশে উদিত হইবার পরেই, দিগ্বিজয়ী বিনীতভাবে গৌরের নিকটে আসিয়া, তাঁহার চরণদ্বয়ের নিকট মস্তক নত করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব-বঙ্গে গমন

দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরী নিমাই পণ্ডিতের নিকট পরাস্ত হইলে, গৌরের যশঃনিনাদে চারিদিক নিনাদিত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গের গৌরবে নবদ্বীপের গৌরব বাড়িয়া গেল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, নিমাইয়ের ন্যায় পণ্ডিত আর নাই। পথে, বাজারে, ঘরে, চতুষ্পাঠীতে সর্ব্বত্রই ঐ একই কথা, নিমাই পণ্ডিতের মত আর বড় পণ্ডিত কেহই নাই।

নিমাই কেবল পণ্ডিত নহেন। তিনি হৃদয়বান্ লোক। তিনি লক্ষ্মীদেবীর সহিত যখন পরমানন্দে গৃহাশ্রমে বাস করিতেন, তখন তাঁহার বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইলে, কেহ আর তাঁহার আতিথ্যসৎকারে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। তাঁহার গৃহের দ্বার সর্ব্বদাই অতিথির জন্য উন্মুক্ত থাকিত। লক্ষ্মীদেবী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন। অল্প বয়সে তিনি রন্ধনে বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে প্রতিদিন প্রায় বিশ বাইশ জন অতিথি আহার করিত। লক্ষ্মীদেবী প্রায়ই গৃহের এই সকল আগন্তুকের অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন। যে তাঁহার বাড়ীতে আগমন করিত, গৌরের ব্যবহারে সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত।

কিছুদিন পরে নিমাইয়ের পূর্ব্ব-বঙ্গ যাইবার বাসনা মনে উদিত হইল। মাতৃভক্ত নিমাই সে-জন্য মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গৌর তাঁহার নয়নের মণি, নিমেষকাল তাঁহার অদর্শনে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে; তিনি বহুদূরদেশে যাইবেন, ইহা কি তাঁহার সহ্য হয়? কিন্তু কি করেন, সন্তানের মনের প্রবল বাসনা রোধ করাও ভাল নয়, এই

ভাবিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার যদি একান্তই ইচ্ছা হয়, যাও।" গৌর মাতার আজ্ঞা পাইয়া, কয়েকজন শিষ্য লইয়া, পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিলেন। তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে বোধ হয়, ঐদেশের যে-সকল স্থলে চতুষ্পাঠী ছিল, এবং যে-সকল স্থলে পণ্ডিতদিগের বসতি ছিল, সেই সকল স্থলেই তিনি গমন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে উপস্থিত হইলে, চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা তাঁহার নিকট আগমন করে। পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার নাম পূর্ব্বাঞ্চলের চারিদিকেই ঘোষিত হইয়াছিল। গৌর দেখিলেন, তাঁহার ব্যাকরণের টিপ্পনী ও-অঞ্চলের সকল চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরাই অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই ছাত্রেরা আসিয়া তাঁহার নিকট ব্যাকরণের পাঠ লইত, ও অন্যান্য শাস্ত্রাদির জ্ঞাতব্য বিষয় সকল, মীমাংসা করিয়া লইত।

তপন মিশ্র নামে একজন অতি সাধুপুরুষ পূর্ব্ব-বঙ্গের কোন অঞ্চলে বাস করিতেন। গৌরচন্দ্রের আগমনে তাঁহার প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তিনি গৌরকে দেখিয়া, যেন আকাশের চন্দ্র প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; তাঁহার ভক্তিপ্রবণ হৃদয়, গৌর দর্শনে, যেন ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি এ-সময় এক মধুর স্বপ্ন দেখিলেন; কে যেন তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "গৌর মনুষ্য নয়, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বরের অবতার।" তপন মিশ্র এই স্বপ্ন দর্শনে, পরদিন আগমন করত, গৌরের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলিলেন, "প্রভো, আমি জেনেছি, আপনি মনুষ্য নন, স্বয়ং ভগবান। প্রভো! আমি আপনার সঙ্গের সাথী হইয়া থাকিব।" গৌর, তপন মিশ্রের ব্যাকুলতা দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। গৌর বুঝিলেন, তপন যথার্থই

ভক্ত। তিনি তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া বলিলেন, "তুমি স্ত্রী-পুত্র লইয়া, বৃন্দাবনে গমন কর, পরে তোমার সহিত তথায় আমার সাক্ষাৎ হইবে।" তিনি সে-সময়, তপন মিশ্রকে, কেন বৃন্দাবনে বাস করিতে বলিলেন, তাহা বুঝা যায় না; আর তিনি যে ভবিষ্যতে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া, বৃন্দাবনে যাইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, ইহাও তিনি কিরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

পূর্ব্বাঞ্চলে কয়েক মাস বাস করিয়া, গৌরসুন্দর গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় অবস্থিতিকালে তিনি অনেক বস্তু উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগত হইবার সময় ঐ সকল দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এ-সময় তদ্দেশীয় কয়েকজন ছাত্রও তাঁহার চতুষ্পাঠীতে পাঠ করিবার জন্য তাঁহার অনুগমন করে। বহুদিন পরে, মাতার ও পত্নীর মুখ দর্শনে কত সুখী হইবেন, মনে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া মাতার চরণে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। বহুদিন পরে সন্তানের আগমনে জননীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে; সন্তানের সঙ্গে বিদেশে-ভ্রমণের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবেন, কিন্তু তাহা না হইয়া, শচীদেবীর মুখ মলিন হইয়া রহিয়াছে। তিনি বিশেষ কোন কথা বলিলেন না। গৌর ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মায়ের মুখ এমন বিষণ্ণ কেন, কিছু বিপদ ঘটিয়াছে। এমন সময় শচী আপনার অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "বাবা, লক্ষ্মী আর নাই, সে পরলোকে চলে গেছে; সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

গৌরের কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি আপনার গণ্ডে হস্ত দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মনকে স্থির করিয়া, মাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "মা, সকলই অসার, বৃথা শোক করিয়া আর কি লাভ।"

নিমাই পণ্ডিতের প্রশংসায় চারিদিক পূর্ণ হইলেও, নিমাইয়ের বালকের ন্যায় সরলতা এখনও দেখা যাইত। লোকেও বলিত, নিমাই এত বড় পণ্ডিত, কিন্তু এখনও তাঁহার বালকত্ব ঘুচিল না। গৌর একদিন তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে যাইতেছেন এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত বৈষ্ণব। অদ্বৈতাচার্য্য ব্যতীত, তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে আর উপযুক্ত সম্মানিত ব্যক্তি কেহই ছিল না। শ্রীবাস গৌরকে জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এজন্য, তাঁহাকে সশিষ্যে আসিতে দেখিয়া অহঙ্কারীর শিরোমণি বলিয়া সম্বোধন করিলেন। গৌর অবনত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ভক্তের ন্যায় বলিলেন, "নিমাই, কেবল জ্ঞান উপার্জ্জনে কি ফল? শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি না হইলে মানব-জীবন বৃথা।" গৌর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমি ভবিষ্যতে এমন বৈষ্ণব হইব, যে তেমন কেহই আর হইতে পারে নাই।" নিমাইয়ের দম্ভপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিতে লাগিলেন, নিমাইও তৎসঙ্গে একটু হাসিলেন। শ্রীবাস তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে, গৌর বলিলেন, "আমিই ভগবান।" এই সকল কথা বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। গৌর শ্রীবাসের কথায় এইরূপ উত্তর দান করিয়া চলিয়া গেলেও, শ্রীবাস মনে করিলেন, জগন্নাথ মিশ্র বৈষ্ণব, নিমাইও একদিন বৈষ্ণব হইবে। শ্রীবাস ও তাঁহার পত্নী মালিনী দেবী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহারা শৈশব কালে গৌরকে ক্রোড়ে করিয়া অঙ্গ শীতল করিতেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাজারে শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীগৌরাঙ্গ ছাত্রদিগের সঙ্গে নগরের চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাম্বূল চিবাইতে চিবাইতে গমন করিতেন, আর সঙ্গীদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতেন। দেখিলে মনে হইত, যেন এক আনন্দের উৎস সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয় হইতে উথলিয়া উঠিতেছে। গৌরচন্দ্রের বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই আনন্দে ভরা; তাঁহাকে দেখিলে লোকে মুগ্ধ হইত। তাঁহার এমন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে লোককে বশীভূত করিয়া ফেলিতে পারিতেন। তিনি একদিন ছাত্রদিগকে বলিলেন, "চল বাজারে যাই, অনেক জিনিষপত্র কিনিতে হইবে।" ছাত্রেরা দেখিলেন, গুরুর হাতে একটি কপর্দ্দকও নাই। তাঁহারা বলিলেন, "কাছে ত জিনিষ কিনিবার কোন মূল্য দেখিতেছি না।" গৌর বলিলেন, "মূল্যের প্রয়োজন নাই। চল যাই, মিষ্ট কথা বলিয়া জিনিষ আনিতে পারিব।"

ছাত্রেরা নিমাইয়ের সঙ্গে হাটে প্রবেশ করিলেন। গৌর এক তন্তুবায়ের দোকানে গেলেন। তিনি তাহার দোকানে যাইবামাত্র সে আদর পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিতে বলিল। গৌর বলিলেন, "ভাল কাপড় বাহির কর দেখি।" তন্তুবায় কাপড় দেখাইলে, তিনি কাপড় হাতে করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কাপড়খানি বেশ, কিন্তু হাতে পয়সা নাই, কিরূপেই বা কিনি?" তন্তুবায় বলিল, "তুমি ঠাকুর এখন না হয়, যখন সুবিধা হ'বে, তখন ইহার দাম দিও।" নিমাই বলিলেন, "ধারে কোন জিনিষ কেনা ভাল নয়।" তখন তন্তুবায় বলিল, "ঠাকুর, তুমি এ কাপড় নিয়ে যাও, তোমাকে

আর দাম দিতে হ'বে না।" গৌর আনন্দিত মনে কাপড় লইয়া, শিষ্যদিগের নিকট আসিয়া বলিলেন, "এই দেখ, বিনামূল্যে কাপড় পেয়েছি।"

সর্ব্বজনপ্রিয় গৌর গোয়ালার বাড়ীতে গমন করিলেন। গোপগণ তদীয় রূপকান্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। গৌর যাইবামাত্র, তাহারা অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে বসিতে আসন প্রদান করিল। অনেকে 'মামা মামা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহারা দুগ্ধ, দধি, নবনীত আনিয়া উপস্থিত করিল।

গৌর তাম্বূলীর দোকানের নিকট যাইবামাত্র, পানবিক্রেতা অতি সুন্দররূপে পানের খিলি সাজিয়া, তাঁহার হাতে দিল। গৌর পানের খিলিটি হাতে করিয়া বলিলেন, "পান ত দিলে, কিন্তু হাতে ত পয়সা নাই।" তাম্বূলী বলিল, "আমি ইহার পয়সা চাই না। তুমি খাইয়া সুখী হ'লেই আমি সুখী হ'ব।"

গৌর গন্ধবণিকের ঘরে গমন করিলে, সে সম্ভ্রমে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বসিতে আসন দান করিল; এবং সুগন্ধি দ্রব্য প্রদান করিয়া বলিল, "আমি তোমার নিকট হ'তে কিছুই চাই না, এই সুগন্ধি দ্রব্য কাপড়ে লাগাইলে, কাপড় ধৌত করিলেও আট দিনে ইহার গন্ধ যাবে না।"

এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি শঙ্খবণিকের নিকট গেলেন। সে গৌরচাঁদকে বসিতে আসন দান করিলে, গৌর বলিলেন, "ভাই, ভাল শাঁক নিয়ে এস, কিন্তু হাতে পয়সা নাই।" শঙ্খবণিক খুব ভাল শঙ্খ বাছিয়া তাঁহার নিকট আনিয়া বলিল, "শঙ্খ লইয়া ঘরে যাও, যখন সুবিধা হইবে, তখন মূল্য দিও।" গৌর আনন্দিত মনে শঙ্খ হাতে করিয়া গৃহে চলিলেন।

গৌর এক জ্যোতিষীর নিকট গেলেন। গণক ঠাকুর তাঁহাকে

দেখিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দান করিলেন। গৌর বলিলেন, "তুমি, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সকল বিষয়ই বলিতে পার, আচ্ছা বল দেখি, আমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম?" জ্যোতিষী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেন। তিনি এইরূপে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন, গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; ব্রজের বালকগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আবার ক্ষণকাল পরে দেখিলেন, তিনি ত্রিভঙ্গ বেশে মুরলী বাজাইতেছেন। জ্যোতিষী দিব্যচক্ষে দেখিলেন, আর গণনার দ্বারা জানিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপ ধারণ করিয়া, নবদ্বীপে গৌরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। জ্যোতিষী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। দেখিলেন, গৌরাঙ্গ তথায় বসিয়া রহিয়াছেন; তিনি তখন তাঁহার বদনমণ্ডলে যেন এক অপরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে লাগিলেন। গৌরের সে রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে করিতে, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল; তিনি গৌররূপধারী গোকুলের সেই শ্রীকৃষ্ণকে যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন; আর আনন্দে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, এমন লোকের জীবন-ঘটনা গণনা করিয়া, আমার জীবন আজ ধন্য হইল। তিনি গৌরের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া, তদীয় পূর্ব্ব-জন্মের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গৌর ঈষৎ হাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন। মানবজীবনের ভবিষ্যৎ গণনায় সময়ে সময়ে সত্য ফলই প্রসব করিয়া থাকে দেখা যায়। কিন্তু ভবিষ্য গণনা যে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারা যায় না। গৌর সম্বন্ধে গণকের গণনা, অনেকাংশে সত্য বলিয়াই মনে হয়।

বাজারে শ্রীধর নামক এক পসারি, থোড়, মোচা, খোলা প্রভৃতি বিক্রয় করিত। শ্রীধর বৈষ্ণব, ও অতি সাধু লোক। সে এই সকল সামান্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতেই এক রকমে

সংসার প্রতিপালন করিত। ভক্ত শ্রীধর সকল সময়ে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিত। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীধরকে বড় ভালবাসিতেন, এবং শ্রীধরের সঙ্গে রসিকতা করিয়া কিছু তৃপ্তি লাভ করিতেন। গৌরসুন্দর বাজারে উপস্থিত হইয়া, শ্রীধর পসারির নিকট আসিলেন।

শ্রীধর গৌরকে দেখিয়া নমস্কার করিল। গৌর শ্রীধরের সঙ্গে একটু আমোদ করিবার জন্য বলিলেন, "শ্রীধর! তুমি ত সর্ব্বদা হরিনাম কর, তবে এত কষ্ট পাও কেন?" শ্রীধর বলিল, "ঠাকুর, কষ্ট কিসের? আমি উপবাস থাকি না; ছোট হউক, আর বড় হউক, কাপড় পরছি।" তৎপরে শ্রীধরের সঙ্গে একটু কৌতুক করিবার জন্য গৌর বলিলেন, "শ্রীধর, তোমার অনেক লুকান অর্থ আছে, তাহা আমি শুনিয়াছি।" শ্রীধর বলিল, "ঠাকুর, আমি অর্থ কোথা পাব। আমি থোড়, মোচা, খোলা, বিক্রয় করি, এই মাত্র।"

"প্রভু বলে তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥"

গৌর শ্রীধরের দোকান হইতে থোড়, মোচা, প্রভৃতি লইলে, শ্রীধর বলিল, "ঠাকুর, এ জিনিষগুলির যা মূল্য হয় তাহা দিবেন।" গৌর বলিলেন, "তুমি জান না, যে-গঙ্গার তুমি পূজা কর, আমি তাঁর পিতা—আর তুমি বিনামূল্যে দেবতাদিগকে এ-সকল দ্রব্য দিয়া থাক, আমাকে না হয় অর্দ্ধমূল্যেই দিলে, তাতে ক্ষতি কি?"

শ্রীধর। ঠাকুর, তোমার কাছ থেকে আমি আর দাম চাই না; তুমি প্রতিদিন, থোড় আর মোচা আমার দোকান হ'তে নিয়ে যেও।"

"চিন্তিয়া শ্রীধর বলে, শুনহ গোঁসাঞি।
কড়ি পাতি তোমার কিছুই দেয় নাই॥
থোড়, কলা, মূলা, খোলা দিব এই মনে।
সবে আর কোন্দল না কর আমা সনে॥"

গৌর শ্রীধরের কথা শুনিয়া বলিলেন, "যখন তুমি আমাকে এ-সকল জিনিষ বিনামূল্যে দিবে, তখন আর তোমার সঙ্গে বিবাদের প্রয়োজন কি ?"

"প্রভু বলে, ভাল ভাল আর দ্বন্দ্ব নাই ।
সবে থোড় কলা মূলা, ভাল যেন পাই ॥"

এই বলিয়া নিমাই হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীধর কি সরল! এমন লোকই যথার্থ বৈষ্ণব হইবার উপযুক্ত ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া

গৌরসুন্দর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, চতুষ্পাঠীতে পুনরায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে চতুষ্পাঠীর কার্য্য স্থগিত ছিল। প্রায় দুই বৎসর চলিয়া গেল, লক্ষ্মীদেবী ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শচীদেবী পুত্রের বিবাহের জন্য মনস্থ করিলেন। সুন্দরী, গুণবতী একটি কন্যার সহিত, পুত্রের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, তদ্বিষয়ের চেষ্টায় রত হইলেন।

শচী প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, আর দেখিতেন, একটি সুন্দরী, রূপলাবণ্যময়ী বালিকা স্নান করিবার জন্য গঙ্গায় আগমন করিত; বালিকাটি শচীদেবীকে দেখিয়া, তাঁহার নিকট আসিত, এবং তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিত। শচী মেয়েটির সৌন্দর্য্য, বিনয় ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার মনে হইল, এ মেয়েটি তাঁহার

পুত্রবধূ হইলে, তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল হয়। তিনি একদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমার নাম কি? তুমি কার মেয়ে?" সুন্দরী বালিকাটি, মস্তকটি একটু নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, আমার পিতাঠাকুরের নাম সনাতন পণ্ডিত।"

সনাতন পণ্ডিত নবদ্বীপের মধ্যে ধনী ব্যক্তিদিগের মধ্যে গণনীয়। শচী মনে করিলেন, এই কুসুমের ন্যায় মেয়েটি আমার গৃহে লইয়া যাই, আমার ত ইচ্ছা, কিন্তু সনাতনের ন্যায় ধনী ব্যক্তি কি, আমার দরিদ্র পুত্রের হস্তে তাঁহার কন্যা সমর্পণ করিবেন?

বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁহার অন্তরের ভালবাসা নিপতিত হইয়াছে। তিনি গৃহে গমন করিয়া কাশীনাথ নামক ঘটককে সংবাদ দিয়া নিজ বাটীতে আনিলেন। কাশীনাথ উপস্থিত হইলে, তিনি সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণন করিয়া বলিলেন, "সনাতন ধনী ব্যক্তি, তিনি আমার ঘরে তাঁহার কন্যা দিবেন?"

কাশীনাথ, শচীদেবীর কথা শ্রবণ করিয়া, সনাতন পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। শচীদেবী-বর্ণিত সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়া বলিলেন, "নিমাইয়ের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ হইলে তিনি সুখী হন।" সনাতন এই কথা শুনিবামাত্র, কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল; গৌরের ন্যায় পাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া সমর্পিত হইবে, তাহা পরম সৌভাগ্যের কথা মনে করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাশীনাথকে বসিতে বলিয়া, আপনার পত্নীকে এই শুভ সংবাদ জানাইবার জন্য বাটীর অভ্যন্তরে গমন করিলেন। সনাতন-পত্নী, স্বামীর মুখ হইতে শচীদেবীর বাসনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "নিমাইয়ের ন্যায় জামাতা লাভ করা,ইহার তুল্য সৌভাগ্য আর কি আছে?" সনাতন সহাস্য বদনে, প্রফুল্ল অন্তরে বহির্বাটীতে আগমন করিয়া, কাশী-নাথকে তাঁহাদের এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিমতের কথা জ্ঞাপন করিলেন।

কাশীনাথও প্রহৃষ্টমনে নিমাইজননীর নিকট গমন করিয়া, সনাতনের অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। শচীদেবীর প্রাণে আর আনন্দ ধরে না; বিষ্ণুপ্রিয়ার ন্যায় রূপসী ও গুণবতী কন্যা, তাঁহার নিমাইয়ের ভার্য্যা হইবে, এ-কথা তাঁহার মনে যত উদিত হইতে লাগিল, ততই আনন্দে তাঁহার চিত্ত যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সহাস্য বদনে কাশীনাথকে সনাতনের নিকট যথাযথরূপে এ-প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

কাশীনাথ এই আনন্দজনক প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিয়া, পুনরায় সনাতনের ভবনে উপস্থিত হইলেন। সনাতন এই প্রস্তাবের সূচনা মাত্র শ্রবণ করিয়া অবধি, বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। এখন ঘটকের নিকট হইতে, নির্দ্ধারিত প্রস্তাবের বিষয় শ্রবণ করিয়া, আনন্দে যেন তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, দিন ধার্য্য করিবার মানসে, এক বিখ্যাত জ্যোতিষীকে আহ্বান করিলেন।

গণকঠাকুর বিশ্বম্ভরের বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য করিবার জন্য সনাতন পণ্ডিতের বাটীতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নিমাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গণকঠাকুর, কোথায় যাইতেছেন?" গণক বলিলেন, "কেন, তোমার বিবাহের দিন স্থির করিতে। সনাতন পণ্ডিতের কন্যার সহিত তোমার যে বিবাহ হইবে, তা কি তুমি জান না?" নিমাই বলিলেন, "আমার বিবাহ, কৈ আমি ত জানি না?" জ্যোতিষী নিমাইয়ের সঙ্গে আর কিছু বাক্যব্যয় না করিয়া, সনাতন-ভবনে উপস্থিত হইলেন। সনাতন পণ্ডিত প্রফুল্লবদনে জ্যোতিষীকে কন্যার বিবাহের জন্য, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন দেখিতে বলিলেন। জ্যোতিষী বলিলেন, "এইমাত্র এখানে আসিবার সময়, নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু নিমাই ত এ বিবাহসম্বন্ধে কিছুই জানেন না বলিলেন।" গণকের মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া

সনাতনের আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে নিরানন্দের বারি নিক্ষিপ্ত হইল; তাঁহার আশাপূর্ণ হৃদয় নিরাশার অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার বদনমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া, আপনার পত্নীকে সমাচার প্রদানের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। জ্যোতিষী পাত্রের অনিচ্ছায় এ-বিবাহ এখন সম্ভবপর নয় বিবেচনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সনাতন ভাবিলেন, নিমাই বালক নহেন, তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার জননীর এ-বিবাহে সম্পূর্ণ মত থাকিলেও, সন্তানের অমতে তিনি আর কিরূপে এ-কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। এই সকল চিন্তা করিয়া, সনাতন পণ্ডিত বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরের বিবাহ ঘটিল না মনে করিয়া যেন ভগ্নোত্তম হইয়া পড়িলেন।

কোন বৈষ্ণব লেখক বলেন, সনাতন পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধারণ মানব বলিয়া মনে করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গৌররূপে নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এমন নররূপধারী দেবতাকে কন্যা অর্পণ করিলে, বিষ্ণুপ্রিয়া সশরীরে স্বর্গের শান্তি অনুভব করিবে, এবং তাঁহারও মানব-জীবনধারণ সার্থক হইবে, এই বিশ্বাসে তাঁহার চিত্ত যেন এক অপার্থিব আনন্দে ভাসিতেছিল। আজ সে আনন্দের উপর বিঘ্ন উপস্থিত হইল দেখিয়া, তিনি নিরাশ মনে, হা গৌরাঙ্গ, হা কৃষ্ণ, বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার দুইটি চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

আর এক কথা। সনাতন নিমাইকে পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও, গৌরের ন্যায় পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠের হস্তে কন্যা সমর্পণ সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। নবদ্বীপ তখন বঙ্গদেশের মধ্যে জ্ঞানের উচ্চতর শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিল। জ্ঞানই পরম রত্ন;—নবদ্বীপও সেই অমূল্য রত্নের যথার্থ আদর করিতে শিক্ষা করিয়া-

ছিল। নবদ্বীপবাসীরা সেই গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া, পৃথিবীর ধনরত্নের অধিকারী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা, বিদ্যাধনে যাঁহারা ধনী, তাঁহাদিগকে অধিকতর সম্মান করিত। দরিদ্র পণ্ডিতকে পথিমধ্যে দর্শন করিলে, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি আপনার দোলা হইতে অবতরণ করিয়া, তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, পুনরায় দোলায় আরোহণ করিতেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সমাজের নেতা, শিক্ষক ও সমাজের শিরোভূষণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। গৃহস্থেরা পণ্ডিতদিগের হস্তেই আপনাদিগের কন্যা সমর্পণ করা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন; ইহাতে বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে, কন্যা সুখী হইবে, এই মহৎ কামনায় প্রণোদিত হইয়া, সকলেই আপনাপন কন্যাকে এরূপ পাত্রস্থ করিবার জন্য যত্নশীল হইত।

নিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিয়াছেন, নিমাই ব্যাকরণে অদ্বিতীয়; দীধিতী-রচয়িতা রঘুনন্দন যাহার ন্যায়ের টীকার ভাষ্য শ্রবণ করিয়া, আপনার রচিত টীকা, সাধারণের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে বলিয়া বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, এবং যেজন্য নিমাই তৎক্ষণাৎ আপনার ভবিষ্যৎ গৌরবের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, স্বরচিত টীকা গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলেন, এমন পাত্রকে তৎকালে কে না কন্যা দান করিতে অগ্রসর হইবে? নিমাই তৎকালে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। গৌর আবার রূপে অতুলনীয়। যে মুখচন্দ্রের দিকে, ভক্ত বৈষ্ণবেরা, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও তাঁহার সমপাঠী ছাত্রেরা তাকাইয়া থাকিত, এমন সর্ব্বগুণান্বিত যুবাকে কে কন্যা প্রদানে আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে না করে—কোন্ নারী এমন স্বামিলাভে জীবনকে মধুময় করিতে বাসনা না করে? সনাতন পণ্ডিত ধনী হইলেও জগন্নাথমিশ্রের সন্তানকে জামাতা করিতে

পারিলে, তাঁহার কুল কৃতার্থ হইবে, এই মনে করিয়া, তিনি যে গৌরের জন্য ব্যাকুল হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি ?

নিমাই সেদিন জ্যোতিষীকে রহস্যচ্ছলেই বলিয়াছেন যে, তিনি বিবাহের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপলাবণ্য ও বিবিধ গুণের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্ত সেদিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, জননীর এবিষয়ে একান্ত ইচ্ছা। তিনি যখন শুনিলেন সনাতন পণ্ডিত গণকের কথা শ্রবণ করিয়া, বিবাহ বিষয়ে নিরাশ হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট একটী লোক প্রেরণ করিয়া, তদীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। প্রেরিত লোকের নিকট হইতে এ শুভ সমাচার শ্রবণ করিয়া সনাতন পণ্ডিত আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার নিরাশা ঘুচিয়া গেল। তিনি এই আনন্দের সমাচার তাঁহার পত্নীর কর্ণগোচর করিলেন। তিনিও আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল মনে করিয়া, ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজ এ-সংবাদে তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন; বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণের অভ্যন্তরে যে-ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল, আজ তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল মনে করিয়া, তিনি যেন নবজীবন লাভ করিলেন। পরম সুন্দর গুণের আধার শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত আমার পরিণয় হইবে, আমি তাঁহার সহচারিণী হইব, এই ভাব তখন তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইয়া, তাঁহার শরীর মনে কিরূপ আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সনাতন পণ্ডিত, তদীয় পত্নী ও শচীদেবী শ্রবণ করিলেন যে, গৌর প্রস্তাবিত পরিণয় কার্য্যে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক।

এখন উভয় দিক হইতেই বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। সনাতন পণ্ডিতের কন্যার সহিত নিমাই পণ্ডিতের বিবাহের প্রস্তাব চারিদিকেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্তখাঁ নামে একজন কায়স্থ জমীদার ছিলেন। নিমাইয়ের বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া, উদারহৃদয় বুদ্ধিমন্ত,

তাঁহার বিবাহ অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবার সমস্ত ব্যয় স্বয়ং বহন করিতে প্রস্তুত বলিয়া শচীদেবীকে জ্ঞাপন করিলেন। বুদ্ধিমন্ত এ-বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবেন, এ-কথা নানাদিকে প্রচারিত হইল। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইয়ের চতুষ্পাঠী হইত; মুকুন্দ সঞ্জয়ের কর্ণে এ-কথা প্রবেশ করিল। এ-বিবাহে বুদ্ধিমন্তখাঁ সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন শ্রবণ করিয়া, তিনি বলিলেন, "আমিও কি শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহে কিছু ব্যয়-ভার বহন করিব না?" বুদ্ধিমন্ত জমীদার—তিনি মুকুন্দ সঞ্জয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি কি সামান্য ব্রাহ্মণ-সন্তানের ন্যায় গৌরচন্দ্রের বিবাহের আয়োজন করিব? আমি তাঁহার বিবাহের এরূপ আয়োজন করিব, যে এ-পর্য্যন্ত, এ নবদ্বীপ নগরে, কোন রাজপুত্রের বিবাহও সেরূপ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয় নাই।" গৌরের সমস্ত ছাত্রবৃন্দ, নবীন অধ্যাপকের এই বিবাহের প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব শিষ্যগণ।
সভেই (১) হইলা অতি পরমানন্দ মন॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়।
"মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়॥"
মুকুন্দ সঞ্জয় বোলে, "শুন সখা ভাই।
তোমার সকল ভার মোর কিছু নাই!"
বুদ্ধিমন্ত খান বোলে, "শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিঞা (২) মত এ বিবহে কিছু নাই॥
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥"

চৈঃ ভাগবত।

(১) সভেই—সকলেই।

(২) বামনিঞা মত—গরীব ব্রাহ্মণের ন্যায়।

বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির হইল। অধিবাসের দিন উভয় পক্ষের ভবনেই শুভানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইল। শচীদেবীর গৃহে এক মহা-মহোৎসবের ন্যায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। পরলোকগত জগন্নাথ মিশ্রের ভবন-প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইল। কুলবালাগণ সুপরিষ্কৃত গৃহের চারিদিকে আলপনা দিয়া, গৃহতল ও গৃহের সম্মুখভাগসকল সুশোভিত করিলেন।

হিন্দুরীতি অনুসারে জলপূর্ণ কলস ও আম্রশাখা বাটীর প্রবেশ-দ্বারে স্থাপন করা হইল। প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত হইলে গ্রাম, গ্রামান্তর হইতে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দলে দলে আগমন করিতে লাগিলেন। গ্রামস্থ বহুসংখ্যক নরনারীর দ্বারা শচীর বাটীর ভিতর ও বহির্দ্দেশ পূর্ণ হইয়া গেল। বালক বালিকারা, চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের মধ্যে ছুটাছুটি ও কোলাহল করিতে লাগিল। বাহিরে জনসাধারণের ও অন্তঃপুরে অন্তঃপুরবাসিনীদিগের নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় যেন চারিদিক শব্দায়মান হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, বাদকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঢোল, সানাই, জয়ঢাক, মৃদঙ্গ, করতাল সব বাজিয়া উঠিল। সমবেত বাদ্যগুলির শব্দে চারিদিক নিনাদিত হইয়া উঠিল।

অপরাহ্নে অধিবাসের সময় উপস্থিত হইল। এসময় বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত হইলে, পাণ, সুপারি, বস্ত্র প্রভৃতি বিতরিত হইতে লাগিল। এই জনতার মধ্যে, এক এক ব্যক্তি, দুই তিনবার করিয়াও দান গ্রহণ করিতে লাগিল। এই জনতার মধ্যে গৃহীতাদিগের এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দর্শনে, গৌর দানের একটা ব্যবস্থা করিলেন। তিনি এই স্থির করিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনজনের মত দান-সামগ্রী প্রদান করা হইবে। নিমাই এই নিয়ম করিলে, সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে দান গ্রহণ করিয়া, বিদায় লইতে লাগিল।

লোভী ব্রাহ্মণেরা প্রতারণা পূর্ব্বক দুই তিনবার প্রাপ্যের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া, একেবারে তিনজনের দান প্রাপ্ত হইয়া, বড়ই সন্তুষ্ট হইল। দান গ্রহণের বিশৃঙ্খলতা নিবারিত হইল।

"সভেই আনন্দে মত্ত, কে কাহারে চেনে।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥
'সভারে তাম্বূল মালা দেহ তিনবার।
চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥'

* * *

তিনবার পাইয়া সভেই হর্ষ মন।
শাঠ্য করি আর নাহি লয় কোন জন॥

—চৈঃ ভাগবত।

লোকে এই অধিবাসের ব্যাপার দর্শন করিয়া, বলিতে লাগিল, অনেক রাজপুত্রের বিবাহে অধিবাসের উৎসব দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অধিবাসের কাণ্ড আমরা কখন আর দেখি নাই।

"সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সভে বোলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥
লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে বাপে॥"

এদিকে অধিবাসের কার্য্যে চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ, এমন সময়ে সনাতন পণ্ডিত অধিবাসের সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন বহু লোকজন সহ দ্রব্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন কোলাহলের মাত্রা আরো কিছু বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। বাদকেরা তালে তালে নৃত্য করিয়া বাজাইতে লাগিল। কিছু সময় পরে সনাতন ভাবী জামাতার বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহারও ভবনে অধিবাসের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইল।

অধিবাসের দিন গত হইল। আজ বিবাহের দিন। প্রভাতে পুরনারীগণ নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া জলসহিয়া আসিলেন। গৌর বন্ধুগণসহ জাহ্নবীর জলে অবগাহন করিয়া, পূজা আহ্নিক সম্পন্ন করিলেন।

গ্রামের প্রথানুসারে গৌরচন্দ্রকে ষষ্ঠীতলায় লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে ষষ্ঠীপূজা সম্পন্ন হইল। গৃহে প্রত্যাগত হইলে, কুলবালাগণ শঙ্খের নিনাদে অন্তঃপুর মুখরিত করিয়া তুলিল। নারীদিগকে স্ত্রী-আচারের প্রথানুসারে খৈ, হরিদ্রা, বস্ত্র প্রভৃতি দান করা হইল। আজ শচীর গৃহ যেন আনন্দপুরী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অপরাহ্নে বিবাহ-যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। গৌরচন্দ্রকে চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া, তাঁহার গলে মতির মালা, ও কর্ণে কুণ্ডল পরান হইল। তিনি পীত বস্ত্র পরিধান করিলেন। গৌর এইরূপে সজ্জিত হইয়া, জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করত, তাঁহার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমন্তখাঁর ভবন হইতে দোলা উপস্থিত হইলে, গৌর তাহাতে আরোহণ করিলেন। নানা প্রকার বাদ্য বাজিয়া উঠিল। অতি সমারোহের সহিত বরযাত্রীরা গৌরকে লইয়া গঙ্গাপুলিনে উপস্থিত হইলেন; তৎপর সহরের কোন কোন স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া, গোধূলি সময়ে তাঁহারা কন্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাই কোন বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন,—

"বড় বড় বিভা দেখিয়াছি" লোকে বলে।
"এমত সমৃদ্ধ নাহি দেখি কোনো কালে॥"

বর উপস্থিত হইলে, সনাতন পণ্ডিত, স্বয়ং অগ্রসর হইয়া, গৌরসুন্দরকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গেলন। বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে চারিদিক যেন ধ্বনিত হইতে লাগিল। নানাবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার দিয়া বরকে বরণ করা হইলে, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়াকে তথায় আনা

হইল। নারীগণ হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। এখন চারিচক্ষের মিলনের জন্য উভয়ের মুখের উপর একটা বস্ত্রাবরণ দেওয়া হইল, চারিচক্ষের মিলন হইল। এই শুভদৃষ্টির পর, গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার গলে পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

সনাতনের গৃহ আজ সায়ংকালে আলোকমালায় সুশোভিত। নানা প্রকার বাদ্যের শব্দ, নৃত্য ও গীতে বাটী উৎসবময় হইয়া উঠিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পরদিন বাদ্যধ্বনি সহকারে গৌর শ্বশুরালয় হইতে আপন গৃহে আগমন করিলেন। শচী পুত্রবধূকে বক্ষে লইয়া, ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। পতি-পত্নী যখন একত্রে উপবেশন করিলেন, তখন লোকের মনে হইতে লাগিল, যেন লক্ষ্মীনারায়ণ একত্রে উপবেশন করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন ;—

"গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ।
জয় ধ্বনিময় হৈল, সকল ভুবন ॥"

নবদম্পতী সুখে ও আনন্দে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। শচী, নব বধূকে পাইয়া পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভক্ত হরিদাস ঠাকুর

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে-সকল ধর্ম্মাত্মা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, শ্রীহরিদাস ঠাকুর তাঁহাদিগের মধ্যে

অন্যতম। ভগবদ্ভক্ত হরিদাস যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার সন্নিকটে "বুঢ়ন" গ্রামে মুসলমান বংশে, অনুমান ১৩৭০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মের সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরির চরণারবৃন্দ আশ্রয় করিয়া মুসলমান পরিবারের মধ্যে বাস করা সম্ভবপর নয় বলিয়াই ইঁহাকে নিজ বাস-ভবন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মুসলমান সন্তান হইয়া হরিনামানুরাগী হওয়াতেই তিনি হরিদাস নামে অভিহিত হইতেন।

ভক্তেরা চিরদিনই ধর্ম্ম-সাধনের জন্য কোলাহল-শূন্য স্থান অন্বেষণ করিয়া থাকেন। যবন হরিদাস হরিনাম সাধন ও কীর্ত্তনোদ্দেশে বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী বেনাপোলের মধ্যে বৃক্ষলতাদি সমাকীর্ণ একটি নির্জ্জন স্থান মনোনীত করেন এবং তথায় একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভক্ত যেখানেই থাকুন না কেন, একবার মানব-সমাজে, তাঁহার বার্ত্তা প্রবেশ করিলে, লোকে তাঁহার দর্শন লালসায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, নয়ন মন কৃতার্থ করিতে যত্নবান হয়। হরিদাস, যবন হইলে কি হয়, হিন্দুরা তাঁহার ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাইয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এইরূপ ভক্তের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভার্থ প্রতিদিন প্রাতে অনেকে তাঁহার কুটীরে গমন করিত; পল্লীবাসীরা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, ও হৃদয়ে আনন্দ ও শান্তিলাভ করিবার জন্য, এই সাধুপুরুষের সন্নিধানে গমন করিত। ভক্ত হরিদাসও সমাগত ব্যক্তিদিগকে হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে, এবং ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে শান্তি উপার্জ্জন করিতে বলিতেন। এই পরমভক্ত দিনযামিনীতে তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। তদঞ্চলে তৎকালে রামচন্দ্র খান নামে এক জমিদার ছিলেন। রামচন্দ্র খান দুষ্ট প্রকৃতির ও ভক্ত-বিরোধী ব্যক্তি। সাধুতা ও ভক্তির মর্ম্ম তিনি কি

বুঝিবেন ? তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোক সাধু হরিদাসের প্রতি বড় আকৃষ্ট হইয়াছে ; তাঁহার যশোগানে দেশ পূর্ণ হইতেছে, তখন তিনি এই ভক্তের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুষ্ট রামচন্দ্র খান এক বিষম পরীক্ষার আয়োজন করিলেন ; এবং ভাবিলেন, তাহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া, সেই সাধুর সাধনা নষ্ট করিয়া, তাহাকে লোকের নিকট অশ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিবেন। সেই সংকল্প সিদ্ধির মানসে, তিনি এক পূর্ণযৌবনা রূপসী কুলটা নারীকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং ভক্ত হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য, তাহাকে তাঁহার সমীপে গমন করিতে আদেশ করিলেন। অসচ্চরিত্রা নারী, তাঁহার বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইল, এবং এ-কার্য্যে সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে বলিয়া রামচন্দ্র খানকে ইহা জ্ঞাপন করিল। কুলটা নারী বেনাপোলের অরণ্য মধ্যস্থিত নির্জ্জন হরিদাসের সাধন কুটীরে গমন করিল। তখন নিশীথ সময় ; সকলেই নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে ; অরণ্যের মধ্যে জীব জন্তুরাও নিদ্রিত। কেবল, ভক্ত হরিদাস তাঁহার নির্জ্জন কুটীরে জাগ্রত। তিনি বসিয়া হরিনাম জপ করিতেছেন। রূপসী নির্জ্জন প্রদেশে হরিদাসের নির্জ্জন কুটীরে উপস্থিত হইল ; এবং কুটীরে প্রবেশানন্তর আপনার মনের কলুষিত অভিপ্রায় অসঙ্কোচ ভাবে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। ভক্ত তাহার বাসনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমার নামজপ সাঙ্গ হইলেই আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব ; তুমি এখন এখানে বসিয়া থাক।" নিস্তব্ধ নির্জ্জনে এই দেবসদৃশ পুরুষ অবিকৃত হৃদয়ে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঘোরা রজনী প্রভাত হইয়া গেল। পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য উদয় হইবার উপক্রম হইল, অসচ্চরিত্রা নারী আর তথায় কাল-বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেল। সে পূর্ব্ব রজনীর বৃত্তান্ত রামচন্দ্র খানকে জ্ঞাপন করিল। আবার সে-দিবস ঘোর নিশাকালে, হরিদাসের কুটীরে সে উপস্থিত হইয়া তদীয় চরণে প্রণাম করিলে, হরিদাস বলিলেন,

"আমি গত কল্য তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু আমি নামজপের একটা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, সে-জন্য আমাকে আজও হরিনাম জপ করিতে হইবে; আগামী কল্য আমি তোমার আশা পূর্ণ করিব।" কুলটা নারী নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল এবং সমস্ত ঘটনা জমিদারের নিকট জ্ঞাপন করিল। অদ্য তৃতীয় দিবস। বেশ্যা পুনরায় রজনীতে সেই সাধন-কুটীরে উপস্থিত হইল, এবং হরিদাসকে পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিয়া, কুটীরের দ্বারদেশে উপবেশন করিল। হরিদাস হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। নিশার অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল; এদিকে প্রেমোন্মত্ত ভক্ত বৈরাগী হরিদাসের অবিরাম কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র খান প্রেরিত নারীও আজ হরিদাসের দ্বারে বসিয়া মধুর হরিনামে যোগ দিয়া হরিনাম করিতে লাগিল। যাহার হৃদয় কলুষভাবে পূর্ণ ছিল, তাহার হৃদয়ে অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে ভক্তের পবিত্র মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিল, এমন মানব ত আর এ জীবনে দেখি নাই—হরিনামের ন্যায় এমন মিষ্ট মধুর কথাও ত আর কখন শ্রবণ করি নাই! সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; কাঁদিতে কাঁদিতে এই হরিপ্রেমানুরাগী হরিদাসের চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; এবং হরি-প্রেমানুরাগিণী হইবার জন্য, উপদেশ প্রার্থনা করিল। সে নারী বলিল যে, সে রামচন্দ্র খানের পরামর্শে ঈদৃশ লজ্জাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

হরিদাস সেই অনুতপ্তা নারীকে তাহার যথাসর্ব্বস্ব দরিদ্রকে দান করিয়া, তাঁহার সেই বেনাপোলস্থ সাধন-কুটীরে বসিয়া হরিনাম সাধন করিতে বলিলেন। রূপসী আপনার সৌন্দর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া ফেলিল। এবং গুরুর আদেশ অনুসারে, তাহার ধন, রত্ন দরিদ্রদিগকে দান করিল। যে সাধন-কুটীরে সে তাহার হৃদয়ের কলুষ বাসনা চরিতার্থ করিতে আসিয়াছিল, সেই কুটীরে বসিয়া, সন্ন্যাসিনীর

ন্যায় হরিগুণ কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিল। হরিদাস তাহাকে হরিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, সাধনের পথ প্রদর্শন করিয়া, শান্তিপুরে গমন করিলেন।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪০৭ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভক্ত হরিদাস শ্রীমৎ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে অবস্থিতি করিতেন। এবং ভক্তদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া নাম ধ্যান, নাম শ্রবণ ও নাম কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতেন। সুপণ্ডিত অদ্বৈতাচার্য্য যখন শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেন, যবন শ্রীহরিদাস তখন শান্তভাবে উপবেশন করিয়া, আচার্য্যের সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিতেন; ভক্তির শান্তিবারিতে তাঁহার হৃদয় শীতল হইয়া যাইত, ও তাঁহার অশ্রুবারি নিপতিত হইত।

জাত্যভিমানপূর্ণ সমাজের মধ্যে বাস করিয়া যবন হরিদাস আপনাকে অতি নীচ জাতি বলিয়া মনে করিতেন। অদ্বৈতাচার্য্য সুব্রাহ্মণ। হরিদাস, তাঁহার ভবনে অবস্থিতি করিয়া সময় সময় বড় সঙ্কুচিত হইতেন। তিনি একদিন অতি বিনীত ভাবে গৃহস্বামীকে বলিলেন, যে তিনি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়া, তাঁহার ন্যায় যবনকে ভবনে স্থান দান করিয়া অতি মহত্ত্বেরই পরিচয় দান করিতেছেন। অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনি হরিদাসের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যে তিনি তাঁহাকে ভোজন করাইয়া কোটী ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

হরিদাস শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়াগ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্রীহরিদাসের ন্যায় ভক্ত সকল স্থলেই আদরণীয়। তিনি যখন ফুলিয়া-গ্রামে আসিয়া বাস করেন, তখন ফুলিয়াবাসীরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া, বহু

লোককে আপনার পথে আকর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া, কাজি তাঁহাকে শাস্তি দিবার মানসে, দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তার নিকটে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। তিনি বলিলেন, হরিদাস যবন হইয়া, হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্তে মুসলমান ধর্ম্মের অনিষ্ট হইবে। দেশাধিপতি কাজির কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া হরিদাসকে ধৃত করিয়া বন্দী করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রাজাজ্ঞায় হরিদাস কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

বিচারের দিন নির্দ্ধারিত হইল। বাদসার দরবারে হরিদাসকে উপস্থিত করা হইল। ভক্ত বৈষ্ণবের প্রতি রাজা কি দণ্ডবিধান করেন, তাহা দেখিবার জন্য বিচারগৃহে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। নবাবের সম্মুখে হরিদাস নীত হইলে, নবাব বলিলেন,—"ভাই, মুসলমান হইয়া তুমি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অতি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ, যে হিন্দুদিগকে কাফের বলি, তুমি তাহাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, আপনার পরিত্রাণের পথ রুদ্ধ করিয়াছ; এখন কলমা পড়িয়া, নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

হরিদাস, বাদশার কথা শ্রবণ করিয়া, অতি বিনীত, অথচ অতি তেজোপূর্ণ ভাষায় তদুত্তরে বলিলেন, "বাদসা! পরমেশ্বর এক, তিনি সকলেরই মধ্যে বাস করিতেছেন; মুসলমানদিগের কোরাণ ও হিন্দু-দিগের শাস্ত্র সেই একমাত্র পরমেশ্বরকেই ঘোষণা করিতেছে। আর যদি কোন হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহা হইলে, হিন্দুরা ত সেজন্য, তাহার বিরুদ্ধাচারী হয় না।"

নবাব হরিদাসের এই সকল কথা প্রবণ করিয়া, তাঁহাকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত না হইলে, তাঁহার প্রতি শাস্তি বিধান করা হইবে, তাহাও তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। ভক্ত হরিদাস রাজার ভয়ে ভীত

হইয়া, প্রাণপ্রদ হরিগুণ কীর্ত্তনে বিরত হইবার লোক নহেন, তিনি নির্ভয়ে বলিলেন, "তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেও তিনি "হরিনাম" কখন পরিত্যাগ করিবেন না।"

নবাব, হরিদাসের বিশ্বাসের বল প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিরূপে এইরূপ ভক্তের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করিবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাজি নবাবকে বলিলেন, "এরূপ ব্যক্তিকে কঠোর শাসনে শাসিত না করিলে, ইহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য মুসলমানেরাও ইহার পথ অবলম্বন করিতে পারে। আপনি পাইক-দিগকে আদেশ করুন, তাহারা বাইশটি বাজারে, ইহাকে লইয়া গিয়া নির্দ্দয়রূপে প্রহার করুক।" কাজির বাক্যানুসারে নবাব পাইকদিগকে তাহাই করিতে আদেশ দান করিলেন। তাহারা ভক্ত হরিদাসকে বাজারে লইয়া গিয়া নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দেবসদৃশ ভক্ত হরিদাসের পৃষ্ঠে পাইকগণ নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেছে দর্শন করিয়া হিন্দু মুসলমান সকলেই হাহাকার করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; রাজার অন্যায় বিচারে দোষ দিতে লাগিল। কিন্তু যমসম নির্দ্দয় প্রহারকারীরা বিরত হইবার নহে; তাহারা বেত্রাঘাতে হরিদাসের অঙ্গ রুধির-ধারায় প্লাবিত করিয়া তুলিল।

এত প্রহারের মধ্যেও ভক্ত হরিদাসের প্রাণবিয়োগ হইল না। তিনি রুধির-প্লাবিত দেহে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাতের মধ্যেও স্থির হইয়া সেই পরাৎপর জগতের অধিপতির নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন "প্রভো! এদের দয়া কর, এদের কোন অপরাধ লইও না; তুমি ইহাদের অপরাধ ক্ষমা কর।" যীশুও ক্রুশবিদ্ধ হইয়া, ঘাতকদিগের জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এত প্রহারে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল না দেখিয়া, পাইকগণ চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। হরিদাসের প্রাণবিয়োগ না হইলে, পাইকগণকে

শাস্তিভোগ করিতে হইবে, হরিদাস যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়া মৃতের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া পড়িলেন। বাদসা তাঁহার দেহান্তে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু কাজি বলিলেন, "ইহাকে মুসলমান বিধানানুসারে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে উহার সদ্গতি হইবে, তাহা করা বিধেয় নহে।" বাদসার আদেশানুসারে হরিদাসের দেহকে নদীতে নিক্ষেপ করা হইল। হরিদাসের দেহ স্রোতে কিছুদূর ভাসিয়া চলিল, তৎপর সেই স্পন্দহীন দেহে জীবনের সঞ্চার হইল। হরিদাস কূলে উঠিলেন। মৃত হরিদাস জীবিত হইয়াছে, এই সমাচার চারিদিকে প্রচারিত হইল। বাদসা তাঁহাকে সশরীরে দর্শন করিয়া যেন বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে "পীর" উপাধি প্রদান করিলেন, এবং সকল স্থলে, হরিগুণ প্রচারের স্বাধীনতা দান করিলেন।

হরিদাস তৎপর ফুলিয়াগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আপনার সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য, শত্রুর কল্যাণের জন্য পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার প্রার্থনা, ভগবানে অটল বিশ্বাস ও নির্ভর দর্শন করিয়া, সকল শ্রেণীর ও সকল জাতির লোকেই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত।

কিছু দিনান্তর হরিদাস চান্দপুর গ্রামে বলরাম আচার্য্যের ভবনে গমন করেন। বলরাম, হিরণ্য ও গোবিন্দ মজুমদারের কুলপুরোহিত। হিরণ্য ও গোবিন্দ দুইজন সপ্তগ্রামের ধনশালী জমিদার। বলরাম এক দিন ভক্ত হরিদাসকে জমিদারদিগের ভবনে লইয়া যান। হরিদাসের আগমনে হিরণ্য মজুমদার প্রভৃতি পরম পুলকিত হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, বসিবার আসন প্রদান করিলেন। হরিদাস নাম জপে সময় অতিবাহিত করেন, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। এই জন্য এই প্রসিদ্ধ জমিদারদিগের সভায় পণ্ডিতেরা হরিনামের মাহাত্ম্য বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, এবং

সভাস্থ পণ্ডিতেরা অনেকেই হরিনামে জীবের মোক্ষ লাভ হয় এ-বিষয়ে আপনাদের অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে হরিদাস যখন আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন, তখন তিনি বলিলেন, হরিনাম গ্রহণে মানবের কৃষ্ণানুরাগ বৃদ্ধি হয়, এবং সেই প্রেমানুরাগ লাভই হরিনামের চরম ফল। এই মধুর কথায় সকলেই সুখী হইয়াছিলেন।

হরিনামের এমন মধুর প্রসঙ্গ চলিতেছে এমন সময়ে, জমিদারদিগের গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একজন কর্ম্মচারী একটা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি অতি উগ্রভাবে হরিদাসের বাক্য যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইলেন। হরিদাস, অতি বিনীতভাবে তাঁহার কথার উত্তর দানে বলিলেন, "নামাভাষেই মানব মুক্তি লাভ করে।" ভক্ত হরিদাসের কথায়, ব্রাহ্মণ আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যদি নামেতে মুক্তি হয়, আমি নাক কাটিয়া ফেলিব।" হরিদাস তদুত্তরে বলিলেন, "যদি নামাভাষে মানবের মুক্তিলাভ না হয়, আমিও নাক কাটিয়া ফেলিব।"

সভাস্থ সকলে উদ্ধত গোপাল চক্রবর্ত্তীর ব্যবহারে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিনীত হরিদাস তাঁহার এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "তর্কপ্রিয় ব্যক্তিরা, তর্কেতেই আনন্দ পাইয়া থাকে।" গোপাল চক্রবর্ত্তী দেবতুল্য, পরম ভক্ত হরিদাসের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে অসমর্থ হইল দেখিয়া, জমিদারেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গয়াধামে শ্রীগৌরাঙ্গ

নিমাই পণ্ডিত যখন চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত; তাঁহার জ্ঞান-গৌরবে চারিদিক উদ্ভাসিত; তখন বঙ্গদেশের ধর্ম্মহীনতা দর্শন করিয়া, নবদ্বীপস্থ ভক্ত বৈষ্ণবেরা ব্যাকুল অন্তরে, ভক্তি ও প্রেমে দেশের লোকের মন অভিষিক্ত করিবার জন্য, ভগবানের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করিতেন। বিশ্বম্ভর তখন জ্ঞানগর্ব্বে উন্মত্ত; ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে তিনি বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতেন না; কিন্তু না করিলেও, ভগবৎ প্রেমের নির্ম্মল বারিধারা অন্তঃসলিলার ন্যায়, মানব-চক্ষুর অগোচরে তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইত।

পিতৃলোকের সদ্গতির জন্য হিন্দুসন্তানেরা গয়াতীর্থে গমন করিয়া থাকেন। নিমাই পরলোকগত পিতার প্রতি সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য, গয়াধামে যাইবার সংকল্প করিয়া, মাতার অনুমতি-প্রার্থী হইলেন। শচীদেবী সন্তানকে দূরে পাঠাইতে অনিচ্ছুক হইলেও, এই অনুষ্ঠানে তাঁহার বাসনার বিরুদ্ধে কোন কথা না বলিয়া, গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। গৌর মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, কয়েকজন শিষ্য সঙ্গে লইয়া, গয়া যাত্রা করিলেন।

প্রকৃতিদেবী সকল সময়েই আপনার মনোহর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া মানবের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন। অতি তৃষিত ও তাপিত প্রাণ তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া, শান্তিলাভ করিয়া থাকে। বিশ্বম্ভর সঙ্গীদিগের সহিত চলিতে চলিতে, এই প্রকৃতির মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। কোথাও পর্ব্বতমালা মেঘাবলীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে;

কোথাও ঘননিবিষ্ট তরুরাজি সকল গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোথাও শুভ্র নদীস্রোত তর তর বেগে সিন্ধু পানে ছুটিয়া যাইতেছে; এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার মনে যেন সুধা ঢালিয়া দিতে লাগিল; তাঁহার জ্ঞানপ্রবণ হৃদয়ে যেন প্রেমের ফোয়ারা উছলিত হইয়া উঠিল। গৌর প্রেমানন্দে সঙ্গীদিগের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন।

পথে যাইতে যাইতে যাত্রিদল চিরনামক এক নদীতে স্নানাবগাহন করিয়া, মন্দার পর্ব্বতে অধিরোহণ করিয়া, মধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করেন, তৎপর পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া এক ব্রাহ্মণের বাটীতে সকলে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সকল দেশের আচার ব্যবহার সমান নয়। গৌরের শিষ্যেরা সেই ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার তাঁহাদের অনুরূপ নয় দেখিয়া, তাঁহার প্রতি কেমন এক অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উদার হৃদয় গৌর সঙ্গীদিগের ঈদৃশ ব্যবহারে মনে মনে বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন।

এই স্থানে তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জ্বর ক্রমে প্রবলতর হইয়া পড়িল; তাঁহার সঙ্গীরা, এই পর্ব্বতপ্রান্তে ঔষধ কোথায় পাইবেন মনে করিয়া চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। গৌরও দেখিলেন, এখানে চিকিৎসার আর কোন উপায় নাই। তখন তিনি নিজের ব্যাধির নিজে প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণের পাদোদক গ্রহণে তিনি জ্বর-রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, ইহা তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি ব্রাহ্মণের পাদোদক সেবন করিলেন। তাঁহার এই সুদৃঢ় বিশ্বাসানুসারে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। গৌরচন্দ্র এই কঠিন পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলে, শিষ্যেরা পরমাহ্লাদিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। গৌর তাঁহার পাদোদক গ্রহণে পীড়া

হইতে মুক্তিলাভ করিলেন দেখিয়া, তাঁহার শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তাঁহাদের শিক্ষার জন্যই, গৌর এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। উদারহৃদয় গৌরাঙ্গদেবও শিষ্যদিগের অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য, তখন এই শ্লোকটি পাঠ করিয়াছিলেন—

"চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

ভাবার্থ—বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল ভক্তিহীন মুনি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আর যার ভগবানে মতি নাই, সে ব্রাহ্মণ হইলেও ভক্ত চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। তাই লোচনদাস ঠাকুর, তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামক পুস্তকের ঐ স্থলের ঘটনা উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত।
পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত॥"

তাঁহারা গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। ভারতের এই প্রসিদ্ধ পুণ্য-ভূমিতে পদার্পণ করিয়া, গৌরচন্দ্র অবনত মস্তকে এই স্থানের মাহাত্ম্য উদ্দেশে প্রণত হইলেন। যাত্রিদল তৎপর স্নান করিলে, গৌর বিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শনার্থ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গয়াসুরের মস্তকোপরি বিষ্ণুর পদাঘাতের চিহ্ন দেখাইয়া, পাণ্ডারা সে চরণের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; বিষ্ণুর অতুল শক্তির ও অনুপম করুণার কথা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌর স্বচক্ষে সে চরণকমল দর্শন করিলেন; যে-চরণ দেখিতে দেখিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া, দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল; তাঁহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। সকলেই এই সুন্দর যুবা পুরুষের ভাবাবেগের এই সকল লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু দর্শকবৃন্দের মধ্যে সেদিন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি এই নবাগত ভাবুকের ভাব সম্যকরূপে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য

পরম ভক্ত ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্তের এই ভাব অনিমেষ লোচনে দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এ অশ্রু, এ কম্পন ত সাধারণ মানবের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না; গৌর সাধারণ মানবের অতীত। গৌর ঈশ্বরপুরীকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু ঈশ্বরপুরী তাঁহার এই সকল অমানুষিক ভক্তির লক্ষণ দর্শন করিয়া, অবশেষে তাঁহাকে আপনার দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। গৌর, এই পরম ভক্তের প্রেমালিঙ্গনে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। উভয়ের চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। অবশেষে গৌর সে চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "আজ আমার গয়ায় আসা সার্থক হইল।" ঈশ্বরপুরীও নিমাইয়ের দর্শনে যে পরম সুখ অনুভব করিতেছেন, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর সহিত গৌরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু অদ্যকার সাক্ষাতে উভয়ের মধ্যে যেন এক নবভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে যেন এক নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার সূত্রপাত হইল।

গৌর বাসায় গিয়া, রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল, এমন সময় ঈশ্বরপুরী তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরী হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি ত বেশ ভাল সময়েই এসেছি।" গৌর বলিলেন, "আপনি এ-সমস্ত ভোজন করুন।" পুরী বলিলেন, "তাহা হইলে, তোমার কি হইবে?" গৌর বলিলেন, "আমি পুনরায় রন্ধন করিব।" পুরী বলিলেন, "আমরা ইহাই দুজনে ভাগ করিয়া খাই এস।" গৌর তাহাতে সম্মত না হইয়া, সেই অন্ন ব্যঞ্জন আগন্তুক সাধুকেই প্রদান করিলেন।

মন্ত্র গ্রহণের আবশ্যকতা মনে করিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ভগবদ্ভক্ত পুরী নিমাইয়ের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, বলিলেন,—"তোমাকে মন্ত্র দান করিব, এ আর

একটা বড় কথা কি, আমি তোমাকে আমার প্রাণ দিতে পারি।” পুরী তৎপরে তাঁহাকে দশাক্ষরী মন্ত্র প্রদান করিলেন। পরম ভক্ত ঈশ্বর-পুরীর রসনা হইতে, মন্ত্র উচ্চারিত হইলে, গৌরের প্রাণে যেন তাড়িৎ শক্তির ন্যায়, তাহার প্রভাব সঞ্চারিত হইল। দীক্ষিত হইয়া, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইয়া দীক্ষাগুরুর নিকট বলিলেন, “আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে ভাসিতে পারি।” দীক্ষিতের কৃষ্ণ-প্রেম লাভে ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া, পুরী তাঁহাকে স্নেহভরে আপনার বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন; উভয়ের চক্ষু হইতেই প্রেমধারা বহিতে লাগিল।

“আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥
পুরী বোলে, “মন্ত্র-বা বলিয়া কোন কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥”
তবে তান (১) স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বোলে “দেহ আমি দিলাঙ (২) তোমারে॥”
“হেন শুভ-দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে॥”
শুনিঞা প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রভুরে দিলেন, আলিঙ্গন, বক্ষে ধরি॥”

—চৈঃ ভাগবত।

দীক্ষা গ্রহণের পর বিশ্বম্ভর গয়াতে কিছু দিন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় মনের অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তিত

(১) তান—তাহান, তাঁহার। (২) দিলাঙ—দিলাম।

গেল। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেন, আর তাঁহার দুই নয়ন বহিয়া জলধারা নির্গত হইত। যিনি বন্ধুদিগের সঙ্গে হাস্য আমোদে, আনন্দ লাভ করিতেন, এখন তাঁহার রসনা নীরব। গৌর আর তাঁহার সঙ্গীদিগের সঙ্গে প্রায় কোন কথা বলিতেন না। একদিন কোন স্থানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, তিনি "কৃষ্ণ রে বাপ, তুমি কোথায় গেলে, আমার প্রাণধন, আমায় দেখা দিয়া কোথায় পালাইলে?" বলিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, অবশেষে কৃষ্ণ বিরহে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শিষ্যেরাও গৌরের মধ্যে এই অপূর্ব্ব প্রেমের আদর্শ দর্শন করিয়া, কান্দিতে লাগিলেন।

তিনি গয়া হইতে বৃন্দাবন যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "ভাই, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আর এখন যাইব না, তোমরা মাকে আমার কুশল সমাচার প্রদান করিও।" তদীয় শিষ্যবৃন্দ নিমাইয়ের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে ঈদৃশ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য নিষেধ করিলেন।

গৌরের প্রাণ এখন ব্যাকুল। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র, বৃন্দাবনে গমন করিবার জন্য, তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সমভিব্যাহারী লোকদিগকে আর কিছু না বলিয়া, একদিন নিশীথ সময়ে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। কিন্তু কতকদূর গমন করিতে না করিতেই, তিনি এক দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, "তুমি এখন নবদ্বীপে ফিরিয়া যাও, হরিনামের মধুর কীর্ত্তনে সকলের প্রাণ শীতল কর; সকল নরনারীর মধ্যে হরিনাম প্রচার কর।" এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, গৌর বৃন্দাবন যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া, শিষ্যদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। এইরূপে গয়াতে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তিনি নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নবজীবনের পরিচয়

নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য সমাগত হইলেন। সমাগত বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি পাইবার যোগ্য, তিনি তাঁহাদিগের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। বহুদিন পরে সে মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া, অনেকেই পরম তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। গৌর, সকলের নিকট তীর্থ যাত্রার মধুর প্রসঙ্গ করিয়া, তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আর ত্রুটি করিলেন না। বহু লোক পিতৃলোকের সদ্‌গতির জন্য গয়াধামে গমন করে, কিন্তু গৌর সে কার্য্য সমাধা করিতে গিয়া, বিষ্ণু-পাদপদ্মে শ্রীকৃষ্ণের মোহনমূর্ত্তির আভাষ পাইয়া, প্রেমে বিভোর হইয়া আসিয়াছেন, সমাগত ব্যক্তিরা তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। তবে, তাঁহার নবজীবনের কথঞ্চিৎ পরিচয় যে কেহই পান নাই এমন নহে, তাঁহার হৃদয়ের ভাবান্তর তাঁহার মুখমণ্ডলেই প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাঁহার বাক্যে সে-ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল; লোকে তাঁহার মধুর বর্ণনায় তীর্থ কাহিনী শ্রবণ করিয়া, আনন্দিত মনে একে একে গৃহে গমন করিতে লাগিল।

গৌর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, জননী দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শচী অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে, সস্নেহে সন্তানের মস্তকে ও গাত্রে হস্ত দান করিয়া, হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। তৎপর গৌর প্রাণসমা গৃহলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার

নিকটে যাইয়া, বহু দিনের সঞ্চিত প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার মস্তকে আপনার সুকোমল হস্ত স্থাপন করিয়া, তাঁহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌরসুন্দরকে দেখিয়া, তাঁহার চিত্ত যে আজ আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে—বিদেশ-প্রত্যাগত প্রাণবল্লভের শুভাগমনে তাঁহার প্রাণ যে আনন্দে নৃত্য করিতেছে, সে-বিষয় আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দে গদ গদ হইয়া, পতির মুখের দিকে তাকাইলেন, এবং লজ্জাশীলার ন্যায় মস্তকটি নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দিবাবসানে তিনি বাটীর বহির্দ্দেশে উপবেশন করিলে, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তবৈষ্ণব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদের আগমনে তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত-স্থানের প্রেমের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। তাঁহারা তীর্থযাত্রার কাহিনী শ্রবণ করিতে চাহিলে, গৌর বলিলেন, "ভাই, গয়াধামের বিষ্ণুপাদ মন্দিরের ভিতর যখন প্রবেশ করিলাম, তখন দেখি কত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মধুর স্বরে বেদ পাঠ করিতেছেন, —সেই বিষ্ণু-পাদপদ্মের প্রভাবেই গঙ্গার মহত্ত্ব" এইরূপ বিষ্ণুপাদ-পদ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহার রসনা যেন নীরব হইয়া আসিতে লাগিল; তাঁহার নয়নদ্বয় জলে ভাসিতে লাগিল, শেষে আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাই চৈঃ ভাগবতে বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন,—

"পাদপদ্ম তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমলনয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
"কৃষ্ণ" বলি কাঁদিতে লাগিল বহুতর॥"

আগন্তুক বৈষ্ণবগণ নিমাইপণ্ডিতের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মনে হইল, এ কি? উদ্ধতের শিরোমণি, জ্ঞানগর্ব্বী নিমাই বিষ্ণুভক্ত হইলেন? আর তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দধারা বহিয়া

যাইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন, নিমাই আর সে নিমাই নাই, তাঁহার বাচালতা, তাঁহার জ্ঞানাভিমান, ও তাঁহার বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক মুখভঙ্গি সকলই চলিয়া গিয়াছে; সে সকলই ভক্তির সুকোমল আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে।

গৌরসুন্দর এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পদ্মের কথা বলিতে বলিতে ভাবে বিভোর হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন চেতনা লাভ করিয়া, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতিকে বলিলেন, "ভাই, আমি আমার মনের কথা তোমাদিগকে বলিতে চাই, তোমরা কল্য শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে সকলে মিলিত হইবে, আমি তথায় যাইব।" শ্রীমান্ পণ্ডিত ও সদাশিব গৌরের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া পুলকিত অন্তরে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

বিষ্ণুভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে একটি কুন্দ ফুলের ঝাড় ছিল। বৈষ্ণবেরা প্রতিদিন শ্রীবাসের বাড়ীতে পুষ্প-চয়নার্থ আগমন করিতেন। গাছটি সর্ব্বদা সহস্র সহস্র পুষ্পেতে পূর্ণ হইয়া থাকিত। ভক্তবৃন্দ সাজি হস্তে পুষ্প তুলিয়া বৃক্ষকে পুষ্পবিহীন করিতে পারিতেন না। শ্রীমান্ পণ্ডিতও পরদিন নিত্যকর্ম্ম পালনার্থ সাজি হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন। পুষ্পচয়নের সময় ভক্তদের মধ্যে গৌরাঙ্গের কথা উঠিল। গৌর কৃষ্ণভক্ত হইলেন কি না, এই প্রসঙ্গের সময় শ্রীমান্ পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে, কুন্দফুল তুলিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "গতকল্য নিমাই যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। তিনি আমাদের কয়েকজনকে আজ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবনে উপস্থিত হইতে বলিয়াছেন; তিনি তাঁহার মনের কষ্টের কথা আমাদিগকে বলিবেন।"

শ্রীবাস পণ্ডিতের কুন্দফুলের ঝাড়ের নিকট পুষ্প-ভরা সাজি হস্তে

ভক্তবৃন্দ আনন্দে "হরিধ্বনি" করিয়া উঠিলেন। গৌর বিষ্ণুভক্ত হইবেন, শ্রীমানের কথায় এই আভাস পাইয়া, শ্রীবাস পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "কৃষ্ণ আমাদের দল বৃদ্ধি করুন।"

"শ্রীমানের বচন শুনিঞা ভক্তগণ।
'হরি' বলি মহা-ধ্বনি করিলা তখন ॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
'গোত্রে বাঢ়াউক্ কৃষ্ণ আমা সভাকার ॥' "

স্রোতস্বিনী-পুলিনে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীর। এই রমণীয় স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বদিনের কথানুসারে, শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত,, মুরারি গুপ্ত,প্রভৃতি তথায় গমন করিলেন। গদাধরও তাঁহাদিগের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু গৌরের বিনা আদেশে তিনি কিরূপে তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, তাঁহার মনের কথা শ্রবণ করিবেন, সেজন্য তিনি পার্শ্বের একটি গৃহে লুকাইয়া রহিলেন। শ্রীমান্, সদাশিব, মুরারি ও শুক্লাম্বর গৌরের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় গৌরসুন্দর প্রেমে ঢলিতে ঢলিতে ও ভাগবতের শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে, তথায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে, একটি স্তম্ভ জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার প্রেমাবেশে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনিও প্রেমাবেশে ভগ্ন স্তম্ভের মৃত্তিকার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। এই ভাবের স্রোতে ব্রহ্মচারীর গৃহের সমবেত ভক্তমণ্ডলীও অঙ্গঢালিয়া দিলেন। গৌরের সঙ্গে তাঁহাদিগেরও অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়া পড়িল। সকলেরই নয়নধারায় শরীর ভাসিতে লাগিল,—হরিধ্বনিতে সে স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। গৌর একই ভাবে বিভোর। তিনি কৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া, সেই প্রেমনিধিকে পাইবার জন্য ভূমিতে মুখ ঘসড়াইতে লাগিলেন। গৌরের বাল্যবন্ধু গদাধর গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিলেন, তিনিও এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌরের কর্ণে

সে ক্রন্দন প্রবেশ করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে ঘরের ভিতর কাঁদিতেছে ?" ভক্তেরা বলিলেন "গদাধর।" গৌর গদাধরের নাম শ্রবণ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, আর বলিলেন, "গদাধর, তুমি আজীবন সাধুপুরুষ—আমি কি হতভাগ্য ! আমি প্রেম-নিধি কৃষ্ণকে পাইয়া, তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিলাম !" গদাধরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া, এই কথা বলিতে বলিতে, তিনি আবার ভাবাবেশে ভূতলে পতিত হইলেন। শ্রীমান্, সদাশিব, শুক্লাম্বর প্রভৃতি বিষ্ণু-ভক্তেরা ও অন্যান্য লোকেরা নবদ্বীপজয়ী শ্রীগৌরাঙ্গের এই অমানুষিক ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। বিষ্ণুভক্তেরা বলিতে লাগিলেন, "আর ভয় কি, নিমাই পণ্ডিত যখন আমাদের দলভুক্ত হইলেন, তখন পাষণ্ডদিগের দর্প এবার চূর্ণ হইবে।" আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ং গৌররূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন ?"

"শুনিঞা অপূর্ব্ব প্রেম সভেই বিস্মিত।
কেহো বোলে, "ঈশ্বর বা হইল বিদিত॥"
কেহ বোলে "নিমাঞিপণ্ডিত ভাল হৈলো।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হোল॥"

নিমাই পণ্ডিতের এই ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শন করিয়া সকলেরই প্রাণে যেন একটা প্রেমধারা বহিয়া গেল। কত অভক্তের প্রাণ প্রেমরসে গলিয়া গেল। যাঁহাদের রসনা কখন হরিনাম উচ্চারণ করে নাই, তাঁহাদের রসনা হইতেও সে ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল—অপ্রেমিক ব্যক্তিও প্রেমানন্দে গলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"সভে মিলি করিতে লাগিল আশীর্ব্বাদ।
"হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥"
আনন্দে লাগিলা সভে করিতে কীর্ত্তন।
কেহো গায় কেহো নাচে করয়ে ক্রন্দন॥"

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে প্রেমোন্মত্ততার পর গৌরসুন্দর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, এবং তাঁহার চরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। গঙ্গাদাস গৌরচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমার জীবন ধন্য, তোমার জন্য তোমার পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার হইয়া গেল ; বিশ্বম্ভর, তোমার অবর্ত্তমানে তোমার শিষ্যেরা অন্য কাহারও নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে চায় নাই, এবার আবার মনোযোগের সহিত, আপনার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হও।"

শত শত ছাত্র নিমাই পণ্ডিতকে দেখিবার জন্য আজ সমবেত হইয়াছে। তাহারা ভাবিতেছে, অনেকদিনের পর আবার পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের গুরু সন্নিধানে শিক্ষালাভ করিয়া মনের বাসনা চরিতার্থ করিবে। নীল আকাশের পূর্ণচন্দ্র যেমন তারকা বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে, আজ নবদ্বীপচন্দ্রও শিষ্যমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া যেন সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। গৌরচন্দ্র গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটীতে গমন করিলেন। তাঁহারই বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার চতুষ্পাঠী টোল ছিল। গৌর আসিয়া তথায় উপবেশন করিলে, পুরুষোত্তমের পুত্র মুকুন্দ সঞ্জয় আসিয়া, গৌর চরণে প্রণিপাত করিলে, তিনি তাঁহাকে নিজ কোলে গ্রহণ করিলেন। গৌরের নয়ননীরে তাঁহার শরীর সিক্ত হইয়া গেল। পুণ্যবন্ত মুকুন্দ-পরিবারে আনন্দের ধ্বনি উত্থিত হইল। নারীগণ গৌরচন্দ্রের আগমনে মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাই বৃন্দাবন দাস, তাঁহার 'চৈতন্যভাগবতে' তখনকার সেই মনোহর বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"গুরু নমস্কারিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে পঢ়ুয়া বেষ্টিত শশধর॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে॥

গোষ্ঠী-সহ মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ তাহার নাহি অন্ত॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে প্রভু কৈলা কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে॥
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম আনন্দে হইল মুকুন্দ ভবন॥"

সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। গৌর গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। শচীদেবী সন্তানের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বড়ই ভীত হইয়াছিলেন। নারীর রূপ-লাবণ্য মানুষের সংসার-বৈরাগ্য ভাঙ্গিয়া দেয়; জননী এই বিশ্বাসে সন্তানের মনের গতি ফিরাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি এখন আর কি করিবেন, নবযৌবনা বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁহার নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু পত্নীর সৌন্দর্য্যে তাঁহার আর লালসা নাই; শ্রীকৃষ্ণের মোহন সৌন্দর্য্যে তাঁহার চিত্ত এখন বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তিনি "কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাই চৈতন্যভাগবতে,—

"লক্ষ্মীরে আনিঞা পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥
নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বলে অনুক্ষণ॥"

শচীর পুত্রেরা যেন গর্ভাবস্থা হইতেই ভগবৎ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌর-জননী দেখিলেন, বিশ্বরূপ যে-পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহার প্রাণের নিমাইও সেই পথের পথিক হইবেন।

শচী পুত্রকে আহার করাইলেন। গৌর শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও যথাসময়ে স্বামি-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি

পত্নীর সঙ্গে কোন কথাই বলিলেন না। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রজনীর অন্ধকার ক্রমে যত ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল, ততই গৌরের ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল, তিনি অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া যেন ভীত হইয়া পড়িলেন ; তিনি ঘরের দ্বার খুলিয়া শাশুড়ীর রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। শচীদেবী দ্বার খুলিয়া, পুত্রবধূর মুখ হইতে পুত্রের এইরূপ ভাবাবেশের কথা শ্রবণ করিয়া, এবং বধূ-মাতাকে ভীতা দেখিয়া, তিনি তাঁহাদের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন, পুত্র যেন এ নর-লোকের মানুষ নহেন। তিনি বুঝিলেন, এ-ব্যাধি সংসারের কোন বস্তু দূর করিতে সমর্থ হইবে না। সন্তান-বৎসলা জননী, তবু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার কোমল হস্ত তাঁহার প্রাণসম পুত্রের মস্তকে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "বাবা নিমাই, কি হ'য়েছে, কাঁদ কেন ?—তুমি যে নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত, তোমার কি এরূপ করা ভাল দেখায় ?" এইরূপ নানা কথা বলিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে নিজ অঞ্চল দিয়া, চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চতুষ্পাঠীতে শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া যাওয়া অবধি, তাঁহার ছাত্রেরা আর কাহারও চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নের জন্য প্রবেশ করে নাই,—নিমাই পণ্ডিতের স্থানে তাহারা নবদ্বীপে আর কাহাকেও গুরু বলিয়া মনোনীত করিতে প্রস্তুত হয় নাই। স্নেহ, মমতা, পাণ্ডিত্য ও শিক্ষাদানের সহজ প্রণালী আর কাহারও তেমন দৃষ্ট হইত না। তাই তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার অভাবে এত-দিন বড়ই অভাব অনুভব করিতেছিল। গৌর গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া, যেরূপ উদ্দাম হরিপ্রেম দেখাইতে লাগিলেন, তাহাতে অনেকেরই মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল যে, নিমাই আর ছাত্রবৃন্দ লইয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইবেন না। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত গৌরচন্দ্রেরও মনে সে-ভাব উদিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার গুরু, বৃদ্ধ গঙ্গাদাসের অনুরোধে তিনি পুনরায় অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। চতুষ্পাঠীর কার্য্য আরম্ভ হইবে দেখিয়া, তাঁহার ছাত্রেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। গৌরাঙ্গ গঙ্গায় স্নান করিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনার জন্য গমন করিলেন। অনেক দিনের পর চতুষ্পাঠীর কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া, ছাত্রবৃন্দ মহোল্লাসে তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা হরিধ্বনি করিতে করিতে পুঁথির ডোর খুলিতে লাগিল। অধ্যাপক এখন ছাত্রদিগের পাঠ ব্যাখ্যা করিবেন। কিন্তু অদ্যকার ব্যাখ্যা নূতন আকার ধারণ করিল। গৌর বলিলেন, "হরিই সকল শাস্ত্রের মূল, আগম, নিগম প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছে।

তিনিই জগতের জীবন ; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার মতি নাই, সে-ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলেও, সে শাস্ত্রের প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগ করিয়া, যে-ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যায় পটু, সে কেবল গর্দ্দভের ন্যায় ভার বহন করে মাত্র। তাঁহারই পবিত্র নামে, জগৎ পবিত্র হইয়া যায়।" গৌর এইরূপে হরিনামের মাহাত্ম্য নানারূপে বর্ণনা করিয়া, ছাত্রদিগকে সেই হরির চরণ বন্দনা করিতে বলিলেন। আর বলিলেন, "এ নবদ্বীপে এমন কার শক্তি আছে, যিনি আমার এই ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারেন ?"

"শুন ভাই সব ! সত্য—আমারি বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধন ॥
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে ॥"

তাঁহার ছাত্রবৃন্দও নিবিষ্ট মনে তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে লাগিল। অবশেষে গৌর তাহাদিগের প্রতি একটু তাকাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি সূত্রের কিরূপ ব্যাখ্যা করিলাম ?" ছাত্রেরা বলিল, "আমরা আজ আপনার ব্যাখ্যা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ; আপনি সকল শব্দেই কেবল হরি ব্যাখ্যা করিলেন।" গৌর বলিলেন, "আজ আর পাঠের প্রয়োজন নাই, চল, একত্রে মিলিয়া স্নান করিতে যাই।" গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহারা সকলে গঙ্গায় গমন করিল।

"আজি আমি কোনরূপ সূত্র ব্যাখ্যানিল।
পঢ়ুয়া (১) সকল বোলে, কিছু না বুঝিল ॥
যত কিছু শব্দে বাখানহ কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ?

(১) পঢ়ুয়া—ছাত্র।

হাসি বলে বিশ্বম্ভর "শুন সব ভাই !"
"পুথি বান্ধ আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই ॥" চৈঃ ভাগবত।

গৌর, শিষ্যদিগের সঙ্গে জাহ্নবীর জলে অবতরণ করিয়া সন্তরণ দিতে লাগিলেন। যাঁহারা স্নান করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহার জলক্রীড়া দেখিয়া বড় পুলকিত হইলেন। কেহ কেহ তাঁহার মোহনমূর্ত্তির দিকে অনিমিষ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। স্নানান্তে গৌর বাড়ীতে আসিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গীরা নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেলেন।

গৌর বাড়ীতে আসিলে, শচীদেবী পুত্রকে অন্ন ব্যঞ্জন দিয়া, নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, নিমাই! আজ তোমার পড়ুয়াদিগকে কি শিখাইলে,—কাহার সঙ্গে কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিলে?" গৌর বলিলেন, "মা! আমি আজ ছাত্রদিগকে কেবল হরিপ্রেমের কথা শিক্ষা দিয়াছি। সেই হরির চরণ-কমলই প্রকৃত সুখের নিকেতন। মা, যে-শাস্ত্রে হরিগুণ কীর্ত্তিত হয়, সেই প্রকৃত শাস্ত্র, যাহাতে তাঁহার গুণ বর্ণিত না হয়, সে-শাস্ত্রকে শাস্ত্রই বলা যাইতে পারে না।"

তৎপর জননীকে আবার বলিতে লাগিলেন, "চণ্ডাল হইয়াও যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগী হয়, তাহা হইলে, তিনি ব্রাহ্মণপদবাচ্য; আর যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণও যদি হরিভক্তিবিহীন হন, তাঁহাকে আর ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। মা! এই জন্য হরিপ্রেমের অনুরাগিণী হও; হরিভক্তদিগকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না; কালচক্র তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। এমন জগতের পিতা যিনি, তাঁহার আশ্রয় যে গ্রহণ না করে, সে পাতকীকে চিরজীবনই দুঃখ ভোগ করিতে হয়।"

এইরূপে, গৌরচন্দ্র আহার করিতে করিতে মাতৃদেবীকে বিবিধ প্রকারে হরির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া, তাঁহাকে হরিপ্রেমের অনুরাগিণী হইতে বলিলেন।

"এতেক ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতঃ! মুখে বল 'হরি'॥"

গৌর শচীদেবীর সন্তান হইলে কি হয়, তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, হরিপ্রেম-লহরী তাঁহার হৃদয় হইতে উথলিয়া উঠিতেছে। জ্ঞানে, ভগবৎপ্রেমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। শচীদেবী তাঁহার মধুর কথা শ্রবণ করিয়া পুত্রের মধ্যে অমানুষিক শক্তি সঞ্চারের লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। গৌরের এখন শয়নে স্বপনে, জাগরণে হরি-কথা, হরিধ্যান ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার এই স্বর্গীয় প্রেম ও ভক্তিভাবের কথা শ্রবণ করিয়া, সকলেই বিস্মিত হইতে লাগিলেন।

সে-দিন চলিয়া গেল। পরদিন প্রভাত কালে নিমাইয়ের ছাত্রবর্গ অধ্যয়নার্থ চতুষ্পাঠীতে সমবেত হইল। অধ্যাপকও ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিবার জন্য উপবেশন করিলেন। ছাত্রেরা জিজ্ঞাসা করিল, "সিদ্ধবর্ণের সমন্বয় কি?" গুরু তদুত্তরে বলিলেন, "সকল বর্ণে নারায়ণই সিদ্ধ।"

ছাত্রেরা বলিল, "সিদ্ধবর্ণ কিরূপে হইল?" নিমাইপণ্ডিত উত্তর দিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিতেই সিদ্ধবর্ণের সমন্বয় হয়।" ছাত্রবৃন্দ গুরুর মুখ হইতে সিদ্ধবর্ণের এরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া, একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমরা আপনার উত্তর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত গৌরচন্দ্র তখন ছাত্রদিগকে বলিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ জগতের আদি, মধ্য, তিনি সকলই।" এই কথা বলিয়া, তিনি প্রেমে গদগদস্বরে তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণেই আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। যথা, চৈঃ ভাগবতে—

" 'সিদ্ধবর্ণ সমন্বয়?' বোলে শিষ্যগণ।
প্রভু বোলে 'সর্ব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥'

শিষ্য বোলে 'বর্ণসিদ্ধ হইল কেমনে ?'
প্রভু বোলে 'কৃষ্ণ দৃষ্টিপাতের (১) কারণে ॥'
শিষ্য বোলে 'পণ্ডিত ! উচিত ব্যাখ্যা কর।'
প্রভু বোলে 'সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর (২) ॥
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণভজন বুঝায় ॥' "

ছাত্রবৃন্দ ব্যাখ্যা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল, আর পরস্পর এই বলাবলি করিতে লাগিল, ও-সকল বায়ুর লক্ষণ ভিন্ন আর কিছু নহে। ছাত্রদিগের কথায় গৌরাঙ্গদেব বুঝিলেন যে, তাহারা এরূপ ব্যাখ্যায় কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছে না, তখন গৌর তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আজ বৈকালে আসিও, আমি ভালরূপে তোমাদিগকে পাঠ বুঝাইয়া দিব।"

গৌরের শিষ্যবৃন্দ গুরুর এই কথা শ্রবণ করিয়া, পুঁথিতে ডোর বাঁধিল। অবশেষে দলবদ্ধ হইয়া, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট যাইয়া তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করিল। গঙ্গাদাস নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রদের নিকট হইতে, গৌরের অদ্ভুত কৃষ্ণপ্রেমের কথা শ্রবণ করিয়া, তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এখন গৃহে যাও, আমি নিমাইকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিব, 'তিনি যেন এবার হইতে, রীতিমত সূত্রাদির ব্যাখ্যা করিয়া তোমাদিগকে বুঝাইয়া দেন।"

নিমাই পণ্ডিত তথায় উপস্থিত হইলে, গঙ্গাদাস নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাপ বিশ্বম্ভর! আমার কথা শুন, অধ্যাপনা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে সামান্য ভাগ্যের কথা নহে। তোমার মাতামহ নীলাম্বর

---

(১) দৃষ্টিপাতের—কৃপার।

(২) স্মঙর—স্মরণ কর।

চক্রবর্ত্তী ও তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্র, পুরন্দর, সকলেই পণ্ডিত। তুমি পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তুমিও পণ্ডিত। অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলে যদি ভক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে, তোমার পিতা ও পিতামহ ইঁহারা কি ভক্ত ছিলেন না? অজ্ঞ ব্যক্তি কি সম্যক্‌রূপে ভালমন্দ বুঝিতে সমর্থ হয়? আমার এই সকল কথা শুনিয়া, তুমি মনোযোগের সহিত অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। দেখ, আমার মাথা খাও, কোন সূত্রের অযথা ব্যাখ্যা করিও না।"

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের এই মিনতি শ্রবণ করিয়া, বিশ্বম্ভরের মন যেন ক্ষণকালের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি শিষ্যদিগকে পড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আমি চতুষ্পাঠীতে বসিয়া, এবার সূত্রের ব্যাখ্যা করিব, দেখি, নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত কে আছেন, যিনি আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারেন।" এই বলিয়া, তিনি গুরুর চরণে প্রণত হইয়া, চতুষ্পাঠীতে গমন করিলেন। গৌরাঙ্গের কথানুসারে ছাত্রেরাও সমবেত হইল।

এমন সময়ে যেন এক বীণার ঝঙ্কার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠিল। চতুষ্পাঠীর নিকটে রত্নগর্ভ নামে এক ব্রাহ্মণ অতি সুমধুর স্বরে ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন। সেদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার সেই মধুর স্বরে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমিক গৌরের কর্ণে সে মধুর ধ্বনি প্রবেশ করিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শিষ্যবৃন্দসহ তথায় গমন করিলেন। পাঠ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, তিনি, "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভাগবত-পাঠক রত্নগর্ভ গৌরের এই অমানুষিক ভক্তির লক্ষণ দর্শন করিয়া, আরও মধুরতর ভাবে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। গৌরেরও প্রেমোচ্ছ্বাস আরও

বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবে যখন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন, তখন রত্নগর্ভ পাঠ বন্ধ করিয়াছিলেন।

রত্নগর্ভ গৌরের ঈদৃশ অমানুষিক ভক্তির ভাব দর্শন করিয়া, তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া, চিরদিনের জন্য তাঁহার প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। গৌর চেতনা লাভ করিয়া, ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি চঞ্চলতা প্রকাশ করিলাম?" তাহারা অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিল, আপনার ভাব দেখিয়া, আমরা কৃতার্থ হইলাম। এদিকে ক্ষীণ রবিকিরণ ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে মিশিবার উপক্রম করিতেছে। গৌরচন্দ্র শিষ্যবৃন্দের সহিত জাহ্নবী-তটে গমন করিলেন, এবং তথায় তাঁহাদিগের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রসঙ্গে ক্ষণকাল অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। গৌর চতুষ্পাঠীতে গমন করিলেন। ছাত্রবৃন্দও একে একে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। তাহারা ধাতুর সংজ্ঞা কি, জিজ্ঞাসা করিলে, গৌর বলিলেন, "ধাতুর সংজ্ঞা করিব, দেখি, নবদ্বীপে কোন্ পণ্ডিত আমার এই ব্যাখ্যার দোষ দেখাইতে পারেন?" এই বলিয়া, তিনি এইরূপে ধাতুর ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, "সর্ব্বদেহেই শ্রীকৃষ্ণ ধাতুরূপে স্থিতি করিতেছেন, যে মানবদেহে ধাতু না থাকে, সে-দেহ মৃত; স্পর্শ করিলে, স্নান করিতে হয়—ধাতুর সংজ্ঞা—কৃষ্ণ-শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।" গৌর এইরূপে ক্ষণকাল ধাতুর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "কে এমন আছে, আমার এই ব্যাখ্যা খণ্ডন করুক।"

ছাত্রেরা নিস্তব্ধ হইয়া গৌরের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে পর, তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ধাতু সূত্রের কিরূপ ব্যাখ্যা শুনিলে?" ছাত্রেরা বলিল, "আপনি ধাতুর যে ব্যাখ্যা করিলেন, কাহার সাধ্য তাহা খণ্ডন করিতে পারে? আপনি যে-সকল কথা বলিলেন, সকলই সত্য, তবে আমরা যে-উদ্দেশ্যে পাঠ করি, উহার ব্যাখ্যা ওরূপ নহে।"

গৌরের দেহ হইতে তখন এক দিব্য লাবণ্য বাহির হইতেছে; নয়নজলে, যেন তাঁহার দৃষ্টিশক্তিকে রোধ করিয়া ফেলিতেছে। তিনি সজলনয়নে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আমার বায়ুরোগ হইয়াছে?" ছাত্রেরা বলিল, "আপনি সকল বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনেই রত, লোকে আপনাকে নরলোকের অতীত বলিয়া মনে করিতেছে। আজ দশ দিন হইল, আমাদের পাঠ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" গৌর ছাত্রদিগের মুখ হইতে এ-সকল কথা শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, "ভাই সকল! কৃষ্ণবরণ এক শিশু, সদাই আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া, বংশীর মোহনস্বরে আমার চিত্ত বিমুগ্ধ করিতেছে। আর সেই বংশীধারী শিশুর মধুময় সত্বা আমি অন্তরে বাহিরে সদাই দর্শন করিতেছি। ভাই, সে-রূপ দর্শনে, সে মুরলীর ধ্বনি শ্রবণে আমার প্রাণ যেন পাগল হইয়া উঠিতেছে; আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ যেন রোধ হইয়া আসিতে লাগিল; তিনি অশ্রুসিক্ত লোচনে, করুণস্বরে ছাত্রদিগকে বলিলেন, "ভাই সকল, আমি আর তোমাদেয় পড়াইতে পারিব না। তোমরা অন্যত্র গিয়া অধ্যয়ন কর।" যথা, চৈঃ ভাগবতে,—

"কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখো তাই ভাই বোলো সর্ব্বথায়॥
যত্র শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণ নাম।
সকল ভুবন দেখো—গোবিন্দের ধাম॥
তোমা সবা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজ হইতে আর আমি নাহিক আমার॥"

ছাত্রগণ গুরুর কথা শ্রবণ করিয়া, অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিল, "আমরা আপনার ভক্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করুন, আপনি যাহা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা যেন চিরদিন আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে। আমরা আর অন্য কাহারও নিকট শিক্ষার জন্য

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব না; আপনার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।” এই সকল কথা বলিয়া, বিষাদিত অন্তরে তাহারা পুঁথিতে ডোর বাঁধিয়া, একে একে গুরুর চরণস্পর্শ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করতঃ অবশেষে সকলে মিলিয়া, সমস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গ স্নেহভরে সকলকে আলিঙ্গন দান করিলেন, এবং তাহাদের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সংকীর্ত্তনারম্ভ ও ভক্তসেবা

গৌর অধ্যাপনা হইতে বিরত হইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রেমপ্রবাহ তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে আঘাত করিয়া, তাহাদের হৃদয়কেও উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। গৌরাঙ্গের প্রতি অচলা ভক্তিবশত চতুষ্পাঠীর অনেক ছাত্র আর কোন চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিল না। অনেকেই তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, ভক্তির শান্তিদায়িনী পথ অবলম্বন করিল।

ইতিমধ্যে গৌরের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে, তিনি করতালি দিয়া, এই সঙ্গীতটি গাহিতে লাগিলেন।

“হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥”

শ্রীগৌরাঙ্গ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া, আপনার বাটীর আঙ্গিনায় যখন

করতালি দিয়া এই কীর্ত্তনটি গাহিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অধিকাংশ ছাত্র, তাঁহার সঙ্গে এই কীর্ত্তনে যোগদান করিল। গৌর মধুর ভাবে অথচ উচ্চৈঃস্বরে "বোল হরি বোল" বলিতে লাগিলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি কীর্ত্তন করিতে করিতে, ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, এবং কখন কখন প্রেমাবেশে জ্ঞানহীন হইয়া পড়িলেন।

যে সংকীর্ত্তনের মধুর ভাবে কত লোক জীবন পাইয়াছে; কত লোকের শুষ্ক হৃদয় সরস হইয়াছে; যাহার মধুর প্লাবনে নরনারীর হৃদয় হইতে কত পাপ, নীচতা ও স্বার্থপরতা ভাসিয়া গিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গের বাটীর প্রাঙ্গণেই তাহার সূত্রপাত হইল। ভক্তচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গদেব, ছাত্রবৃন্দসহ সে মধুর ধারা প্রথম প্রবাহিত করিলেন। কীর্ত্তনের কলরব, তরঙ্গের ন্যায় বহুদূর ব্যাপিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। নিকটের ও দূরের বহু লোক গৌরের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ, নিমাই পণ্ডিত কীর্ত্তন করিতেছেন শুনিয়া, মহোল্লাসে তাঁহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খোল নাই, করতাল নাই, বাদ্যের মধ্যে কেবল ভক্তগণের করতালির ধ্বনি; গৌরের কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে ভক্তগণের কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইয়া বায়ুতে যেন এক মধুর তরঙ্গ উত্থিত করিল। হরিনামের মধুর ভাবে সকলের প্রাণ বিমোহিত হইয়া পড়িল। অনেকে তাঁহার সঙ্গে নাচিয়া গাহিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল, অনেকে যেন চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় গৌর ও তদীয় ভক্তবৃন্দের সংকীর্ত্তন দর্শন করিতে লাগিল।

নিজে না মাতিলে অপরকে মাতান যায় না। নিজে কোন্ বস্তুর রসাস্বাদন না করিলে সে-রসের কথা অপরকেও ভাল করিয়া বলা যায় না। গৌরচন্দ্র ভগবানের নাম-কীর্ত্তনের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন,

এবং ভগবৎপ্রেমের শক্তি নিজে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন ; তাই তিনি সেই সময় এই মধুর শ্লোকটি রচনা করিয়া সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং, বিদ্যাবধূজীবনং॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং, প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং, পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তনে মানুষের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয় ; সংসাররূপ দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। ইহার বিমল আলোকে হৃদয়ে শ্রেয়ঃ কুমুদ বিকশিত হয় ; আনন্দ-জলধি উচ্ছ্বসিত হয়। ইহার প্রতিপদ অমৃতের পূর্ণ আস্বাদযুক্ত ; এবং ইহা প্রাণ-তৃপ্তিদায়িনী।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মত্ততা দর্শন করিয়া, লোকে বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিল, "নিমাই পণ্ডিত উদ্ধতের শিরোমণি ছিল, জ্ঞানগর্ব্বে সদা মত্ত হইয়া থাকিত ; বৈষ্ণবদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত না, তাহার আজ একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!" কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "আমরা ত আর ইহজীবনে কোন মানুষের মধ্যে এরূপ অপূর্ব্ব ভক্তির ভাব কখন দর্শন করি নাই,—এমন উচ্চ ভক্তির লক্ষণ দেবর্ষি নারদের মধ্যেও বোধ হয় পরিলক্ষিত হয় নাই।" সত্যই, আজ নবদ্বীপে গৌর ভগবদ্ভক্তি লাভের এক নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন, তৃষিত ও তাপিত প্রাণের জন্য স্বর্গের প্রেম-নদী হইতে এক নূতন বারি আনয়ন করিলেন। গৌর দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া যেন সকলের নিকট এই ঘোষণা করিলেন,—পরমেশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন বড়ই মধুর, আত্মার পক্ষে অতীব শান্তিপ্রদ!

গৌরচন্দ্রের ভগবৎ-প্রেম প্রচারের এই নব অনুষ্ঠানে অনেকেই আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই এই দিগ্বিজয়ী জয়ী নিমাই পণ্ডিতের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে, এই আশায়

বৈষ্ণবদিগের চিত্ত অধিকতররূপে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া, তাঁহারা বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য গমন করিলেন। ভক্তগণের মুখ হইতে সংকীর্ত্তনের কথা শ্রবণে তিনি আনন্দে যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, "ভাই সকল, আমি গতরাত্রে কি স্বপ্ন দেখিয়াছি তোমরা শুন, আমি গীতা পাঠ করিতে করিতে, তাহার কোন অংশের অর্থ ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া, মনের দুঃখে উপবাস থাকিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। রাত্রি অধিক হইলে, আমার শয্যার নিকট কে যেন আসিয়া আমার পাঠের অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া বলিল,—'তুমি এখন শয্যা হইতে উঠিয়া ভোজন কর; তুমি যে অভাব পূর্ণ করিবার মানসে, অনাহারে থাকিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকট অকপট ও ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিয়াছ, তিনি এই নবদ্বীপে প্রকাশিত হইয়াছেন, আর দুঃখ নাই, আর ভয় নাই; যে মধুর হরিনাম প্রচারের জন্য তুমি ব্যাকুল, সে মধুর হরিনাম দেশে বিদেশে ও গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হইবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, শ্রীবাসের গৃহে ভক্তদল মিলিত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিবে। তুমি আর এরূপ ভাবে থাকিও না, উঠিয়া ভোজন কর।' আমি তৎপর চক্ষু মেলিয়া দেখি, গৌরসুন্দর আমার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু ত্বরায় তিনি আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।" অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তগণের নিকট এই পরম প্রীতিকর স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া মহানন্দে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবেরাও, তাঁহার সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে "হরি হরি" বলিয়া উঠিলেন। বৈষ্ণবেরা আচার্য্য চরণে প্রণিপাত করিয়া, বিদায় লইলেন। কিছুদিন পরে আচার্য্য গৌর-প্রমুখ কীর্ত্তনকারীদিগের সহিত যোগদান করিয়া, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

ভক্তি বড় কোমল পদার্থ; উহার স্পর্শে মানবের মন সরস হয়, অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা দূরে পলায়ন করে। গৌর ঔদ্ধত্যের শিরোমণি ছিলেন। কিন্তু তিনি আজ ভক্তির প্রভাবে নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি এখন বিনয়ের অবতার, তাঁহার জ্ঞানগর্ব্বিত হৃদয় সুধামাখা ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি এখন ভক্তবৃন্দের চরণসেবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

প্রভাতকালে গৌর স্নানার্থ গঙ্গায় গমন করিলেন। তথায় শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তিনি অতি বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা গৌরের বিনয় দর্শনে অত্যন্ত প্রীতমনে, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাপু! তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভজনা কর, তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর; তাঁর ভজনা না করিলে বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ সকলই বৃথা।" ভক্তগণের এই শুভ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তাঁহার চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি অতি বিনয়ের সহিত সকলকে বলিলেন, "তোমরা এ-দাসকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দাও, তোমরাই বিষ্ণুধর্ম্ম শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি; তোমরা আশীর্ব্বাদ করিলে, আমার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইবে।"

গৌরাঙ্গের হৃদয় এখন কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ভক্তদের সেবা করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তিনি জাহ্নবী-তটে যাইয়া, কোন ভক্তের আর্দ্র বস্ত্র নিংড়াইয়া দিতেন; কাহারো অবগাহনের পর, তাঁহার পরিধানের শুষ্ক বস্ত্র নিকটে আনিয়া দিতেন; বিষ্ণুপূজার জন্য যাঁহারা ফুলের সাজি লইয়া আসিতেন, তাঁহাদের গৃহে ফিরিবার সময়, গৌর সাজি হাতে করিয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গে গমন করিতেন; নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের এই সকল কার্য্য দেখিয়া, তাঁহারা অতি ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া বলিতেন, "কি কর! কি কর!" কিন্তু নিমাই এখন সে নিমাই নাই! তিনি বিনয়ের অবতার। ভক্তির সঙ্গে ভক্তসেবার যেন কোন

বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই জন্য তিনি তাঁহাদের আপত্তির প্রতি বিশেষ কর্ণপাত না করিয়াও সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

"সভারে (১) শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে (২)॥
সাজি বহে ধূতি বহে, লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হস্ত আসি ধরে॥" চৈঃ ভাগবত।

ভক্তগণ নিমাইয়ের এইরূপ সেবার কার্য্য দর্শন করিয়া, শতকণ্ঠে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি সদাই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ কর, তিনিই তোমার জীবন হউক। হরিভক্তিহীন পাপীরা নিজেও হরিনাম করে না, আর যাঁহারা সে-নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের দেখিয়া হাস্য করিয়া থাকে। আমরা বেশ বুঝিতেছি, তোমা হইতেই হরিভক্তিহীন লোকদিগের অহঙ্কার চূর্ণ হইবে; তুমি চিরজীবী হ'য়ে হরির গুণ কীর্ত্তন কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগের শুভ আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া বলিলেন, "তোমরা ভক্ত, তোমরা যাহা বলিলে, শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে তাহাই হইবে। তোমরা আমাকে তোমাদের সেবক বলিয়া জানিবে।" এই বলিয়া নত-মস্তকে বিশ্বম্ভর সকলের চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

গৌরের ভক্তদল ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন তাঁহারা শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সময়ে সময়ে কীর্ত্তনকারীরা কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। কীর্ত্তনের ধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত হইত। গৌর ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের প্রভাবে নবদ্বীপ টলমল করিয়া উঠিল। জ্ঞানপ্রধান

---

(১) সভারে—সকলকে। (২) আপনে—নিজে।

নবদ্বীপে ভক্তির গঙ্গা বহিতে আরম্ভ হইল। নবদ্বীপে এক নবজীবনের সঞ্চার হইতে লাগিল।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কথা পূর্ব্বে কিছু উল্লেখ করা গিয়াছে। ইনি জাহ্নবীর তটে একটি সুন্দর আশ্রমে বাস করিতেন। ইনি তপস্বী। বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর গৌরের ভক্তি-পথ অবলম্বন করিবার প্রয়াসী হইয়া, তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি মধুপুরী, দ্বারাবতী প্রভৃতি সকল স্থানই পর্য্যটন করিয়াছি; এখন আমাকে প্রেমধন বিতরণ কর।" ব্রহ্মচারীর কথা শ্রবণ করিয়া, গৌরের মনে হইল, নানাস্থান ভ্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া যেন তিনি জ্ঞানের পরিচয় দান করিতেছেন। গৌর যেন তাঁহার কথার মধ্যে কিছু অহঙ্কারের আঘ্রাণ পাইলেন। শুক্লাম্বর প্রেমপ্রার্থী হইলেও, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ শুক্লাম্বর, সে সকল বনে অনেক শৃগাল কুকুর প্রভৃতি বাস করে। তাতে আমার কি হইল! শ্রীকৃষ্ণে মতি না থাকিলে সবই বৃথা।" তাই লোচন দাস, তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,—

"নানা-তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ—কিছুই না জানি॥
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলু্ পর্য্যটন।
দুঃখিত হঞাছি আমি—দেহ প্রেমধন॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু কহিল উত্তর।
মোর এক বোল তুমি শুন শুক্লাম্বর॥
সে বনে কতক আছে শৃগাল-কুক্কুর।
আমার কি হৈল তাথে কহিল ঠাকুর॥
হৃদয়ে যাবত কৃষ্ণ উদয় না করে।
তাবত তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে॥"

শুক্লাম্বর গৌরের কথা শুনিয়া, নিজ দোষ বুঝিতে পারিলেন; এবং ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন গৌর তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে সুখী করিয়াছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,—

"অনুগত আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে।
করুণ অরুণ ভেল (১) গৌর কলেবরে॥
প্রেম দিল প্রেম দিল ডাকে আর্ত্তনাদে।
শুক্লাম্বর বিপ্র পাইল প্রেম পরসাদে॥"

ভক্তেরা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রেমোন্মত্ততা ও শ্রীবাস পণ্ডিত

ভক্ত-সেবক গৌরসুন্দরও ভক্তদিগের শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রফুল্ল মনে আপন ভবনে গমন করিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে ভক্তি-বিরোধীরা হরিভক্তদিগের প্রতি উপহাস প্রদর্শন করে, ইতঃপূর্ব্বেই গৌর বিষ্ণুভক্তদিগের নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির সঞ্চার হইল, এবং তাহাদিগের শুষ্কতা দূর করিবার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

তিনি একদিন চীৎকার করিয়া,—"মুঞি (২) সেই, মুঞি সেই," হুঙ্কার রবে এই কথা বলিতে বলিতে, কখন ক্রন্দন ও কখন হাস্য করিতে

(১) ভেল—হইল। (২) মুঞি—আমি।

লাগিলেন এবং অবশেষে মনের আবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। গৌর এখন প্রেমোন্মত্ত ; পতিপরায়ণা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার নিকটে আসিলে, তিনি তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইতেন। তিনি স্বামীর ঈদৃশ ভাব দেখিয়া, দূরে পলায়ন করিতেন। গৌর এইরূপে যেন ক্ষিপ্তের ন্যায় কখন ভূতলে গড়াগড়ি দিতেন, আর কখন বা দৌড়িয়া গিয়া, বৃক্ষের শাখায় অধিরোহণ করিয়া, চক্ষু নিমীলিত করিয়া বসিতেন। গৌরসুন্দরের এ-সকল কার্য্য দেখিয়া, লোকে তাঁহার বায়ুরোগ জন্মিয়াছে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিল। পূর্ব্বে তাঁহার একবার এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, সেজন্য লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, এবারও আবার তাঁহার সেই ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে। এই বিশ্বাসে তাহারা শচীদেবীকে বলিতে লাগিল,—"নিমাইয়ের পূর্ব্বের ন্যায় বায়ুরোগের সঞ্চার হইয়াছে, উহাকে শিবাঘৃত মাখাও, ডাবের জল খাইতে দাও, বায়ু নামিয়া যাইবে।" গৌর ক্রমে অতি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, হরিভক্তিবিহীন লোক দেখিলে, তাহাকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হন। লোকে তাঁহাকে বাঁধিয়া রীতিমত বায়ুরোগের চিকিৎসা করিতে বলিল। জননীর প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, চক্ষের জলে, তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে, তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার সোণার চাঁদ পুত্রকে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিলেন, এবং বৈদ্যের পরামর্শানুসারে, সন্তানের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। শচীদেবীর স্বামী নাই, বিশ্বরূপ অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র গৌরসুন্দর, তাঁহার এই দশা! তদুপরি বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দর্শনে মনোবেদনা, এই সকল বিষাদের ঘটনা পরম্পরায় তাঁহার মনে যে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। শচী এখন পুত্রের আরোগ্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া, আত্মীয় স্বজনের নিকট পরামর্শ চাহিতে লাগিলেন ; তাঁহার আত্মীয় ও হিতৈষীদিগকে, সন্তানের অবস্থা দেখিবার জন্য,

অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পুরন্দর মিশ্রের পুত্র রূপবান ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার বায়ুরোগ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, অনেকেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, আগমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরকে বড় স্নেহ করিতেন। শচী বিষ্ণুভক্ত সাধুদিগের নিকট নিমাইয়ের অবস্থার কথা বলিয়া পাঠাইলেন। শ্রীবাস আসিলেন। শ্রীবাসকে দেখিবামাত্র, গৌর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। চন্দ্রোদয়ে যেমন সাগরের জল উথলিয়া উঠে, পরম বিষ্ণুভক্ত শ্রীবাসকে দেখিয়া, গৌরের ভাবসাগর যেন সেইরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ভক্তির লক্ষণ সকল তাঁহাতে প্রকাশ পাইতে লাগিল, চক্ষু দিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল, দেহ কণ্টকিত হইল, তিনি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জহরীই জহর চিনিতে পারে। শ্রীবাস দেখিলেন, নিমাই হরিনামের সুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন, এ বায়ুরোগ সামান্য নহে,—এ দেববাঞ্ছিত। গৌর কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত, লোকে বলে, আমার বায়ুরোগ জন্মিয়াছে, আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে বলে; তুমি ত সব ভাল বুঝ, তুমি আমার অবস্থা দেখিয়া কি মনে কর, তাহা বল।" শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরের কথা শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভাই! তোমার রোগ যদি আমি পাই, তাহা হইলে, আমার জীবন কৃতার্থ হয়! শ্রীকৃষ্ণ তোমার শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভক্তিযোগের সকল লক্ষণই তোমাতে প্রকাশ পাইতেছে।"

হাসি বোলে শ্রীবাসপণ্ডিত "ভাল যাই।
তোমার যেমত বাই তাহা আমি চাই॥
মহাভক্তি যোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥"

বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের নিকট হইতে এই সকল আশার বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম পুলকিত অন্তরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! সকলেই বলে, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে, কিন্তু তুমি অন্যরূপ বলিলে, তুমি যদি অন্যের কথার ন্যায়, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে বলিতে, তাহা হইলে, আমি গঙ্গার জলে প্রবেশ করিয়া, এ দেহ নিপাত করিতাম।"

"যদি তুমি বায়ু-হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি আমি গঙ্গার ভিতরে॥"

নিমাইয়ের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস বলিলেন, "নিমাই, তোমাতে যে ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, সে দুর্লভ ভক্তি লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মা, শিব, শুক প্রভৃতি পরম ভাগবতগণও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। আমরা উভয়ে মিলিয়া কীর্ত্তন করিব। আমাদের কীর্ত্তন শ্রবণে পাষণ্ডীরাও ক্রমে হরিভক্ত হইয়া উঠিবে।" তৎপর শ্রীবাস, চিন্তাকুলা শচীদেবীকে বলিলেন, "আপনার নিমাইয়ের বায়ুরোগ হয় নাই, এ-সকল তাঁহার কৃষ্ণ প্রেমেরই পরিচয়; অপর লোকে কি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হয়? এ-সকল কথা অন্য কাহারও নিকট বলিবার প্রয়োজন নাই, কিছুদিন পরে আপনি আপনার এই পুত্রের জীবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার আরও অনুপম ঘটনা সকল দর্শন করিবেন।"

শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট হইতে গৌর-জননী যখন শুনিলেন যে, তাঁহার সন্তানের বায়ুরোগ হয় নাই, উহা কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল ভাব মাত্র, তখন তাঁহার মন হইতে অনেকটা দুর্ভাবনা বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু আবার আর এক চিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। তাঁহার সদাই মনে হইতে লাগিল, ভগবানের প্রতি এত প্রেম যার, সংসারের প্রতি যার এত উদাসীনতা, সে কি কখন সংসারে বাস করিতে পারে? নিমাই বোধ হয় সন্ন্যাসী হইবে, এই চিন্তার আবেগে তাঁহার প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল।

গৌরসুন্দর শ্রীবাসের কথায় আনন্দলাভ করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি একদিন গদাধরের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, আচার্য্য এক তুলসীবেদী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে দুই হস্ত তুলিয়া, সিংহরবে হরিধ্বনি করিতেছেন। আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছে। অদ্বৈতের এই ভাব দর্শন করিয়া, গৌরের হৃদয় ভাবে উথলিয়া উঠিল। তিনি আর মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ভূতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, তাঁহাকে সামান্য মানব বলিয়া মনে করিতেন না; তিনি মানবাকারে হরিনাম বিলাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি সেজন্য তাঁহাকে আপন ভবনে আগমন করিতে দেখিয়া যেন সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি আমাকে ফাঁকি দিবে, আজ ধরা পড়িয়াছ—চোরা, তুমি কোথায় পলাইবে?"

গৌরসুন্দর মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য সেই স্নেহপূর্ণ, ভক্তিমাখান বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে মনের আবেগে পঞ্চোপচারে তাঁহার পূজা করিয়া, গৌরাঙ্গের চরণে প্রণত হইলেন। গৌরের সঙ্গী গদাধর আচার্য্যকে গৌরের পূজা করিতে দর্শন করিয়া জিহ্বা কামড়াইয়া বলিলেন, "গৌর বালক, তাঁহাকে পূজা করা আপনার উচিত নহে।" অদ্বৈতাচার্য্য গদাধরের বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এ কেমন বালক কিছুদিন পরে জানিতে পারিবে।" অদ্বৈতাচার্য্যের বয়স এখন সত্তর বৎসর।

কিছুক্ষণ পরে গৌর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়াছেন। গৌর আচার্য্যের এই কার্য্যের জন্য অতি বিনীতভাবে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আজ আমি আপনার দর্শনলাভে জীবনকে ধন্য মনে করিতেছি। আপনার দর্শনে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভাব উদয় হয়।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নিশা সংকীর্ত্তন ও অলৌকিক ভাব প্রদর্শন

শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যাকুলতা, প্রেমোন্মত্ততা ও ঐকান্তিক ভগবৎনিষ্ঠা দর্শন করিয়া বৈষ্ণবদল, ক্রমে তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িলেন; এত বড় পণ্ডিত বিষ্ণুভক্ত হইলেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রাণে এক নূতন বলের সঞ্চার হইতে লাগিল। লৌহ যেমন চুম্বক পাথরের দিকে আকৃষ্ট হয়, নবদ্বীপের বৈষ্ণবের দলও সেই ভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারা যেন ধরাধামে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

গৌর ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারের অবতারস্বরূপ হইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছেন। নাম সংকীর্ত্তনই তাঁহার প্রচারের মহামন্ত্র। সে মন্ত্র বিশেষভাবে সাধন করিতে হইবে; সেজন্য তিনি আপন ভবনে মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; ভক্তগণ তাঁহার ভবনে সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। সায়ংকালে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত; ভক্তেরা কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপে কাটিয়া যাইত; অবশেষে নিশা অবসানে দেখা যাইত, তখনও নাম সংকীর্ত্তনের তরঙ্গ সমভাবেই উত্থিত হইতেছে। এমন ব্যাপার কেহ কখনও দেখে নাই; গৌরই এ ভক্ত-সম্মিলনের মূল। তিনিই এ মধুর সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। গৌর যখন ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তন করিতেন, তখন তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিত; তাঁহার নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইত; ভাবাবেশে তিনি যেন স্পন্দহীন হইয়া পড়িতেন। তাঁহার এই সকল লক্ষণ দর্শন করিয়া, লোকে তাঁহাকে নরলোকের অতীত বলিয়া

বিশ্বাস করিতে লাগিল ; তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। অনেক নারীও তাঁহাকে কৃষ্ণাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল।

সংকীর্ত্তনের মাঝে গৌর সকলের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেন। আর বলিতেন, "কৃষ্ণ, দেখা দিয়া কোথায় পলাইয়া গেলেন !" একদিন সে মোহন মূরতির বিষয় বন্ধুদিগকে বলিলেন, "দেখ ভাই, গয়া হইতে আসিবার সময় কানাই নাট্যশালায়, এক শ্যামল সুন্দর বালক, বংশী হস্তে দেখা দিয়া কোথায় পলায়ন করিল ; সেই সুন্দর মোহন মূর্ত্তি দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে।" এই বলিয়া, তিনি তাঁহার বিরহে অস্থির হইয়া পড়িলেন।

একদিন গদাধর তাম্বূল লইয়া গৌরসুন্দরের নিকট আগমন করিলেন। গৌর তাঁহাকে ব্যাকুল অন্তরে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ কোথায় আছেন ? সে অপরূপ রূপমাধুরী দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে অস্থির হইয়াছে।" গদাধর তদুত্তরে বলিলেন, "কৃষ্ণ সকলেরই দেহে বাস করিতেছেন।" গদাধরের মুখ হইতে এই কথা বিনিঃসৃত হইবা-মাত্র, তিনি নখ দ্বারা আপনার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। গদাধর তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "এখনি কৃষ্ণ আসিবেন, স্থির হও।" গদাধর তাঁহাকে এইরূপে প্রতিনিবৃত্ত না করিলে, গৌর আপনার নখ দ্বারা বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিতেন। তাই চৈতন্য ভাগবতে,—

" 'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥
আথে ব্যথে গদাধর দুই হাত ধরি।
নানা-মতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি।"

গদাধরের আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া, গৌর বড় সন্তুষ্ট হইলেন ;

এবং গদাধর যে গৌরাঙ্গকে নখ দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবার উদ্যোগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, সেজন্য তাঁহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

শচীদেবীর ভবনে যেন নিত্য মহোৎসব হইতে লাগিল। সুগায়ক ও ভক্ত মুকুন্দ দত্ত সুস্বরে ভাগবত পাঠ করিতেন, আর গৌর ভাবে বিভোর হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। ভক্তগণ অলিকুলের ন্যায় হরি নামের সুধা পান করিবার জন্য সায়ংকালে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইতেন, এবং সকলে মিলিয়া সমস্ত রজনী সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদের সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে প্রতিবেশীদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। অনেকেই বলিতে লাগিল, এরকম না করিলে কি আর হরিভক্তি হয় না? চারিদিকেই একটা ভয়ানক গোলযোগ পড়িয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ভক্তদল ক্রমে অনেকের অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্য-পরিচালিত সংকীর্ত্তনকারীদিগের প্রতি লোকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কেহ বলিল, রাজার আজ্ঞাতে বৈষ্ণবদল ধৃত হইবে, এবং তাঁহাদিগকে এস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করা হইবে; কেহ বলিল, শ্রীবাস পণ্ডিতই ইহার মূল, তাঁহাকেই বাঁধিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুইখানা নৌকা আসিবে। এইরূপ জনরবে নবদ্বীপের চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সরলচিত্ত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহারা কোন সামান্য ভয়ের কারণেই বিচলিত হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবদলের মধ্যে কেহ কেহ, এই জনরবে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীবাস বিচক্ষণ, পণ্ডিত ও ভক্ত হইলেও, সরল সাদাসিদা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নবাবের আজ্ঞায় ধৃত হইয়া বন্দী হইবেন, এই বার্ত্তায় তাঁহার চিত্ত কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রমুখ ভক্তদলকে ভীত করিবার জন্য লোকে এইরূপ বার্ত্তা প্রচারেই রত হইয়াছিল।

মহাপুরুষেরা চিরদিনই নির্ভীক। তাঁহারা সহজে কোন বিষয়েই বিচলিত হন না। বৈষ্ণবদিগের প্রতি রাজদণ্ড বিধান করা হইবে, এই বার্ত্তা গৌরের কর্ণে যখন প্রবেশ করিল তখন তিনি সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া, তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে চন্দন লেপিয়া দিয়া, তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে নির্ভয়ে রাজপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নরনারী তাঁহার চাঁচর কেশ, তাঁহার অত্যুজ্জ্বল রূপ ও প্রফুল্ল আনন দর্শন করিয়া, তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। দেখিলে মনে হইত, যেন কোন রাজপুত্র নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

"এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়॥"

যখন মত্ততার সহিত নিশা-কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, তখন অনেকেই বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, এই সকল লোকেরা গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, সুরাপান ও অন্যরূপ কুকার্য্যে রজনী যাপন করে; কেহ বলিল, দেশে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ ইহাদের জন্যই ঘটিতেছে। কিন্তু লোকে বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধে নানারূপ নিন্দাপবাদ রটনা করিলেও, নিমাইয়ের প্রতি সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যাইত। লোকে বলিত, নিমাই পণ্ডিত খুব ভাল লোক, কিন্তু মূর্খ লোক-দিগের দলে মিশিয়া, আপনার পাণ্ডিত্য হারাইতেছে ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে।

নবদ্বীপে চাপাল গোপাল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত; সে বৈষ্ণবদিগের চরিত্র,কলুষিত বলিয়া সকলের নিকট সপ্রমাণ করিবার জন্য, একদিন গভীর রজনীতে, শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীর বহির্দ্দেশে তান্ত্রিকদিগের পূজোপযোগী একটি জবাপুষ্প, কদলী, ও মদ্যভাণ্ডস্থাপন করিয়া রাখে। প্রাতঃকালে শ্রীবাস পণ্ডিত এ সকল দর্শন করিয়া প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া, কৌতূহল-চ্ছলে বলিলেন, "দেখ, আমরা রাত্রিতে সুরাপান প্রভৃতি কার্য্যে সময়

কাটাই।" শ্রীবাস পণ্ডিত সাধুলোক বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিত। এজন্য সকলেই মনে করিল যে, কোন দুষ্ট লোকের দ্বারা এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অল্পদিন পরেই চাঁপাল যে এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। প্রবাদ এই, দুষ্ট ব্রাহ্মণ নিরপরাধ বিষ্ণুভক্ত-দিগের চরিত্রকে লোক-চক্ষে হেয় করিবার জন্য, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে শ্রীবাসের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, এই কঠিন পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে।

গৌরসুন্দর একদিন "মুঞি সেই মুঞি সেই" এই ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভক্ত শ্রীবাস তখন গৃহে বসিয়া নৃসিংহ পূজায় রত ছিলেন। গৌর গৃহদ্বারে পুনঃপুনঃ পদাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "তুই কা'র পূজা করিতে-ছিস্, তুই যার পূজা করিতেছিস্ সে তোর দ্বারেতেই উপস্থিত রহিয়াছে।" শ্রীবাস গৌরের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া, পূজার আসন হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, বিশ্বম্ভর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী হইয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বীরাসনে উপবিষ্ট। শ্রীবাস নারায়ণের সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। গৌর শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওরে শ্রীবাস, তুই কি এতদিন আমাকে চিনিতে পারিস্ নাই, তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে, ও নাঢ়ার (অদ্বৈতাচার্য্যের) ব্যাকুলতা ও হুঙ্কার রবে আমি বৈকুণ্ঠধাম পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছি? তুই আমায় এখানে আনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছিস্। আর নাঢ়া, আমাকে পরি-ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে বসিয়া রহিল। তোদের আর কোন চিন্তা নাই, আমি সাধুদিগের উদ্ধার করিব ও পাষণ্ডীদিগের পাষণ্ডতা বিনাশ করিব।"

শ্রীবাস পরম ভক্ত, সাধু পুরুষ। আজ গৌরঅঙ্গে চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁহার বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া আসিবার কথা শ্রবণ করিয়া, তদীয় পদতলে প্রণত হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

স্তুতিবাদ সমাপ্ত হইলে, শ্রীবাস বিষ্ণুপূজার সমস্ত পুষ্প শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে উৎসর্গ করিলেন, আর তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরাও পূজোপহার লইয়া গৌরাঙ্গকে বন্দনা করিলেন। তৎপরে বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস! রাজার নৌকা আসিয়া তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে, এই কথা শুনিয়া তুমি না বড় ভীত হইয়াছ? যদি তোমায় বাঁধিয়া লইবার জন্য রাজ-আজ্ঞায় নৌকা প্রেরিত হয়, তাহা হইলে আমি অগ্রে সে নৌকায় গমন করিব, আমি রাজার নিকটে গিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার পারিষদবর্গকে হরিনাম দিয়া মুগ্ধ করিয়া ফেলিব। কেবল তাহাই নহে, অশ্ব, হস্তী, মৃগ, পক্ষী সকলকে হরিনাম শুনাইয়া, অশ্রুজলে সিক্ত করিব।"

গৌরচন্দ্র এই সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীবাসকে বলিলেন, "তোমার সম্মুখেই তাহার এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।" সে সময় চারি বৎসর বয়স্কা বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃতনয়া নারায়ণী তথায় দণ্ডায়মান ছিল। গৌর তাহাকে বলিলেন, "নারায়ণী, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদত।" তৎক্ষণাৎ নারায়ণী "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, আর সেই সরলা বালিকার দুই চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। শ্রীবাস ও অন্যান্য সকলে এ দৃশ্য দর্শন করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। এই চারি বৎসরের বালিকা নারায়ণী দেবীই ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের জননী হইয়াছিলেন।

আর একদিন বরাহাবতারের শ্লোক শ্রবণ করিয়া, গৌরের বরাহাবতার হইবার বাসনা জন্মিল। তিনি ছুটিয়া মুরারি গুপ্তের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মুরারি গুপ্ত দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। গৌর "শূকর শূকর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; এবং সম্মুখে জলপাত্র দেখিয়া, উহা দন্ত দ্বারা উত্তোলন করিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলেন, মুরারি গুপ্ত, সে-সময় গৌরকে প্রকৃতরূপে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিতে দর্শন করিয়াছিলেন।

গৌরের এ-সকল অলৌকিক কার্য্যের উপর আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। অতিরিক্ত ভাবুক ব্যক্তিদিগের হৃদয় অনেক সময় সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব লেখকেরা শ্রীচৈতন্যকে ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার অলৌকিক কার্য্যে বিশ্বাস করা কিছু আশ্চর্য্য নহে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গৌর-নিত্যানন্দ মিলন

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ রাঢ়দেশের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে, ১৭০৭শকে ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। যেদিন শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন, তাহার একদিবস পূর্ব্বেই নিত্যানন্দ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার পিতার নাম হাড়াই ওঝা, মাতা পদ্মাবতী। একচাকা গ্রামের অনতিদূরে মৌড়েশ্বর নামে এক দেবতা ছিলেন। হাড়াই ওঝা অতি নিষ্ঠার সহিত তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। নিত্যানন্দ দেখিতে সুশ্রী ছিলেন; এবং এই বালককে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত বলিয়া সকলেই ভালবাসিত। নিত্যানন্দ তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। হাড়াই এই সন্তানকে বড় স্নেহ করিতেন। তিনি যেখানে যাইতেন নিত্যানন্দ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেন। সন্তানকে তিলার্দ্ধ দেখিতে না পাইলে, তিনি যেন অস্থির হইয়া পড়িতেন। হাড়াই এই ননীর পুতলীসম বালককে, অনেক সময় বক্ষে লইয়া, তাহার গণ্ডে চুম্বন করিয়া, অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। নিত্যানন্দের বাল্য জীবনেই ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

হাড়াই ওঝা সুখ ও শান্তিতে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক ঘটনা উপস্থিত হইল। এক সন্ন্যাসী একচাকায় আগমন করিয়া, হাড়াই ওঝার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন, সরলচিত্ত হাড়াই সন্ন্যাসীকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে আপন বাড়ীতে স্থান দান করিলেন। আগন্তুক তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করিয়া, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের মধুর আলাপনে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। হাড়াই ওঝা ও সন্ন্যাসী উভয়েই ভক্তিপথের পথিক,—উভয়েই ধর্ম্মানুরাগী। হাড়াই ওঝার সঙ্গে, পরিব্রাজকের কৃষ্ণপ্রসঙ্গে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল। এই ভগবৎ-প্রসঙ্গে উভয়েই পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

সন্ন্যাসী ইতঃপূর্ব্বেই মনে একটা বাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনি হাড়াই ওঝার নিকট হইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা-স্বরূপ প্রার্থনা করিবেন। তাই তিনি হাড়াই ওঝাকে বলিলেন, "আমি নানা তীর্থে বিচরণ করি, কিন্তু আমার সঙ্গে কোন সাথী নাই; এই বালকটি পাইলে, আমি উহাকে নানা স্থান পরিদর্শন করাইব ও বিশেষ যত্নসহকারে উহাকে রক্ষা করিব। তুমি তোমার এই পুত্রটি আমাকে দাও।" অতিথির নিকট হইতে হাড়াই ওঝা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, নিতাই তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, তিনি সন্তানকে বিদায় দিয়া, কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; অথচ সন্ন্যাসীর প্রার্থনা পূর্ণ না করিলেও ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। তিনি সন্ন্যাসীকে বলিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার পত্নীর একটা মতামত গ্রহণেব আবশ্যক। এই বলিয়া তিনি পদ্মাবতীর নিকট যাইয়া, সন্ন্যাসীর প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। পদ্মাবতী ধর্ম্মপরায়ণা নারী; তিনি ভাবিলেন, সন্ন্যাসীর প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে, তাঁহার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইবে, এবং আমরাও ধর্ম্মে পতিত হইব। তিনি সেজন্য স্বামীকে

বলিলেন, "তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর।" হাড়াই ওঝা, পত্নীর নিকট হইতে কোন নিষেধ বাক্য শ্রবণ না করিয়া, সন্ন্যাসীর সমীপে আগমন করত নত মস্তকে তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

সন্ন্যাসী, বালক নিত্যানন্দের হস্ত ধারণ করিয়া, হাড়াই ওঝার বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এদিকে সন্তানকে সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করিয়া, হাড়াই ওঝা সংজ্ঞাহীন হইয়া, ধরাশায়ী হইলেন। তিনি সেই অবধি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ভগ্নহৃদয় হইয়া সংসারে বাস করিয়াছিলেন। পুত্রকে বিদায় দিয়া তিনি প্রায় তিন মাস কাল একপ্রকার অন্নজল গ্রহণ করেন নাই। এদিকে নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভারতের বহুবিধ দেশে ও নানা তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, মথুরাতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ সাধু সঙ্গে বিচরণ করিয়া, আপনার মনপ্রাণকে অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন; ভক্তিরসে তাঁহার চিত্ত সদাই পরিপ্লুত হইয়া থাকিত। বাল্যজীবন হইতে সংসারের সুখ ও আনন্দে জলাঞ্জলি দিয়া, পরম বৈরাগীর ন্যায় জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহার আহার ও পরিচ্ছদের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। তিনি কখন অনাহারে, কখন বা সামান্য কিছু আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন; তাও কেহ যখন স্বেচ্ছাক্রমে কিছু প্রদান করিত, তবেই তাহা গ্রহণ করিতেন, নতুবা অনশনেই দিন কাটাইয়া দিতেন। তিনি যখন মথুরাতে অবস্থিতি করেন, তখন ভগবৎ-প্রেমরসে সর্ব্বদাই বিভোর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার স্বভাব বালকের ন্যায় ছিল। তিনি বৃন্দাবনে বালকের ন্যায়, কখন ধূলাখেলা করিতেন, কখন ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেন; তাঁহার সুন্দর কোমল অঙ্গ সর্ব্বদা ধূলায় ধূসরিত হইয়া থাকিত। নিত্যানন্দ যখন মথুরায় এইরূপে দিনযাপন করিতেছেন, তখন নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-

দেব ভক্ত-সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন করিয়া, ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তিদিগের কঠোর প্রাণ দ্রবীভূত করিতেছিলেন।

এক ভক্তের হৃদয়তন্ত্রী ভগবানের প্রেমাঙ্গুলির আঘাতে বাজিয়া উঠিলে, অপর ভক্তের হৃদয়েও সে ঝঙ্কার প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিত্তকে বিমোহিত করিয়া তুলে। গৌর যখন নবদ্বীপে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভাবাবেশে কীর্ত্তন করিতেন, তখন তিনি নিত্যানন্দের অভাব বড়ই অনুভব করিতেন। নিত্যানন্দও বৃন্দাবনে থাকিয়া শুনিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে ভক্তসঙ্গে মধুর কীর্ত্তনে লোকের প্রাণ মুগ্ধ করিতেছেন; তাঁহার চিত্ত এই প্রেম-স্রোতে ভাসাইবার জন্য, ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি, প্রেম ভক্তি প্রচারের উৎসস্বরূপ নবদ্বীপে আগমন করিলেন, এবং নন্দন আচার্য্যের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

নন্দন আচার্য্য অবধূত নিত্যানন্দকে পাইয়া, যেন কোন স্বর্গের দেবতা লাভ করিলেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। নিতাই কৃষ্ণপ্রেমে কখন কাঁদিতেন, কখন হাসিতেন, কখন বা হুঙ্কার রবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। নিত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইল। অদ্বৈত-প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তেরা, একটা নবযুগের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। নিত্যানন্দের অদ্ভুত ভক্তিভাবের কথা তাঁহাদের কাহারও অবিদিত ছিল না; তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হইলে, নবদ্বীপে ভক্তি-নদী প্রবাহিত হইবে, সকলেরই মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

ভক্তচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে নিত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা প্রবেশ করিলে. আনন্দে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি পুলকিত অন্তরে তাঁহার সঙ্গীদিগের নিকট যাইয়া, এ-বিষয়ের একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আজ রাত্রিতে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, দেখি,

একখানি রথ আসিয়া আমার বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। এক ব্যক্তি তাহাতে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার শরীর প্রকাণ্ড, সৌম্যমূর্ত্তি, তিনি নীলবসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, কর্ণে কুণ্ডল ঝুলিতেছে। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী?' আমি তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কোন্ মহাপুরুষ?' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ভাই, কল্যই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হইবে।' তাঁহার কথা শুনিয়, আনন্দে আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গী-দিগকে গৌরসুন্দর-স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, এবং "মদ আন, মদ আন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

গৌরসুন্দর 'মদ মদ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে, শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন, "ভাই, তুমি যে সুরা চাহিতেছ, সে সুরা তোমারই নিকটে আছে, তুমি যাকে তাহা বিলাও, সেই তাহা পায়।"

"শ্রীবাস পণ্ডিত বোলে শুন হে গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি॥
তুমি যারে বিলাও, সেই তাহা পায়।"

কিছুক্ষণ পরে শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এস আমরা সকলে মিলিয়া নন্দন আচার্য্যের ভবনে নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই।" ভক্তগণ প্রভুর আদেশে "জয় কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে উল্লসিত হইয়া অবধূত, কৃষ্ণপ্রেমিক মহাভক্ত শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। নিত্যানন্দ যাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন, আজ সেই গৌরকে সম্মুখে দেখিয়া, তাঁহার কমনীয় দেবোপম মুখের দিকে অনিমিষ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে গৌর শ্রীবাসকে ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীবাস ইঙ্গিতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক একটি শ্লোক পাঠ করিবামাত্র, নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

গৌর, তাঁহার এই ভাবাবেশ দর্শন করিয়া, "আবার পড়, আবার পড়," বলিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ একটু চেতনা লাভ করিয়া, সিংহ-নাদে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; ভূমিতে পুনঃপুনঃ আছাড় খাইতে লাগিলেন; উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই উন্মত্তপ্রায় অবস্থা দর্শন করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবদিগের প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইল। অবশেষে করুণাময় গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের মধ্যে এই অপূর্ব্ব ভক্তিলীলার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সাধুভক্তদিগকে কিরূপে সম্মান করিতে হয়, গৌর নিজ জীবনে তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিত্যানন্দের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রেমে গদগদ হইয়া, নিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ তোমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তোমাকে ভজনা করিলে, জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে।"

তৎপর গৌর তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিনম্রভাবে বলিলেন, নানাদেশ পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কোথাও পাইলাম না; কত লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন শীতল করিব?' ক্রমে শুনিলাম, শ্রীকৃষ্ণ গৌরবেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তথায় হরি সংকীর্ত্তন হইতেছে। আমি পাতকী, তাই এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরিত্রাণ লাভের জন্য এখানে আসিলাম।

দুই ভক্তের হৃদয়ে প্রেম-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; উভয়ের হৃদয়ে প্রেম-তরঙ্গ উথলিত হইল। গৌর-নিতাইয়ের মিলনে, বঙ্গদেশে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। গঙ্গা-যমুনার মিলনের ন্যায়, ভারতভূমিতে প্রেমভক্তির নবস্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল।

নিত্যানন্দ সরল শিশুর ন্যায় বিচরণ করিতেন। যখন গঙ্গায় স্নান

করিতে যাইতেন, তখন আনন্দে জলে সন্তরণ দিতেন, কুম্ভীর দেখিলে, ধরিতে যাইতেন। একদিন গৌর প্রভৃতি স্নান করিতেছেন, এমন সময় গৌর বলিলেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! আজ যে ব্যাসপূজা। কোথায় ব্যাস-পূজা হইবে? নিত্যানন্দ শ্রীবাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই বামুনের বাড়ী।" বেদব্যাসের পূজার সব আয়োজন হইল। শ্রীবাস একছড়া বন-ফুলের মালা, সুগন্ধে লেপিয়া, নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া বলিলেন, "ব্যাসদেবের উদ্দেশ্যে পূজার স্থানে এই মালা অর্পণ কর।" নিত্যানন্দ মালা হস্তে করিয়া চারিদিক্ তাকাইয়া অবশেষে গৌরের গলে পরাইয়া দিলেন। বৈষ্ণব লেখকেরা, বলেন, সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের নিকট ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। নিত্যানন্দ সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গৌর তৎপরে তাঁহার গায়ে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। ব্যাসপূজা সমাপনান্তে গৌরসুন্দর সংকীর্ত্তন করিতে বলিলেন। ভক্তবৃন্দ মহোল্লাসে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে, নিত্যানন্দ ও গৌর হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শচীদেবী যখন দেখিলেন, তাঁহার পুত্র ও নিত্যানন্দ পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি নিতাইকে বিশ্বরূপের ন্যায় আপনার পুত্রজ্ঞানে স্নেহ প্রদর্শন করিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ লইয়া একদিন হরিগুণ কীর্ত্তনে আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় গৌর 'নাড়া কোথায় রহিল', বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভক্তেরা বুঝিয়াছিলেন, যে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। গৌর শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা, রামাই পণ্ডিতকে বলিলেন, "তুমি শান্তিপুরে যাইয়া নাড়াকে লইয়া এস।" রামাই গৌর-আজ্ঞা মস্তকে করিয়া তৎক্ষণাৎ শান্তিপুরে যাত্রা করিলেন এবং অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের আহ্বান জ্ঞাপন করিলেন, এবং তৎসঙ্গে নবদ্বীপ

ধামে ভক্তদলের মধ্যে হরিপ্রেমের কিরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাসও প্রদান করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার, অদ্বৈতাচার্য্যের মনে এ বিশ্বাস অনেক দিন হইতে স্থান পাইয়াছিল, এখন তাঁহার সে বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি রামাই পণ্ডিতের নিকট হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, একটু আমোদ করিয়া বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের আর ত কাজ নাই, তিনি নবদ্বীপে এসে অবতার হয়েছেন।" এইরূপ কিছু কথার পর তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি তদীয় পত্নী সীতাদেবীকে নবদ্বীপের সকল কথা বর্ণনা করিলেন। স্বামীর মুখে গৌরলীলার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পত্নীর চক্ষু হইতেও আনন্দধারা বহিতে লাগিল। অবশেষে এই আনন্দের মেলায় যোগদান করিবার জন্য, আচার্য্য সস্ত্রীক নবদ্বীপে আগমন করিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য যখন শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, নিমাই যদি যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের অবতার হন, তাহা হইলে, তিনি এমন কোন কার্য্য প্রদর্শন করিবেন, যাহাতে আমি প্রকৃত-রূপে তাঁহার অবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। আচার্য্য নবদ্বীপে আগমন করিয়া, গৌরাঙ্গের সভায় উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবা-চার্য্যেরা বলেন, গৌর তাঁহার মনে আপনার অবতারত্বের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য, বৃদ্ধের মস্তকোপরি আপনার পদদ্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের এখন সকল সংশয় দূর হইয়া গেল। যে জন্য তিনি কত সময় সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে অনশনে দিন যাপন করিয়াছিলেন, এখন শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাদর্শনে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল, তাঁহার মন-প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

অদ্বৈতাচার্য্যের আগমনে ভক্তদলের মধ্যে আরো আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের পরিচয় হইল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া ক্রমে জমাটভাবে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের "প্রেমনিধি"

গৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি "পুণ্ডরীক বাপ রে" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ভক্তগণ প্রভুর মুখ হইতে "পুণ্ডরীকে"র নাম শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীক কে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। শিষ্যেরা বুঝিলেন, প্রভুর মুখ হইতে যখন পুণ্ডরীকের নাম উচ্চারিত হইতেছে, তখন ইনি নিশ্চয়ই একজন ভক্ত হইবেন। তাঁহারা উৎসুক চিত্তে গৌরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, পুণ্ডরীক কে?" গৌর বলিলেন, "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম-নিবাসী; তিনি ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহাকে দেখিলে, ভক্ত বলিয়া মনে হয় না, একজন বিলাসী পুরুষ বলিয়াই বোধ হয়।" গৌর এই কথা বলিতে বলিতে, অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপর শিষ্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা প্রেমাকর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস; তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।"

"তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বাস্থ্য নাহি পাই।
সবে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ এথাই॥
কহি তাঁর কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
"পুণ্ডরীক বাপ" বলি কাঁদিতে লাগিলা॥" চৈঃ ভাগবত।

চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির ন্যায় প্রেমেরও আকর্ষণী শক্তি আছে। যে সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিদ্যানিধির দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সে সময় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মনও, শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন লালসায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তিনি চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। এখানে

তাঁহার বাড়ী ছিল। তিনি যখন আগমন করিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে অনেক দাসদাসী, ও বহুবিধ দ্রব্যসম্ভার আসিয়াছিল। এখানেও আগমন করিয়া তিনি রাজকুমারের ন্যায় নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন করিলে, মুকুন্দ দত্ত তাঁহার বন্ধু, মাধব মিশ্রের পুত্র পরম ভাগবত গদাধরকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যানিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। পুণ্ডরীক হিঙ্গুলবর্ণে রঞ্জিত পিত্তল খট্টাঙ্গে সুকোমল শয্যোপরি সুন্দর সুন্দর উপাধান পরিবেষ্টিত হইয়া, উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে আলবাটি ও সম্মুখে ডিপাভরা পাকা পান শোভা পাইতেছে। গৃহের চারিদিকে নানাপ্রকার শোভাকর বস্তুসকল সজ্জিত রহিয়াছে। মুকুন্দ দত্ত গদাধরকে লইয়া তাহার ভবনে উপস্থিত হইলে, পুণ্ডরীক মুকুন্দকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন, ইঁহার নাম গদাধর, ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, চিরকুমার ও পরম ভক্ত; ইনি আপনাকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন। বিদ্যানিধি, গদাধরের কথা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন।

গদাধর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বিলাসিতা দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, প্রভু ইঁহাকে ভক্ত বলেন, ইঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করেন, কিন্তু এ ব্যক্তিকে বিষয়ীর চূড়ান্ত ও বিলাসী বলিয়াই বোধ হইতেছে। মুকুন্দ দত্ত বন্ধুবরের মনের অবস্থা অবগত হইয়া, পুণ্ডরীকের প্রকৃত পরিচয় দিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি ভাগবতের ভক্তি-উদ্দীপক একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। মুকুন্দের রসনা হইতে মধুর ভাগবতের শ্লোক নিঃসৃত হইবামাত্র, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভাবাবেশে সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া, ঘন ঘন পদদ্বয় সঞ্চালন ও "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে

লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গ সঞ্চালনে গৃহের সুসজ্জিত দ্রব্যাদি স্থানচ্যুত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল; কোন কোন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া গেল। ভক্তিগ্রন্থের শ্লোক শ্রবণে তিনি এতই অধীর হইয়া পড়িলেন যে. তিনি আপনার সুন্দর পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন,—কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গৃহতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। অবশেষে বিদ্যানিধির বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল।

গদাধর যাহা ভাবিয়াছিলেন, পুণ্ডরীকের মধ্যে তদ্বিপরীত ভাব দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। যাঁহাকে তিনি ঘোর বিষয়ী, বিলাসী মনে করিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে অনাসক্তির অসি লম্বমান রহিয়াছে, আর কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমূল্য প্রেমরত্ন বিরাজ করিতেছে; সে রত্নের শুভ্র জ্যোতিতে তাঁহার অন্তর্জ্জগৎ আলোকিত; সে মহানিধি পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা তাঁহার আদরের বস্তু। গদাধর বুঝিলেন, পুণ্ডরীক বিষয়ী নন, কিন্তু অকপট কৃষ্ণ-প্রেমিক।

এমন প্রেমিককে দর্শন করিয়া গদাধর নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি মুকুন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, মুকুন্দ, তুমি আমার যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিলে, তুমি এমন ভক্তকে দেখাইয়া, আমার যথার্থ উপকার করিলে; এমন বৈষ্ণব আমি ত আর কখন দেখি নাই; এইরূপ ভক্ত দর্শনে জীবন পবিত্র হয়। গদাধর বন্ধুর নিকটে এ সকল কথা বলিয়া তিনি বিদ্যানিধির নিকট তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কথানুসারে মুকুন্দ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে গদাধরের দীক্ষার কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি "ভাল, ভাল," বলিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। মুকুন্দ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে সঙ্গে করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বেই গৌর তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক শ্রীগৌরাঙ্গের মোহনমূর্ত্তি

দর্শন মাত্র, ভাবের উচ্ছ্বাসে একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। প্রভুর ভক্তেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ইনিই যে সেই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাহা প্রথমে তাঁহারা বুঝিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ইঁহার ভাব দেখিয়া তাঁহারাও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুণ্ডরীকের দর্শন মাত্রই বুঝিলেন—যাঁহার দর্শন লাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ইনিই সেই বিদ্যানিধি। গৌর দণ্ডায়মান হইয়া, বাপ পুণ্ডরীক বলিয়া তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তদল তখন নবাগত ব্যক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন।

ভক্তদল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যেন চারিদিকে প্রেমের ঢেউ উঠিতে লাগিল। ভক্তদলের মাঝে, শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে বক্ষে জড়াইয়া বলিলেন, "ইঁহাব পদবী আজ হইতে "প্রেমনিধি" হইল।" প্রভুর রসনা হইতে বিদ্যানিধির নব উপাধি ব্যক্ত হইবামাত্র ভক্তবৃন্দ উর্দ্ধবাহু হইয়া আনন্দে 'হরি'ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

সকল হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ কিছু প্রশমিত হইলে, মুকুন্দ গৌরকে, প্রেমনিধির নিকট গদাধরের দীক্ষার বাসনার কথা জ্ঞাপন করিলেন। গৌর এ শুভ সংবাদে পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়া ত্বরায় এ কার্য্য সমাধা করিতে বলিলেন। পুণ্ডরীক প্রেমনিধি প্রসন্নমনে গদাধরকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

যাহার হৃদয়ে যথার্থ ভগবদ্ভক্তি জন্মিয়াছে, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার হৃদয় মুক্তভাবেই অবস্থিতি করে। ভারতের ঋষিরা বলিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তির মন পদ্মপত্রের জলের ন্যায়ই অবস্থিতি করে। সংসারের আবর্জ্জনা ও ক্লেদ তাঁহার হৃদয় মলিন করিতে সমর্থ হয় না। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ঐরূপ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ-প্রেমিক সংসারী লোকদিগকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই তাহা বুঝা যাইতেছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অভিষেক

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তসঙ্গে এখন সমস্ত রজনী কীর্ত্তনে যাপন করিবার মানসে সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "নিশাকাল কেবল নিদ্রাতে যাপন না করিয়া, এস আমরা সংকীর্ত্তনেই উহা ক্ষেপণ করি।" ভক্তদল কীর্ত্তনেই পরমানন্দ লাভ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনই সংকীর্ত্তনের প্রধান স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

শ্রীবাসের ভবনে মহোৎসাহে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। সমস্ত রজনী ভক্তেরা এমন প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যে, নবদ্বীপের অধিকাংশ লোক এই কীর্ত্তন শ্রবণ মানসে এখানে আগমন করিতে লাগিল। শ্রীবাসের গৃহের চতুর্দ্দিকে লোকে পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। বিশ্বম্ভর গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দর্শকবৃন্দের মধ্যে বহুলোক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করিত। সে সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে যেন নবদ্বীপের চারিদিক বিকম্পিত হইতে লাগিল।

কোন দেশে যখন কোন নূতন ঘটনার সূচনা হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধে বহুলোক দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যের এই সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধেও অনেক লোক উত্থিত হইয়াছিল। শ্রীবাসের ভবনে নিশা কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে আসিয়া, অনেকে নানারূপ অভিমত প্রকাশ করিত। কেহ

বলিত, লোকগুলা কেন বৃথা চীৎকার করে, পরমেশ্বর ত হৃদয়েই রহিয়াছেন,—কেহ বলিত, নিমাই পণ্ডিত ভাল লোক, এমন লোকটা বৈষ্ণবগুলোর সঙ্গে পড়িয়া খারাপ হইয়া গেল ;—কেহ বলিত, ইহাদের উদ্দেশ্য ভাল নহে, ইহারা সুরাপান ও কুকার্য্য করিয়া থাকে।

শ্রীগৌরাঙ্গ এখন প্রেমেতে বিভোর ; তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন ভগবান তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে সর্ব্বদা বিহার করিতেছেন ; সংসারে বাস করিয়া, কিরূপে ইহার অতীত স্থানে উঠিতে পারা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন, নবদ্বীপে সংসারী লোকদিগের নিকট তাহাই প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি হরিরস পানে, ও সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের রূপসাগরে সর্ব্বদাই নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। ভগবানে কিরূপে তন্ময় হইতে হয়, ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মারা জীবনে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

একদিন নবভানুর অভ্যুদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবাস ভবনে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার অনুগত শিষ্যেরাও এক একটি করিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন ; মধুর হরিকীর্ত্তনই তাঁহাদিগের জীবনের অন্নপান স্বরূপ। সকলে মিলিত হইলে, গৌর কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে বলিলেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

কিছুক্ষণ পরে গৌর বিষ্ণু খট্টায় উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"আমাকে অভিষেক কর!" এই বাক্য শ্রবণ মাত্র শিষ্যবৃন্দ তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিলেন। একশত আট কলস গঙ্গাজল উত্তম বস্ত্রে ছেঁকিয়া, কর্পূরে সুবাসিত করতঃ, তাঁহার মস্তকে ঢালিলেন। ধূপ ধূনা, পুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণের দ্বারা, তাঁহারা তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারিত হইল ও মুকুন্দাদি সুগায়কেরা মধুর স্বরে সংগীত করিতে লাগিলেন। অভিষেক কার্য্য সমাধা হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গ হাত পাতিয়া বলিলেন, "আমাকে কিছু খাইতে দাও।" এই বাক্য তাঁহার রসনা হইতে বাহির হইবামাত্র, ভক্তেরা কেহ দুগ্ধ, কেহ ক্ষীর, কেহ দধি,

কেহ নারিকেল প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। আহারান্তে তিনি কীর্ত্তন করিতে বলিলেন, ভক্তেরা প্রেমোন্মত্তার সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল হইতে পরদিবস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে শ্রীবাস-ভবনে উৎসব চলিয়াছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণু খট্টায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তিনি এক নূতন ভাব ধারণ করিলেন। এ ভাবকে ভগবান-ভাব বলা যাইতে পারে;. তিনি যেন সে-সময় সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব লেখকেরা বলেন, ভক্তগণ সে-সময় তাঁহাদের প্রভুর মুখমণ্ডলে, এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। গৌর এইরূপ ভাবাবেশে, কাহারও জীবনের কোন কোন অতীত ঘটনা বলিতে লাগিলেন; কাহাকেও বরদান করিলেন। শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস! তোমার কি মনে পড়ে, একদিন দেবানন্দের নিকট ভাগবত পড়িতে পড়িতে, তুমি ভাবরসে পূর্ণ হইয়া কাঁদিতে লাগিলে? দেবানন্দ তোমার ক্রন্দনের ধ্বনি সহ্য করিতে না পারিয়া, তোমাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল। তুমি তবুও ভাগবতের সেই মধুর শ্লোক শ্রবণার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিলে। সে-সময় তুমি হৃদয়ে যে ভগবৎ-প্রেমের আনন্দ অনুভব করিয়াছিলে, কেন জান? আমি সে-সময়ে তোমার প্রাণে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম; আমিই তোমাকে সে-রসের রসিক করিয়া কাঁদাইয়াছিলাম।" সরল ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীবাস এই কথা শ্রবণ করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

এই মহাপ্রকাশের সময় খোলা-বেচা শ্রীধরকে তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি শ্রীধরকে বড় ভালবাসিতেন। বাজারে যাইয়া কত সময় তাহার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতেন। শ্রীধর ভক্ত, এজন্য, গৌর বলিলেন, "শ্রীধরকে ডাকিয়া আন, সে আমার এ বেশ দর্শন করুক।" আজ্ঞা পাইবামাত্র, ভক্তেরা ব্যস্ত হইয়া, তাহাকে ডাকিবার জন্য গমন করিলেন।

তাহার পর্ণকুটীরে ভক্তেরা গিয়া প্রভুর আহ্বান জ্ঞাপন করিলে, শ্রীধর আনন্দে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সভায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীধরকে দেখিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "শ্রীধর, তুমি আমার অনেক আরাধনা করিয়াছ। আমি তোমার খোলায় অন্ন ভক্ষণ করি।" এইরূপে তিনি শ্রীধরের অনেক গুণের কথা উল্লেখ করিলে শ্রীধর অতি লজ্জিত হইয়া বলিল, "প্রভু! আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমি তোমার কুকুর সদৃশ।" বৈষ্ণবগ্রন্থানুসারে গৌর সে-সময় শ্রীধরের সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধারণ করেন, শ্রীধর সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভক্তবৎসল গৌর তখন ভক্তের হস্ত ধারণ করিয়া ভূতল হইতে উত্থিত করিয়া বলিলেন, "আমার স্তব কর।" শ্রীধর বলিল, "আমি অজ্ঞ, তোমার স্তব করি, আমার এমন ক্ষমতা নাই।" গৌর তখন বলিলেন, "তোমার এই বাক্যই আমার স্তুতি।" তৎপর শ্রীধরের জিহ্বাগ্রে যেন সরস্বতী দেবী অবতীর্ণা হইলেন। সে তখন অতি মধুর ভাষায় অনর্গলভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের স্তুতি করিতে লাগিল। সভাস্থ সকলে এই নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ হইতে সে লালিত্যপূর্ণ ভাষা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। বন্দনা শেষ হইলে, গৌর বলিলেন, "শ্রীধর, তুমি কিছু বর প্রার্থনা কর।" শ্রীধর বলিল, "যে ব্রাহ্মণ বাজারে আমার নিকট হইতে খোলা পাত লইতেন, যাঁর সঙ্গে আমি কথা কাটাকাটি করিতাম, তিনিই যেন জন্ম জন্মান্তরে আমার প্রভু হইয়া থাকেন।"—তাই চৈতন্যভাগবতে,

"মাগ মাগ" পুনঃ বোলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বোলয়ে "প্রভু! দেহ এই বর॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেক মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউ তান চরণ যুগল॥"

গৌর বলিলেন, "শ্রীধর, আমি তোমাকে এক রাজ্যের রাজা করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।" প্রভুর কথার উত্তরে, অনুগত ভক্ত বলিল, "প্রভো! আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না, আমি যেন চিরদিন তোমার নাম গাইয়া জীবন কাটাইতে পারি।"

শ্রীধরের সহিত কথোপকথনের পর, শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারিগুপ্তের নিকট রামরূপে প্রকাশিত হন। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলেন, মুরারি দেখিলেন, বিশ্বম্ভর নবদূর্ব্বাদল শ্যামরূপে বীরাসনে ধনুর্ব্বাণ লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন; বামেতে জানকী ও দক্ষিণে লক্ষ্মণ শোভা পাইতেছে। বানরগণ সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে বসিয়া স্তুতি করিতেছে। এই দৃশ্য দর্শনে গৌরের বাল্য-সহচর মুরারি গুপ্ত ভাবাবেশে গৌরের সভামধ্যে নিপতিত হইলেন। বিশ্বম্ভর তৎপর মুরারির হস্তধারণ পূর্ব্বক "উঠ! উঠ মুরারি," বলিয়া ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "মুরারি কিছু বর প্রার্থনা কর।" মুরারি বলিলেন, "প্রভু! আর কোন বর প্রার্থনা করি না, যেন চিরদিন তব গুণানুকীর্ত্তনে জীবন কাটাইতে পারি; আর জন্ম-জন্মান্তরে যেন প্রভু তোমারই দাস হইয়া থাকিতে পারি।" গৌর, মুরারি গুপ্তের এই প্রার্থনায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, বলিয়া বরদান করিলেন। মুরারি গুপ্ত বরপ্রাপ্ত হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহ হরিধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ভক্ত হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের বড় প্রিয় ছিলেন। এখন তিনি এই ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন, "হরিদাস! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, তোমার যে জাতি, আমারও সেই জাতি। শুন, হরিদাস, যখন যবনেরা তোমার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করে, তখন আমার মনে হইয়াছিল, আমি বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া চক্রের দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিব, কিন্তু তুমি যখন এত নির্য্যাতনের মধ্যেও অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে অন্তরে তাহাদেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলে, তখন আমি তাহাদের বধসাধনের সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলাম, এবং অসহনীয় প্রহারের মধ্যেও তোমাকে

রক্ষা করিলাম।" হরিদাস, প্রভুর এই সকল মধুর বাক্য শ্রবণে অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন। গৌর বলিলেন, "তুমি আমার নিকট কিছু বর প্রার্থনা কর।" হরিদাস বলিলেন, "বাপ বিশ্বম্ভর! আমি নির্গুণ সকল জাতির অধম, আমাকে স্পর্শ করিয়া লোকে স্নান করিয়া শুচি হয়, আমি তোমার মহিমার কথা কিরূপে ব্যাখ্যা করিব, আমাকে কৃপা করিয়া এই বর দাও, আমি যেন ভক্তদের দাস হইয়া তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট অন্নে এ জীবন ধারণ করিতে পারি।"

গৌরসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "হরিদাস, তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, তোমার সঙ্গে মানুষ তিলার্দ্ধকাল বাস করিলে, সেও সাধুত্ব লাভ করে। আমি তোমার শরীরে সতত বিরাজিত। যে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, সে ব্যক্তি আমাকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।"

"প্রভু বোলে, শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেকো তোমা সঙ্গে কৈল যেই বাস॥
তিলার্দ্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাইব, নাহিক অন্যথা॥
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর আছি আমি তোমার শরীরে॥"

—চৈঃ ভাগবত

শ্রীগৌরাঙ্গ যবন হরিদাসের ভগবদ্ভক্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কি উচ্চ আসনেই আসীন করিয়াছিলেন! কুল মান অপেক্ষা সাধুতা ও ঐকান্তিক ঈশ্বর-প্রেম যে সর্ব্বোপরি, শ্রীচৈতন্যদেব এই বঙ্গদেশে তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সৎকুলোদ্ভব পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-তনয় বিশ্বম্ভর, নিরক্ষর ও সমাজের হীন জাতিদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, যে-ভাবে প্রেমের ও ভক্তির জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হৃদয়পটে অঙ্কিত করিলে, মনে হয়, সাম্য ও প্রেমরাজ্যের ছবি তিনিই আমাদের

সম্মুখে অতি উজ্জ্বলভাবে ধরিয়া গিয়াছেন। মুসলমান-কুলোদ্ভব হরিদাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইয়া ও তাঁহাকে ভক্ত পরিবারের মধ্যে স্থান দান করিয়া, শ্রীচৈতন্যদেব কি উদারতা, কি অমায়িকতা ও ভক্তিমার্গের কি মহৎ দৃষ্টান্তেরই পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন!

ভক্ত কবি ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার শ্রেষ্ঠতম লেখক বৃন্দাবন দাস মহাশয়, যবন হরিদাসের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুরক্তি দর্শন করিয়া, বলিয়াছেন ;—

"জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম—সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবে মরে॥"

যেন কোন স্বর্গের দেবতার ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া রহিয়াছেন। নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধরিয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ চামর ব্যজন করিতেছেন। তাঁহার পদতলে স্তূপীকৃত। পুষ্পরাশি পড়িয়া রহিয়াছে; গলদেশে পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে ; এবং প্রশস্ত ললাট ও বক্ষ চন্দনে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। আর ধূপ ধূনার সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইতেছে। দেখিলে মনে হয়, এ শ্রীবাসের গৃহ নহে, এ যেন একটি দেবলোক। শ্রীগৌরাঙ্গ, এক অপার্থিব ভাবে এখন অনুপ্রাণিত। গৌর অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন, "আচার্য্য, তুমি একদিন গীতার একটি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, অনশনে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলে ; আমি তোমার দুঃখে ব্যথিত হইয়া স্বপ্নে তোমার নিকট প্রকাশিত হইলাম, এবং

শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া, তোমাকে শয্যাত্যাগ করিতে ও আহার করিতে বলিলাম। আমি যখন অবতার-রূপ ধারণ করি নাই, তখন তুমি আমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে আনিবার জন্য কত প্রার্থনা করিয়াছ, এবং সময়ে সময়ে কাতর প্রাণে, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অনাহারে দিন কাটাইয়াছ। তোমার প্রার্থনাতেই আমি বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া, এখানে অবতীর্ণ হইয়াছি।" শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ হইতে অদ্বৈত নিজ জীবনের এ-সকল গূঢ় কথা শ্রবণ করিয়া, কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন, আর বিনীতভাবে বলিলেন, "তুমি আমার জীবনের প্রভু, এই আমার পরম সৌভাগ্য।"

এই মহানন্দের দিনে বিশ্বম্ভর যখন কাহারো মনের কথা বলিতেছেন, কাহাকেও বরদান করিতেছেন, তখন মুকুন্দ সভাগৃহের অপর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। শ্রীবাস দেখিলেন, প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছেন না, তখন তিনি গৌরাঙ্গকে বলিলেন, "প্রভো, মুকুন্দ কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সম্বন্ধে তুমি কোনকথাই বলিতেছ না? মুকুন্দ সুগায়ক, মধুর সঙ্গীতে সে তোমার চিত্ত কত সময় মুগ্ধ করিয়াছে।" গৌর বলিলেন, "মুকুন্দের প্রধান দোষ এই, মুকুন্দ যখন যেখানে থাকে, তখন সেই ভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। যখন অদ্বৈতের সভায় থাকে, তখন ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করে, আবার যখন অন্য সভায় যায়, তখন তাহাদের মতানুসারেই আপনার মত প্রকাশ করে, এইজন্য সে আমার দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকিবে।"

মুকুন্দ পার্শ্বের গৃহে বসিয়া যখন শুনিলেন যে, তিনি প্রভুর দর্শন লাভে বঞ্চিত থাকিবেন, তখন বাহিরে আসিয়া অজস্রধারে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীবাসকে বলিলেন, "যদি প্রভুর দর্শন না পাইলাম, তাহা হইলে এ জীবন ধারণে লাভ কি?" শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দের হৃদয়ের এই কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সে আমার দর্শন পাবে, তবে কোটী জন্ম পরে।" মুকুন্দ যখন শুনিলেন যে, কোটী জন্ম পরে প্রভু তাঁহাকে দর্শন দিবেন,

তখন তিনি আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "তবে আমি কোটী জন্ম পরে প্রভুর দর্শন পাব।" তাই বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন,—

"প্রভু বোলে, 'আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয় ॥'
শুনিল 'নিশ্চয় প্রাপ্তি' প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ নিশ্চিত হইলা পরমানন্দ সুখে ॥
'পাইব পাইব' বলি করে মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য ॥"

মুকুন্দ দত্তের গৌরের প্রতি কি অচলা বিশ্বাসই ছিল। ভাবিলেও প্রাণ আনন্দে পুলকিত হয়। কোটী জন্ম পরে মুকুন্দ প্রভুর দর্শন লাভ করিবেন, এই আশাতে "পাইব, পাইব" বলিয়া, আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিকেরা এইরূপ আশা ও বিশ্বাসেই হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

এখন গৌরের এই মহাপ্রকাশ সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। তিনি যখন শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলেন, তখন তিনি এক নূতন ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব লেখকেরা এইরূপ তাঁহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মানুষ যখন সংসারের স্বার্থপরতা, নীচতা ও প্রবৃত্তির শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া ভগবৎ-প্রেমের উচ্চতর শিখরে আধিরোহণ করে, তখন তাহার বাহ্য আকারের মধ্যেও এক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। অন্তরের ভাবই মুখ প্রকাশ করিয়া থাকে। গৌর মহা ভক্ত। তাঁহার হৃদয়ের নির্ম্মল, অপার্থিব. ভগবজ্জ্যোতি যে তাঁহার মুখমণ্ডলকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা আর বিচিত্র কি? জগতের প্রধানতম ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মসংস্কারকদিগের বদনমণ্ডলে এই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াই,

সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে নরলোকের অতীত বলিয়াই মনে করিয়াছে।

শ্রীবাসের বাটীতে চৈতন্যদেব সেদিন মুরারি গুপ্তের নিকট রামরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, চৈতন্য ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই। ভক্তেরা আপনাদিগের গুরুকে উপাস্য দেবতারূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা কোন অতীত অবতারের প্রকাশরূপেই তাঁহাকে মনে করিয়া থাকেন। মুরারি গুপ্ত রামাবতাররূপে সেদিন গৌরকে দর্শন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, অযোধ্যার অধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার ভক্তিবশতই এইরূপ হইয়া থাকিবে। গৌর সেদিন শ্রীবাসের ও অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনের কিছু কিছু অতীত কাহিনী উল্লেখ করিয়াছিলেন। এ-সকল কিছুই আশ্চর্য্য নহে। আমাদের চিত্ত যখন নির্ম্মল ও প্রশান্ত হয়, তখন দৃষ্টি খুলিয়া যায়। অনেক সময় অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল তিনি যেন নখদর্পণের ন্যায় দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। জগতের পরমাত্মা যিনি, যাঁহার নিকট ভূত-ভবিষ্যৎ সকলই সমান, তাঁহার অনুগত ভক্তেরা যে কিয়ৎ পরিমাণে সেই মহাশক্তির প্রভাবে মানবের অতীত ও ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী দর্শনে সমর্থ হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

জগাই মাধাই উদ্ধার

গৌরের সংকীর্ত্তনের প্রভাবে নবদ্বীপের বহু সংখ্যক লোক তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার দল ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গৌর

সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই হরিনাম বিতরণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট উচ্চ বর্ণের লোকেরা অন্যান্য জাতিকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সেই সকল নিম্নবর্ণের লোকেরা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের দলভুক্ত হইয়া যেন মুক্ত বায়ুর মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। নবদ্বীপে নবদ্বীপচন্দ্রের দল এই ঘোষণা করিলেন "হরিভক্তই ব্রাহ্মণ", এই জন্যই যবন হরিদাস গৌরাঙ্গের দলে অনেকের প্রণম্য হইয়াছিলেন। গৌরের উদার ধর্ম্মমত জাতিভেদের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলিল, উহার কঠিন বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

ধর্ম্মপ্রচারের বিশিষ্ট লোকেরও আবশ্যক। গৌর ইহা বেশ প্রতীতি করিয়াছিলেন। এমন মধুর হরিনাম, ইহা লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা না করিলে, জীবের কিরূপে পরিত্রাণ হইবে, লোকের সংসার-জ্বালা কিরূপে নিবারিত হইবে, এই সকল চিন্তা করিয়া, তিনি একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করিবে; এবং সমস্ত দিবসের পর সায়াহ্নে আমার নিকট আসিয়া তদ্বৃত্তান্ত অবগত করিবে।" তাঁহারা অবনত মস্তকে গৌরাঙ্গের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য নবদ্বীপে লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের রসনা হইতে সদাই এই কথা উচ্চারিত হইতে লাগিল—ভাই কৃষ্ণনাম কর, ও তাঁহার মধুর তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া মানব-জীবন ধন্য কর।

সমাজের মধ্যে যখন ধর্ম্মের কোন নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সেই ধর্ম্মের প্রচারকেরা দেশের লোকের নিকট হইতে অনেক স্থলে সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হন না। অবধূত নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর যখন নবদ্বীপস্থ লোকদিগকে হরি-প্রেমে অনুরাগী করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন, তখন তাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর হরিকথা শ্রবণে কেহ বা পরম সন্তোষ লাভ করিত, আর কেহ বা তাঁহাদের কার্য্যের উপর

সন্তুষ্ট না হইয়া বলিত, তোমরা পাগল হইয়াছ, সেজন্য আমাদিগকেও পাগল করিতে চাও না কি ?

অনেকেই বলিতে লাগিল, নিমাই পণ্ডিত নিজেও ক্ষেপিয়াছে, আর এই লোকগুলোকেও পাগল করিয়া তুলিল। যাহার যাহা মনে আসিত সে তাহাই বলিত, কেহ কেহ বলিতে লাগিল, এরা অপরের দ্রব্য চুরি করিবার মানসে এইরূপে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায় ; এদের দুই জনকে ধরে দেশের শাসনকর্ত্তাদের হাতে দেওয়া উচিত। কেহ কেহ তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতি এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহাদিগের বাড়ীতে গমন করিলে, "মার মার" বলিয়া, আপনাদিগের ভবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিত।

গৌরের নিরীহ শিষ্যদ্বয়, এইরূপে নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া, নরনারীকে ভক্তির পথে আনিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন ; আর তৎপরিবর্ত্তে লোকের গ্লানি ও অত্যাচার মস্তকে বহন করিয়া, দিনমণি অস্তাচলগামী হইলে, শচীদেবীর ভবনে আগমন করিয়া, তাঁহাদের প্রভু গৌরসুন্দরের নিকট দিবসের সকল ঘটনা বর্ণনা করিতেন।

নবদ্বীপে কোন ব্রাহ্মণবংশে কুলাঙ্গার স্বরূপ দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের নাম জগাই ও মাধাই। ইহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের নিকট নদীয়াবাসী মস্তক অবনত করিয়া থাকিত। ইহারা নরনারীর উপর নিষ্ঠুর ও অমানুষিক ব্যবহার করিলেও কেহ ইহাদিগকে শাসনার্থ অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। ইহারা অর্থবলে রাজকর্ম্মচারীদিগকেও বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সহজেই, রাজদণ্ডের হস্ত হইতেও ইহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহারা যেন নৃশংস অত্যাচারী রাজার ন্যায়ই নবদ্বীপে বাস করিত। ইহারা মনুষ্যবিগর্হিত সকল প্রকার কদর্য্য অনুষ্ঠানেই আপনাদিগকে লিপ্ত করিয়াছিল ; সুরাপান, পরস্ত্রীহরণ, লোকের প্রতি অত্যাচার তাহাদিগের যেন জীবনের ব্রতস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই দুরন্ত দুই ভ্রাতার অমানুষিক ব্যবহারে গ্রামের লোকদিগের অনেক সময়, শান্তিতে বাস করা কঠিন হইয়া পড়িত। ইহারা সুরাপানে বিভোর হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়া থাকিত; কখন মাদকের নেশায় উন্মত্তের ন্যায়, দুই ভ্রাতায় পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিত; কখন এই মত্ততার অবস্থায় পথের লোকদিগকে পশুর ন্যায় আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিত। ইহাদিগের দুরন্ত ব্যবহারের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল।

একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস আপনাদিগের ব্রত পালন করিবার জন্য পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, পথে দুইজন ব্যক্তি সুরাপানে অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। নিত্যানন্দ পথিকদিগের নিকট ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই ইহাদের চরিত্রের বিষয় তাঁহাকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করিল। সকলেই যেন একবাক্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয়ে এই কথা প্রকাশ করিল, যে, সকল প্রকার পাপকার্য্যই ইহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রচারকদ্বয় সকলই শ্রবণ করিলেন। কিন্তু প্রেমার্দ্র-হৃদয় নিত্যানন্দ জগাই মাধাইয়ের কল্যাণের জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি যে পরিত্রাণপ্রদ নাম লোককে দিবার জন্য বাহির হইয়াছেন, সে নামে জগাই মাধাই কি পরিত্রাণ লাভ করিবে না? নিত্যানন্দের প্রাণে এই চিন্তা উদিত হইল; তিনি দেখিলেন, হরিনামে সকলই সম্ভব। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের প্রভুর আদেশ, সকলেরই নিকট গমন করিয়া হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে হইবে। এই সকল কারণে তিনি আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না।

অবশেষে নিত্যানন্দ ও হরিদাস উভয়ে এই পশুসম, সুরাপানোন্মত্ত ভূতলশায়ী জগাই মাধাইয়ের নিকট গমন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই

তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনেকেই নিষেধ করিয়াছিল; ও তাহাদিগের নিকট গমন করিলে হয়ত, কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে, এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু হরিনামোন্মত্ত ভক্তদ্বয়, জগাই মাধাইকে হরিনামের সুরা পান করাইবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে তাহাদের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ নাম বল, তাঁহাকে স্মরণ কর; তাঁহাকেই ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর; কারণ সেই কৃষ্ণই আমাদের পিতা মাতা, প্রাণ মন ধন সকলই।"

"তথাপিহ দুই জন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
নিকটে চলিলা, দোঁহে মহা-কুতূহলী॥
শুনিবারে পায় হেন নিকটে থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥" চৈঃ ভাগবত।

জগাই মাধাইয়ের কর্ণে কৃষ্ণ-ভজনের কথা প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সন্ন্যাসিদ্বয়কে দর্শনে ভূমি হইতে উত্থিত হইল। ক্রোধে তাহাদের দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং "মার মার" শব্দে তাঁহাদিগকে ধরিতে উদ্যত হইল। তাহাদের তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত হইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভয়ে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। জগাই মাধাইও তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল, আমাদের কথা না শুনিয়া সন্ন্যাসীরা আপনাদের এ বিপদ ঘটাইল। এদিকে তাঁহারাও ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে দুরন্তদিগের হস্ত এড়াইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়া পরস্পর কোলাকুলি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত। নিত্যানন্দ ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট জগাই মাধাইয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। দুষ্ট দুই ভাই তাঁহাদের

আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল শুনিয়া তিনি ক্রোধ প্রকাশ করাতে, নিত্যানন্দ বলিলেন, "প্রভো! যদি এই পাতকীরা হরিনামে উদ্ধার হয় তাহা হইলে বুঝিব, তোমার নাম 'পাতকী-পাবন।'" তখন বিশ্বম্ভর মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "যাহাদের জন্য তুমি এত চিন্তা করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ অচিরাৎ তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।" শ্রীগৌরাঙ্গের প্রমুখাৎ আশাপ্রদ এই মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া, সমবেত ভক্তমণ্ডলী হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

দুরন্ত দুই ভ্রাতা জগাই মাধাইকে, পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা করাই নিত্যানন্দের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। তিনি একদিন নবদ্বীপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, নিশাকালে গৃহাভিমুখে যাইবার সময় জগাই মাধাইয়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহারা তাঁহার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া, "কেরে কেরে," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নিত্যানন্দ বলিলেন, "অবধূত নিত্যানন্দ।" এই কথা শ্রবণ মাত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে জগাই এক ভাঙ্গা কলসীর কানা লইয়া, সজোরে তাঁহাকে আঘাত করিল। উহা নিত্যানন্দের ললাটে লাগিয়া, দরদরিতধারে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিনা কারণে মাধাই সন্ন্যাসীকে প্রহার করিল দেখিয়া, জগাই কিছু মর্ম্মাহত হইল, এবং ভ্রাতাকে বলিল, "বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়া তুমি বড় নিষ্ঠুরের কাজ করিলে! সন্ন্যাসীকে মারিয়া তোমার কি লাভ হইল?" সহিষ্ণুতার অবতার নিত্যানন্দ রুধিরপ্লাবিত অঙ্গে স্থিরচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া সেই পতিতপাবন দয়াময় হরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ঘটনার স্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়ভক্ত নিত্যানন্দের মস্তক হইতে রক্ত নির্গত হইয়া তাঁহার সমস্ত অঙ্গকে সিক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। গৌর আঘাতকারীকে বিনাশ করিবার জন্য "চক্র

চক্র” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর ক্রোধ দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলিলেন,—“প্রভো! তুমি যদি সুদর্শন চক্রের দ্বারা ইহাদিগকে বিনাশ কর তাহা হইলে তোমার নামে কলঙ্ক হইবে। হরিনামে যে মহাপাতকী তরে, তুমি আজ তাহাই দেখাইয়া, তোমার পতিতপাবন নামের কীর্ত্তি রক্ষা কর।” তাই শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে লোচনদাস বলিতেছেন ঃ—

“সুদর্শন দেখি নিত্যানন্দ প্রভু হাসে।
কি করিল ভগবান্ ঐশর্য্য প্রকাশে ॥
করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন।
দীনহীন পতিত পামর দুষ্ট জন ॥
জগাই মাধাই তরি’ দীনবন্ধু হব।
পতিতপাবন নামের গরিমা রাখিব ॥
ইহা বলি নিত্যানন্দ চরণে ধরিয়া।
কহিলেন প্রভু-পদে বিনয় করিয়া ॥
এ দুই পতিত প্রভু মোরে কর দান।
পতিতপাবন-নাম থাকুক ব্যাখ্যান ॥”

তৎপর নিত্যানন্দ গৌরকে বলিলেন, “প্রভু! জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে, নতুবা মাধাই আমাকে আরো মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল।” তখন গৌর জগাইকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জগাই গৌরের প্রেমালিঙ্গনে যেন নবজীবন লাভ করিল। দুই ভ্রাতার হৃদয় মনের অবস্থা প্রায় এক প্রকারেরই ছিল। একজনের পরিবর্ত্তনে অপরের হৃদয়ের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মাধাই নিজকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া নিত্যানন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। নিত্যানন্দ মাধাইকে আপনার দুই বাহুদ্বারা জড়াইয়া ধরিলেন। নিমেষের মধ্যে ভগবান যেন উভয়ের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দুই

ভ্রাতার অনুতাপ দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আর তোমরা পাপ কার্য্যে জীবন কলুষিত করিও না।"

ভক্তচূড়ামণি গৌর তৎপরে দুই ভ্রাতাকে আপন ভবনে লইয়া যাইতে বলিলেন। জগাই মাধাই তথায় উপস্থিত হইলে, কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তদিগের মুখনিঃসৃত হরিনামের ধ্বনিতে দুই ভ্রাতার কর্ণকুহরে যেন সুধা বর্ষিত হইতে লাগিল; হরিনামের সুধারসে তাহাদের প্রাণ যেন শীতল হইয়া গেল, ভাবের আবেগে তাহাদের শরীর কাঁপিতে লাগিল; চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল; তাহারা মধুর হরিনাম রসনায় উচ্চারণ করিতে করিতে ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া গৌরসুন্দর বলিলেন, ইহারা অদ্য হইতে আমার সেবক হইল। তিনি তৎপর ভূলুণ্ঠিত দুই ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া উত্তোলন করিলেন। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল বৈষ্ণবের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া, তাঁহাদিগের পদরেণু গ্রহণ করিতে লাগিল। তাঁহারাও তাহা-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাহারা হিংস্রজন্তুসম হইয়া পথে বিচরণ করিতেছিল, ক্ষণকালের মধ্যে তাহাদিগের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের অনুগত শিষ্য হইয়া, আজীবন হরিগুণ কীর্ত্তনে রসনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং দীনতা, শ্রদ্ধা, প্রেম ও বৈরাগ্যের পথ অনুসরণ করিয়া, জীবনকে অনুপম ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

জগাই মাধাই তৎপর প্রাতে জাহ্নবীর জলে অবগাহন করিয়া, নিভৃতে বসিয়া হরিনাম জপে সময় অতিবাহিত করিতেন। আর পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতাপাশ্রুতে তাঁহাদের চক্ষু ভাসিয়া যাইত। যাহারা, নবদ্বীপে মহাপাপী বলিয়া বিদিত ছিল, আজ তাহারা পরমভক্ত বলিয়া অভিহিত হইল। ইহাদের উদ্ধারে শত শত লোক ভগবৎ-কৃপার অদ্ভুত শক্তি বুঝিতে সমর্থ হইল। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত হরিগুণ কীর্ত্তনে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে

বহুলোক যোগদান করিয়া, তাঁহার দলের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস তাই বলিতেছেন ঃ—

"জগাই মাধাই দুই চৈতন্য কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিকরূপে বৈসে নদীয়ায় ॥
উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে ॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
*　　　*　　　*
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
স্মঙরি চৈতন্য-কৃপা দুইজনে কান্দে ॥"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নাট্যাভিনয়

মহাপুরুষেরা নরনারীর শিক্ষার্থ নানারূপ লীলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কোন বিষয় লোকের চিত্তে বিশেষরূপে চিত্রিত করিতে হইলে, নাটকাভিনয়ের দ্বারা সে কার্য্য অনেক স্থলে সুন্দররূপে সংসাধিত হইয়া থাকে ; শ্রীগৌরাঙ্গ এই নাটকাভিনয়ের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি একদিন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বলিয়া উঠিলেন, "আজ সন্ধ্যার সময় নৃত্য, কীর্ত্তন ও নাটকাভিনয় করিতে হইবে।" গৌরের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, শিষ্যবৃন্দের মধ্যে যেন এক আনন্দের তরঙ্গ

উত্থিত হইল। গৌর বলিলেন, "আমি রুক্মিণী ও আগ্যাশক্তি সাজিব ও নিত্যানন্দ আমার বড়াই হইবেন। গদাধর গোপিকা ও ব্রহ্মানন্দ সুপ্রভা নামে তাঁহার সখী সাজিবেন।" প্রভুর এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু আমি কি সাজিব?" গৌর বলিলেন, "তুমি কোটাল সাজিবে।"

শ্রীবাস। প্রভু, আমি কি সাজিব?

গৌর বলিলেন,—তুমি দেবর্ষি নারদ সাজিবে।

যখন সকলের সাজের কথা হইল, তখন বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, "আমার প্রতি কোন আজ্ঞা. হইবে না?" শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন; "সকলেই ত আপনার, আপনি রঙ্গমঞ্চে যখন যাহা সাজিয়া দর্শকবৃন্দের তৃপ্তি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করিবেন।" গৌরের মুখ হইতে এই আনন্দজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুরসিক নৃত্যপ্রিয় আচার্য্য তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহার নৃত্য দর্শনে হাস্য করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীমান্ পণ্ডিত তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার প্রতি কোন ভার অর্পিত হইল না দেখিয়া তিনি একটু দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "অভিনয়ের সময় আমি মসালচির কার্য্য করিব।" শ্রীমান্ পণ্ডিতের কথায় সভার মধ্যে একটা হাস্য রসের সঞ্চার হইল। অভিনয়কার্য্য সমাধার জন্য গৌরসুন্দর চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাটির বৃহৎ প্রাঙ্গণই নির্দ্ধারণ করিলেন, এবং তাঁহাকে এ বিষয় অবগত করিয়া, দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান এবং অভিনয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার পক্ষে যাহা যাহা প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে বলিলেন; ধনশালী বুদ্ধিমন্ত খান্‌কে অভিনেতাদিগের সাজ যোগাইবার ভার অর্পণ করিলেন। বিশ্বম্ভরের প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিয়া সকলেই এ কার্য্যের সহায়তায় যত্নবান হইলেন।

গৌর ইতিমধ্যে এক প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, "অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের আজকার অভিনয়স্থলে প্রবেশের অধিকার নাই।" প্রভুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য মস্তক নত করিয়া, জমিতে একটি আঁক কাটিয়া বলিলেন, "তবে ত আমার যাওয়া হইবে না।" শ্রীবাস পণ্ডিত ও অন্যান্য প্রবীণ বৈষ্ণবেরাও গৌরের কথানুসারে রঙ্গমঞ্চে যাইবার অযোগ্যতা প্রকাশ করিলেন। গৌর সকলের রসনা হইতে একই কথা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা না গেলে, তবে কে যাইবে?"

গৌর ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে নৃত্য, কীর্ত্তন ও নাট্যাভিনয় করিবেন, এ সমাচার নবদ্বীপের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল। চন্দ্রশেখর আপনার বাটির সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে দর্শকবৃন্দের বসিবার সুব্যবস্থা করিলেন। বুদ্ধিমন্ত খান্ সাজঘর ও অভিনেতাদিগের সময়োচিত সাজ সজ্জা প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। অভিনয়কার্য্য সম্পাদনের পক্ষে যাহা যাহা প্রয়োজন, চন্দ্রশেখর ও বুদ্ধিমন্ত খান্ উভয়ে তাহার সমস্তই ব্যবস্থা করিলেন।

সূর্য্য অস্তমিত হইতে না হইতে, চন্দ্রশেখরের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণভূমি লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। মহিলাদিগের উপবেশনের স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রপরিবারের মহিলারা অভিনয় দর্শনের জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা শচীদেবী, তাঁহার নিমাই ভক্তসঙ্গে অভিনয় করিবেন, এই আনন্দে পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে করিয়া চন্দ্রশেখরের ভবনে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রশেখরের পত্নী এই উপলক্ষে মহিলাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন।

অভিনয়ের সময় উপস্থিত হইল। রঙ্গমঞ্চে সকলে সমবেত হইলে, প্রথমে কীর্ত্তন ও বন্দনা হইল। অদ্বৈতাচার্য্য রঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করতঃ সভাস্থ সকলকে হাস্যরসে পরিপ্লুত করিয়া তুলিলেন। এমন সময়ে হরিদাস

কোটাল বেশে মুরারিগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমিতে আগমন করিয়া সকলকে ব'লিলেন, "জাগো—জাগো—আজ মহালক্ষ্মীর নৃত্য হইবে।"

সভা নিস্তব্ধ; এমন সময়ে নারদবেশধারী শ্রীবাস পণ্ডিত রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডল, দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু, ললাটে বক্ষে ও বাহুদ্বয়ে তিলক; স্কন্ধে বীণা লম্বিত, হস্তে কমণ্ডলু, এ-সকলে তাঁহাকে যথার্থই দেবর্ষি নারদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। মুনিবর সভাসীন হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, সকলে অনিমিষ নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঋষি আসনে উপবেশন করিলে, অদ্বৈতাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?"

নারদ। আমি শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া বেড়াই; সর্ব্বস্থানে হরিগুণ কীর্ত্তন করাই আমার কার্য্য।

অদ্বৈত। তবে আমাদের একটা হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া শুনান দেখি। তখন নারদ মুনি বীণাযন্ত্রটি লইয়া অতি মধুরস্বরে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। মধুর কণ্ঠে ও বীণার ঝঙ্কারে তিনি যখন গাহিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের উপর দিয়া যেন সুধার স্রোত বহিতে লাগিল। লোকে মনে করিতে লাগিল, যেন সত্য সত্যই দেবর্ষি দেবলোক হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন। নারদের ঋষিতুল্য রূপ ও বীণার ঝঙ্কার মিশ্রিত তাঁহার মধুর সংগীত ধ্বনিতে নারীগণ বিমুগ্ধ হইয়া পর্দ্দার ভিতর হইতে সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা সরলা গৌর-জননী, শ্রীবাস-পত্নী মালিনী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বউ, এই কি পণ্ডিত?" মালিনী নত মস্তকে একটু অবগুণ্ঠন টানিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "লোকে ত তাই বল্‌ছে।"

দেখিতে দেখিতে এক নূতন দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। গৌর রুক্মিণীর বেশে রঙ্গস্থলে উপনীত হইলেন। বিদর্ভ দেশে ভীষ্মক নামে এক

বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রুক্মী ও একমাত্র কন্যার নাম রুক্মিণী। রুক্মিণী সৌন্দর্য্যে ও গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে স্বামিরূপে হৃদয়ে বরণ করেন, এবং তিনি ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণে প্রস্তুত হইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ়া হন। ভীষ্মক-তনয়া রুক্মিণী যৌবনে পদার্পণ করিলে, রাজা তাঁহাকে চেদি রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন কন্যা দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না, তখন তিনি চেদি রাজার সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুক্মী কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন; এজন্য কৃষ্ণের সহিত ভগিনীর বিবাহের প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়া, চেদি রাজার সহিত, তাঁহার পরিণয়কার্য্য সমাধা করিতে পিতাকে অনুরোধ করিলেন। চেদি রাজার সহিত রুক্মিণীর বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইল। রুক্মিণী, শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহারও হস্তে দেহ মন সমর্পণ করিবেন না; তাই তিনি গোপনে সুনন্দের হস্তে একখানি পত্র দিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করেন।

গৌরসুন্দর, আজ সেই রুক্মিণীর বেশে, কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী হইয়া তদীয় চরণে দেহ মন উৎসর্গ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন। নারী-বেশধারী গৌরের রূপ যৌবনে তাঁহাকে প্রকৃতরূপেই এক পরমাসুন্দরী নারী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি রঙ্গমঞ্চে রুক্মিণীর কৃষ্ণপ্রেমানুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ভাগবদোক্ত শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণী-লিখিত পত্রখানি, এমন প্রেমগদ্‌গদ্‌ভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন যে, সকলের প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল; সকলের চক্ষু হইতে বারিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

"হে ভুবনসুন্দর! তোমার রূপ ও গুণের কথা কর্ণকুহরের মধ্য দিয়া

অন্তরে প্রবেশ করিয়া, কাহার প্রাণ সুশীতল না করে? আমি প্রাণ খুলিয়া তোমাকে বলিতেছি, আমি লজ্জাহীনা নারীর ন্যায় তোমাতে অনুরক্তা হইয়া পড়িয়াছি। মুকুন্দ! কোন্ নারী তোমার ন্যায় রূপগুণ-শালী পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী না হয়? আগামী কল্য আমার বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তুমি তোমার সৈন্যগণ সঙ্গে এখানে আগমন করিবে, এবং বিপক্ষ পক্ষ পরাস্ত করিয়া, আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। দেখিও, যেন চেদিরাজ আমাকে গ্রহণ না করে; যাহা সিংহের প্রাপ্য তাহা কি শৃগালে লইয়া যাইবে? তোমার বস্তু তুমি আসিয়া গ্রহণ কর, তুমি যদি এ দাসীর প্রার্থনা পূর্ণ না কর, তাহা হইলে, আমি অনশনে দেহত্যাগ করিব। প্রাণবল্লভ! যদি এ-জন্মে তোমাকে লাভ করিতে না পারি, বহু জন্মান্তরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রাণের পিপাসা নিবারণ করিব।"

তৎপরে পত্রবাহক সুনন্দের হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে এ পত্রখানি প্রদান করিও।"

গৌরের অভিনয় শেষ হইলে, চারিদিকে আনন্দ-তরঙ্গ বহিতে লাগিল; মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যের সহিত হরিধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। নারীগণ রুক্মিণীর কৃষ্ণানুরাগের মধুর কথা শ্রবণে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন অভিনয়ান্তে শঙ্খনিনাদে আপনাদিগের মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন গদাধর রাধিকা বেশে বিদ্যাপতির এই সংগীতটি ধানশী সুরে গাহিতে লাগিলেন;—

"সখি! কি পুছসি (১) অনুভব মোয় (২)?
সোই পিরীতি অনুভব বাখানিতে নূতন হোয়।

(১) পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ। (২) মোয়—আমাকে।

জনম অবধি হাম (১) রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত (২) ভেল ;
লাখ লাখ হাম, হিয়া হিয়ে রাখনু,
হৃদয় না জুড়ল গেল।
বচন অমিয়া রস, অনুখণ শুননু ;
শ্রুতিপথে পরশ না ভেল ;
কত মধুযামিনী, রভসে (৩) গোঁওায়নু (৪)
না বুঝনু কৈছন (৫) কেলি (৬)।”

গদাধর এই গানটি গাহিতে গাহিতে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তখন আবার এই গানটি ধরিলেন—

“বঁধু কি আর বলিব আমি !
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি।
তোমার চরণে, আমার পরাণে ;
বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হৈলাম দাসী ॥”

রাধিকারূপিণী গদাধর এই গান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুগঠিত দেহখানি নৃত্যের সময় মৃদুমন্দভাবে হেলিতে দুলিতে লাগিল, অধরে মধুর হাসি যেন কুন্দ

(১) হাম—আমি। (২) তিরপিত—তৃপ্তি।
(৩) রসভে—উৎসুক বশতঃ। (৪) গোঙায়নু—যাপন করিলাম।
(৫) কৈছন—কিরূপ। (৬) কেলি—ক্রীড়া।

কুসুমের মত ফুটিয়া উঠিল, কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগে শরীর কণ্টকিত হইল, তখন যেন প্রাণশূন্য পুত্তলিকার ন্যায় নরনারী, তাঁহার এই মধুর স্বর্গীয় ভাব দর্শন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গৌর আদ্যাশক্তির বেশে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি যখন যে কার্য্য করিতেন তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। তিনি আজ এমন বেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া, দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ে মাতৃভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। শ্রীমান্ পণ্ডিত উজ্জ্বল মশাল লইয়া মাতৃবেশধারিণী গৌরের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। হরিদাস কোটাল হইয়া, সকলকে জাগ্রত করিতে লাগিলেন। গৌর যখন নিত্যানন্দের হস্ত ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। নিত্যানন্দ ভাবে বিভোর হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন; দর্শকবৃন্দ ভাবে প্রেমে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। গৌর নৃত্য করিতে করিতে মহালক্ষ্মী-ভাবে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, গোপীনাথকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। এই জননী-মূর্ত্তি দর্শনে পুরুষ ও নারী সকলেই "মা মা," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বহুসংখ্যক লোক তাঁহার সিংহাসন-সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রেমে বিভোর হইয়া কেহ বা লক্ষ্মী কেহ বা চণ্ডীর স্তব পাঠ করিতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নগর সংকীর্ত্তন

হরিনামের ধ্বনিতে যে কেবল শ্রীবাসের ভবনই পূর্ণ হইতে লাগিল, তাহা নহে, অধিকাংশ গৃহেই, গৌর-প্রমুখ ভক্তদিগের দ্বারা সুধামাখা হরি-

সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল। দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, নবদ্বীপের বহু পরিবারে মৃদঙ্গ ও করতালের ধ্বনির সহিত, নানা কণ্ঠ হইতে হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। বালক · যুবা বৃদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত ভক্তিলাভের এই সরল উপায় অবলম্বন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। নবদ্বীপে ভক্তির নূতন স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, এক নূতন আলোকে চারিদিক আলোকিত হইবার উপক্রম হইল।

তখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা, সৈয়দ হুসেন সা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ কাজী নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। তিনি দেখিলেন, তাঁহার রাজ্যের মধ্যে অনেক গৃহে হরিসংকীর্ত্তনে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কীর্ত্তনকারীদিগের কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। যে যে স্থলে কীর্ত্তন হয়, অনুচরবর্গের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া, স্বয়ং তাহাদিগের সঙ্গে সে-সকল স্থলে গমন করত, সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া, খোল ভাঙ্গিয়া, এবং 'মার মার' শব্দে নিরীহ হরিভক্তদিগের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিতে লাগিলেন। ভীরু অল্পবিশ্বাসীরা কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিল। কেহ কেহ ভয়ে লুকাইয়া রহিল; কেহ কেহ বলিতে লাগিল, হরিনাম কি আর মনে মনে লওয়া যায় না; বৃথা গোলযোগে প্রয়োজন কি? যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের এই নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিল না, তাহারা বলিতে লাগিল, নিমাই পণ্ডিতের জারিজুরি এবার সব ভাঙ্গিয়া যাইবে, কাজীর শাসনের কাছে আর এসব চলিবে না। যাঁহারা এই প্রাণপ্রদ হরিনাম কীর্ত্তনে জীবনের কল্যাণ ও মুক্তির পথ নিকটবর্ত্তী হইবে মনে করিয়াছিলেন, কাজীর অত্যাচারে তাঁহারা সংকীর্ত্তনে বিরত হইয়া, প্রাণে অশেষ ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কৃষ্ণভক্ত গৌর-শিষ্যেরা মর্ম্মাহত হইয়া কাজীর

অত্যাচার ও আপনাদিগের হৃদয়-বেদনার কথা শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট নিবেদন করিলেন। সংকীর্ত্তনের জন্মদাতা গৌরসুন্দর ইতঃপূর্ব্বেই কাজীর অত্যাচারের বিষয় সকলই অবগত হইয়াছিলেন।

শত শত ভক্ত আসিয়া যখন বলিল, আমরা কাজীর অত্যাচারে কীর্ত্তন বন্ধ করিয়াছি; এখন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাই। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে যেন এক বীরবলের সঞ্চার হইল; তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "নিত্যানন্দ, নবদ্বীপের সকল স্থানে আজ হরিনাম কীর্ত্তন করিব, দেখি, কে বাধা দিতে সমর্থ হয়?"

নগরের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তসঙ্গে হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিবেন, এই কথা নিমেষের মধ্যে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অনেক পরিবারস্থ লোকেরা এই শুভ সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, আপনাপন বাটীর বহির্দ্দেশে আম্রশাখা ও জলপূর্ণ কলস সজ্জিত করিল।

সন্ধ্যা সমাগমের কিছু পূর্ব্বেই দলে দলে লোক আসিয়া, গৌরাঙ্গদেবের বাড়ীর প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য, পুষ্পের মালা ও বিবিধ খাদ্য দ্রব্য লইয়া আগমন করিল।

গৌর কীর্ত্তনকারীদিগের দল বিভাগ করিয়া দিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাস, এক এক দলের নেতারূপে মনোনীত হইলেন। স্বয়ং গৌর নিত্যানন্দকে পার্শ্বে লইয়া একটি দলের অধিনায়করূপে কীর্ত্তনকারী দলের পশ্চাতে পশ্চাতে রহিলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। আলোর জন্য লোকে শত শত মশাল প্রস্তুত করিল। পতাকা তুলিয়া শত শত মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যধ্বনি সহকারে ভক্তদল বিশ্ববিজয়ী হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন।

বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে বলিতেছেন,—

"'হরি' বলি ডাকিলেন, গৌরসুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইয়া সত্বর॥
করিতে লাগিল প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন।
সবার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাল্গু চন্দন॥
করতাল মন্দিরা সবার শোভে করে।
কোটি সিংহ জিনিয়া সবাই শক্তি ধরে॥
চতুর্দ্দিকে আপন বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥"

ক্রমশই লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক বিশাল জনস্রোত রাজপথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌরসুন্দর সেই জনতার মধ্যে ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া, নৃত্য করিয়া ও করতালি দিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন; তাঁহার গলদেশে পুষ্পের মালা; প্রশস্ত ললাট চন্দনচর্চ্চিত, আর তাঁহার নয়নযুগল হইতে বারিধারা নির্গত হইতেছে। সে দৃশ্য দেখিলে, অতি অভক্তের হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার প্রেমরসপূর্ণ কণ্ঠনিঃসৃত মধুর হরিধ্বনি শ্রবণ করিলে, অতি শুষ্ক কণ্ঠ হইতেও ভগবানের নাম উচ্চারিত হয়। আজ এই সহস্র সহস্র লোক তাঁহারই অনুপ্রাণনা শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। যাহাদের রসনা কখন হরিগুণ কীর্ত্তন করে নাই, তাহাদের রসনা হইতেও আজ কীর্ত্তনের ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। যাহারা কখন নৃত্য করে নাই, তাহাদের চরণদ্বয়ও আজ আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না; ভক্তসঙ্গে তাহারাও নৃত্য করিতে লাগিল। ভক্তদল পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন, আর সহস্র সহস্র লোক তাঁহার মাধুর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

সকল গৃহস্থের বাটীর বহির্দ্দেশ দীপালোকে আলোকিত; আম্রশাখা

সম্বলিত জলপূর্ণ কলস, নারিকেল, পাত্রোপরি ধান্য, দূর্ব্বা, দধি, কলা প্রভৃতি হিন্দুজাতির শুভানুষ্ঠানের দ্রব্য সকল সজ্জিত রহিয়াছে। কীর্ত্তনকারীরা গৃহস্থের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, নারীগণ শঙ্খনিনাদে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্প, খই, কড়ি প্রভৃতি বর্ষিত হইতে লাগিল। সহস্রাধিক লোকের কণ্ঠ হইতে সেই পাপতাপহারী হরিনামের মধুর কীর্ত্তন ধ্বনি উত্থিত হইয়া চারিদিক বিকম্পিত করিতে লাগিল; নবদ্বীপ টলমল করিয়া উঠিল। যে ভাবের প্রবল বন্যায় উত্তর-কালে বঙ্গদেশের চারিদিক প্লাবিত করিবে, আজ নবদ্বীপে তাহারই সূচনা হইল। ধর্ম্মেতিবৃত্তে আজ এক নূতন পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইল, বঙ্গদেশে ও ভারতে এক নব যুগের সূত্রপাত হইল।

কীর্ত্তনের দল ক্রমে কাজীর বাটীর দিকে চলিল। কাজী দূর হইতে কীর্ত্তনের মহা শব্দ শ্রবণ করিয়া, তত্ত্ব জানিবার জন্য কয়েকজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা একে একে ফিরিয়া আসিয়া, সকল ঘটনা বিবৃত করিল, এবং নগরের সাজ সজ্জা, বহুসংখ্যক লোকের সমাগম প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া, বলিল, কোন রাজপুত্রের বিবাহেও এমন সমারোহ হয় নাই। দেখিতে দেখিতে কীর্ত্তনকারীদিগের দল হরিনামের ধ্বনি করিতে করিতে কাজীর বাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইল। কাজী দূর হইতে অসংখ্য মানবের মস্তক দর্শন করিয়া, ভয়ে ভীত হইয়া লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে সহস্র সহস্র লোকে তাঁহার বাটী ঘেরিয়া ফেলিল, এবং 'কাজী সাহেব কোথায়' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

সহস্র সহস্র লোক তাঁহার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ফুলের গাছ উপড়াইতে ও বৃক্ষের শাখা সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল; কুসুমরাজি বৃক্ষচ্যুত করিয়া নষ্ট করিতে লাগিল। কেহ কেহ, তাঁহার ভবনের অন্যান্য দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেই বা কাহার কথা শ্রবণ করে; আর কেই বা নিষেধ করে। শত শত মৃদঙ্গ ও করতাল

বাজিতেছে ; তৎসঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে গভীর নিনাদে নামের জয়ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। এই মহা কোলাহলের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব. ক্ষণকাল কীর্ত্তন বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন।

সকলে নিস্তব্ধ হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাজী উপস্থিত হইলে, গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা আপনার বাড়ীতে আসিয়াছি, এসময় আপনার কি দূরে থাকা উচিত ?"

গৌরাঙ্গ তৎপর কাজীকে দুইটি অনুরোধ করেন। প্রথমটি, গো বধ করিতে নিষেধ। তিনি বলিলেন যে, গাভী মাতার ন্যায় দুগ্ধ দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করে, তাহাকে কি বধ করিতে আছে ? দ্বিতীয়টি, সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে তিনি যেন আর কোন উপায় অবলম্বন না করেন। কাজী গৌরাঙ্গের কথা অতি বিনম্র ভাবে শ্রবণ করিয়া, প্রথম অনুরোধটি সম্বন্ধে বলিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে গো বধের ব্যবস্থা আছে, এবং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বৈদিক সময়ে গোমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল।" গৌর গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে কাজীর কথা হিন্দু শাস্ত্রের দ্বারাই খণ্ডন করিয়া দেন। এবিষয়ে কাজী গৌরের কথার কোন উত্তর দানে সমর্থ হন নাই। দ্বিতীয় অনুরোধটি সম্বন্ধে কাজী বলিলেন, "তোমার দেশের হিন্দুরাই আসিয়া তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিত। তাহারা বলিত, নিমাই পণ্ডিত এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে ; আর এই কীর্ত্তনের জন্য অনেক সময় লোকের নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে ইত্যাদি ; আমি সেই জন্যই কীর্ত্তন নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলাম। এখন দিব্য করিয়া বলিতেছি, নবদ্বীপে সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে আমি কখন হস্তোত্তোলন করিব না, এবং আমার পরিবারস্থ কেহই ইহার প্রতিকূলাচরণ করিবে না। উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইল, হরিনামের স্রোত অবাধে চলিবার পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। এখন কাজীর ভবনে লক্ষ কণ্ঠ হইতে জয় জয় নিনাদে হরিধ্বনি উত্থিত হইল ; শত শত মৃদঙ্গ ও করতাল বাজিতে লাগিল ;

শিঙ্গার ভোঁ ভোঁ শব্দে যেন সকলের কর্ণকুহর বধির হইয়া যাইতে লাগিল।

দেশবিজয়ী কীর্ত্তনকারীদিগের দল পরিশেষে আবার মধুর রবে কীর্ত্তন করিতে করিতে, সারি বাধিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভবনে উপস্থিত হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীবাসের পুত্রশোক ও অদ্বৈতের দণ্ড

ভক্তদিগের চরিত্র সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। সংসারের কোন দুর্ঘটনায় যেখানে সাধারণ লোকের চিত্ত বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে, সেখানে তাঁহারা অবিকৃত চিত্তে আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর থাকেন। একদিন শ্রীবাসের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার সঙ্গিগণ সহ সংকীর্ত্তন নৃত্যাদিতে রত আছেন, এমন সময়, অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি শ্রীবাসের কর্ণগোচর হইল। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীবাসের একটি পুত্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিল। ক্রন্দনের শব্দ শ্রীবাসের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ধীরে ধীরে গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; গিয়া দেখিলেন, সন্তান গতাসু হইয়াছে। তিনি নানাপ্রকারে আপনার পত্নী প্রভৃতিকে সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন, এখন আর কাঁদিও না; এখন শোকের আবেগ মনের মধ্যে চাপিয়া রাখ, কারণ প্রভু এখন গৃহের মধ্যে ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন; তোমাদের রবে যদি তাঁহার ভাবের ব্যাঘাত

উপস্থিত হইয়া তাঁহার নৃত্য ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে, আমি গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিব।

"কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়,
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিনু সর্ব্বথায়।"

—চৈঃ ভাগবত।

শ্রীবাস পণ্ডিতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পত্নী মালিনী দেবী ও অপরাপর নারীগণও শোকাবেগ সম্বরণ করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যের কোন ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই, দেখিয়া, তিনি ভক্তদিগের সঙ্গে যোগদান করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় প্রেমানন্দে কীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন। নিশাবসানে শ্রীচৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি তৎপর শ্রীবাসের পুত্র বিয়োগের কথা শ্রবণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণ?" ভক্তেরা বলিলেন, "রাত্রি চারিদণ্ডের সময়; কিন্তু পাছে, আপনার ভাবের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেজন্য পণ্ডিত নীরবে থাকিয়া, কীর্ত্তনাদি করিতেছেন ও পরিবারস্থ নারীগণের ক্রন্দন বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।" শ্রীগৌর ভক্তবৃন্দের মুখ হইতে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসের অপূর্ব্ব ধৈর্য্য, তাঁহার অসাধারণ ভগবদ্ভক্তি ও তাঁহার প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও প্রীতির নিদর্শন স্মরণ করিয়া, "গোবিন্দ গোবিন্দ" বলিয়া উঠিলেন। আর বলিলেন, "এত করিয়া আমায় যে ভালবাসে, তাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিয়া যাইব!" প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে কিরূপে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, কেন বলিলেন, তা তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপর গৌর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, শ্রীবাস-পত্নী মালিনী দেবীকে বলিলেন, "মা, পুত্রশোক নিবারণ কর, তোমার এক পুত্র পরলোক গমন করিল, কিন্তু আমি ও নিতাই তোমার দুই পুত্র হইলাম। তুমি আমাদিগকে ভালবাসিও।" শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখের মধুর বাণীতে, শোকদগ্ধ জননীর প্রাণ শীতল হইয়া গেল। শোকাভিভূত

শ্রীবাসপরিবারস্থ সকলেই তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল। গৌর বালকের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা করিবার জন্য ভক্তসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশানে গমন করিলেন।

যখন গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে হরিরস মদিরা বিতরণে সকলকে মত্ত করিতেছেন, সেই সময়ে, কেন ঠিক বলা যায় না—অদ্বৈতাচার্য্য গৌর-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পত্নীসহ শান্তিপুরে গমন করিয়া বাস করিতে থাকেন। ভক্ত যবন হরিদাসও তখন আচার্য্য ভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদিন গৌর নিত্যানন্দের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে নিত্যানন্দকে বলিলেন, "আচার্য্য শান্তিপুরে বাস করিতেছেন, চল আমরা তাঁহার বাটীতে যাই।" নিত্যানন্দ তাঁহার কথায় সম্মত হইলে, উভয়ে শান্তিপুরে যাত্রা করিলেন। শান্তিপুর যাইবার পথে ললিতপুর নামক একখানি ছোট গ্রাম আছে। তথায় গঙ্গাতীরে এক গৃহস্থ সন্ন্যাসীর আশ্রম। তাঁহারা ললিতপুরে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর আশ্রমে উভয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গৈরিকবসনপরিধেয়, জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী তথায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। গৌর ও নিতাই তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে, সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমরা সুন্দরী স্ত্রী ও ধনলাভ করিয়া সংসারে সুখে বাস কর, এই তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।" শ্রীকৃষ্ণানুগতপ্রাণ গৌরসুন্দর সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদে প্রীত না হইয়া বলিলেন, "আপনার নিকট এরূপ অকিঞ্চিৎকর আশীর্ব্বাদের প্রত্যাশা করি না। যাহাতে জীবনে বিষ্ণুভক্তির সঞ্চার হয়, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করাই আপনার ন্যায় ব্যক্তির শোভা পায়।" সন্ন্যাসী গৌরকে অর্ব্বাচীন মনে করিয়া, কামিনী ও কাঞ্চন যে মানবজীবনের সুখকর বস্তু তাহাই তাঁহাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন। গৌর তাঁহার কথায় প্রীতি লাভ করিলেন না; তিনি বুঝিলেন, সন্ন্যাসী ভগবদ্ভক্তির মধুর আস্বাদন এখনও লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর অনুরোধে তাঁহারা জলযোগ করিতে বসিলে, সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, তিনি আনন্দ লইয়া আসিলে, তাঁহারা উহা পান করিবেন কি না? গৌর যখন শুনিলেন, আনন্দ অর্থ সুরা, তখন তিনি কিছু না বলিয়া, ভোজন দ্রব্য ফেলিয়া গৃহের বাহির হইয়া আসিলেন, নিত্যানন্দও তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন। এইরূপ নৈতিক বল না থাকিলে কি গৌর ও নিত্যানন্দ বঙ্গভূমিতে যুগান্তর আনয়ন করিতে পারিতেন?

আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা গন্তব্য স্থানের দিকে যাত্রা করিয়া শান্তিপুরে আচার্য্য-ভবনে উপনীত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য শিষ্যবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতেছেন; গৌর তথায় গিয়াই তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "নাড়া "জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়?" আচার্য্য বলিলেন, "জ্ঞানই বড়,ইহাই ত চিরদিন সকলে বলিয়া আসিতেছে।" গৌর এ-কথায় বড় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন, আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া, বৃদ্ধ অদ্বৈতের পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী গৃহাভ্যন্তর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া, বলিলেন, "কি কর, বুড়ো যে মরিয়া যাইবে?" আচার্য্য প্রহার খাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং তৎপরে তাঁহার স্নেহের নিমাইকে ক্রোড়ে করিয়া উপবেশন করিলেন। এই অভিনব দৃশ্য দর্শন করিয়া, নিত্যানন্দ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। আচার্য্যের শিষ্যবৃন্দ অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল। সীতাদেবীর চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। গৌর নিত্যানন্দ-সহ আচার্য্য-ভবনে তিন দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই তিন দিন যেন অদ্বৈতের ভবনে মহোৎসব হইয়াছিল। ভক্তবৃন্দ গৌর সহ যেমন সংকীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তেমনি প্রীতি-ভোজনেও সকলে তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসের পূর্ব্বাবস্থা

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে নগর-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি দেখিলেন, নরনারীর হৃদয়ের কলুষভাব দূর করিতে, তৃষিত ও তাপিত হৃদয় শীতল করিতে, শুষ্ক ও ধর্ম্মহীন হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে ভগবৎ-প্রেমের উৎস উৎসারিত করিতে, দাম্ভিক হৃদয়ের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া, তাহাকে তৃণাপেক্ষা দীন করিতে ও ভক্ত-হৃদয়ের প্রেমপ্রবণতা বৃদ্ধি করিতে, হরিনাম সংকীর্ত্তন ভিন্ন আর উচ্চতর উপায় নাই। তিনি নিজে যে নাম কীর্ত্তনে ও ধ্যানে অপার ও অপার্থিব আনন্দ সম্ভোগ করিতেন, সে সুধামাখা মধুর নাম কেবল, নবদ্বীপবাসীর নিকট প্রচার করিয়া, তাঁহার হৃদয় তৃপ্তি মানিল না; সে প্রাণপ্রদ রসস্বরূপ ভগবানের নাম, বঙ্গদেশের নরনারীর মধ্যে কীর্ত্তন, ও দ্বারে দ্বারে বিতরণের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

নরনারীকে ভক্তির পথে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহার বাসনা দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ না করিলে, তাঁহার সে বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হইবে না, এই ভাবই ক্রমে তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। কথিত আছে, এমন সময়ে তিনি একটি স্বপ্ন দর্শন করেন যে, কোন সদানন্দ পুরুষ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে, তুমি জননী ও ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন কর। এ-সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যুক্তিযুক্ত কি না, গৌর তাঁহাকে এই প্রশ্ন করাতে, স্বপ্নদ্রষ্ট সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে তাঁহার জীবনের মহাব্রতের কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং

সংসারের বন্ধন ছিন্ন করতঃ ত্বরায় সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, নরনারীর উদ্ধারের জন্য হরিগুণ-কীর্ত্তনে রত হইতে বলিলেন। স্বপ্ন দর্শনের পর গৌরসুন্দরের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কিছু দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে ভাব প্রধূমিত হইতেছিল, তদ্ভাবাপন্ন স্বপ্ন দর্শনে সে স্পৃহা তাঁহার যেন অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শিখাসূত্র পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডধারী হইয়া নরনারীকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইলেন।

এ-সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল। কেশবভারতী নামক একজন পরিব্রাজক দণ্ডী, নবদ্বীপে আগমন করেন, তাঁহাকে দর্শনমাত্র গৌরের স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল; তিনি দেখিলেন, যিনি স্বপ্নযোগে তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া, তাঁহাকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, নবাগত দণ্ডী, কেশবভারতীর অবয়বের সহিত সেই স্বপ্নদ্রষ্ট ব্যক্তির অঙ্গের সমস্ত সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহারও হস্তে কমণ্ডলু ছিল; কেশবভারতীরও হস্তে তাহা শোভা পাইতেছে। স্বপ্ন সত্য হইল দর্শন করিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং দণ্ডী কেশবভারতীকে নিজ ভবনে আতিথ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। নবাগত সন্ন্যাসীও গৌরসুন্দরের বাটীতে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। গৌর ভারতীর আগমনে, আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইল মনে করিতে লাগিলেন। তিনি রজনীতে সন্ন্যাসীর নিভৃত শয়নকক্ষে গমন করিয়া, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ও তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পাণ্ডিত্য ও তাঁহার অদ্ভুত ধর্ম্মানুরাগের কথা, দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল; কেশবভারতীও তাঁহার গুণগৌরবের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি এখন সেই গৌরাঙ্গের ভবনে অতিথি হইয়া এবং তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সেই সুবিখ্যাত

সুপণ্ডিত ও ভক্তিপথাবলম্বী গৌরসুন্দর যখন তাঁহার নিকট দীক্ষা-গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, তখন ভারতী, আনন্দে ও বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি ত মানুষ নও, সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার।" পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে দীক্ষার দিন স্থির করিয়াছ? গৌর বলিলেন, "আগামী উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির পর দিন।" কেশবভারতী তাঁহাকে দীক্ষাদানে স্বীকৃত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরদিন প্রভাতে ভারতীগোঁসাই কাটোয়ায় তাঁহার আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান সহচর ও শিষ্য। গৌর নিভৃতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট আপনার হৃদয়-কপাট খুলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখ, আমি নিজের উদ্ধারের জন্য যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ ও মস্তক-মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হইব। ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব; আর সকলের দ্বারে দ্বারে মধুর হরিনাম ঘোষণা করিব। আমি সঙ্কল্প করিয়াছি, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব। তুমি এজন্য দুঃখিত হইও না; আর তুমি আমার এই বাসনার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিও না; ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের এই প্রধান পথ, তাহা ত তুমি সকলই জান।" নিত্যানন্দ গৌরের শিখাসূত্র বর্জ্জনের কথা শ্রবণ করিয়া প্রাণে বড় ক্লেশ পাইলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ স্বয়ং অবধূত; তিনি জানিতেন, ধর্ম্মপ্রচারের এই প্রকৃষ্ট উপায়। আর গৌরের এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করা বৃথা, ইহা প্রতীতি করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি সকলই ভাল জান; তোমাকে পথ দেখাইতে, অথবা সে-পথে যাইতে নিষেধ করিতে পারে এমন কে আছে? প্রভো! তুমি জগৎ তরাইবার জন্যই যদি বাহির হইবে, তবে তোমার সঙ্গীদিগকে তোমার এ-সঙ্কল্পের কথা গোচর করা উচিত। তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহা শুনিয়া তোমার যাহা অভিপ্রেত হয় তাহাই করিবে।" গৌর নিত্যানন্দের নিকট হইতে আপন অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্য শ্রবণ

করিয়া, পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। নিত্যানন্দ কর্ত্তব্যবোধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু গৌর গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে, শচীদেবী কিরূপে তাঁহার প্রাণসম পুত্রের মুখ দর্শন না করিয়া জীবনধারণ করিবেন, বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া কিরূপে স্বামিবিরহযাতনা হৃদয়ে ভোগ করিবে, এবং তাঁহারাই বা কিরূপে তাঁহাদের হৃদয়ের পুত্তলি ও নয়নের তারাসম গোরাচাঁদকে না দেখিয়া নবদ্বীপে বাস করিবেন, এই সকল চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উত্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে যেন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

গৌর তাঁহার প্রাণসম শিষ্যবৃন্দের নিকট আপনার মনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, এবং তিনি মুকুন্দ দত্তের গৃহে গমন করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গীত করিতে বলিলেন। মুকুন্দ তাঁহার মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, গৌর তাঁহার সঙ্গীতে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, "মুকুন্দ! আমি শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি।" মুকুন্দ এই হৃদয়বিদারক কথা শ্রবণ করিয়া, দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মুকুন্দ জানেন, ভক্ত-চূড়ামণি গৌরের সঙ্কল্প টলিবার নহে, তিনি সেজন্য অতি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "প্রভো, যদি একান্তই আমাদের ছাড়িয়া যাইবে, তাহা হইলে আর কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকিয়া কীর্ত্তনাদি কর।" গৌর মুকুন্দের এই মিনতি শ্রবণ কবিয়া তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। তিনি গদাধরের নিকট পূর্ব্বোক্তরূপে আপনার সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গদাধর গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শ্রবণ করিয়া বড় ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গদাধর তাঁহাকে বলিলেন, সংসারে থাকিয়া কি বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাধন করা যায় না, তুমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেলে মা কিরূপে বাঁচিবেন? ইত্যাদি কয়েকটি কথা বলিয়া অবশেষে বলিলেন, যদি সন্ন্যাস ধর্ম্মই ঠিক মনে করিয়া থাক, তাহাই কর। তাড়িতবেগে গৌরের সন্ন্যাস

গ্রহণের কথা তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। যাঁহাকে একদিন দর্শন না করিলে তাঁহাদিগের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিত, যাঁহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া, তাঁহারা কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন, সুখে দুঃখে বিপদে যাঁহার জীবনের মধুময় আদর্শ তাঁহাদিগকে শান্তির পথে, ভক্তির পথে ও অটল ধর্ম্মবিশ্বাসের পথে পরিচালিত করিত, জীবনের এমন সহায় ও বন্ধুকে হারাইয়া তাঁহারা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন, এই চিন্তা করিয়া সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া পড়িল। দিবাবসানে শ্রীবাসভবনে যখন ভক্তবৃন্দ মিলিত হইলেন, তখন গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস যাত্রার কথা উত্থিত হইল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। গৌরসুন্দর বলিলেন, সকল নরনারীর কল্যাণের জন্য আমি সংসার পরিত্যাগ করিতেছি, এজন্য তোমরা দুঃখ করিও না; তোমরা সর্ব্বদাই আমার হৃদয়-মাঝে থাকিবে; এই বলিয়া তিনি তাঁহার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া একে একে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। এই বিদায়ের দিনে সকল বিষ্ণুভক্তের চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল; সকলের কণ্ঠ হইতে মধুর হরিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

গৌর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবেন, এ বার্ত্তা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। শচীদেবী যখন শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের রতন নিমাই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তখন তিনি ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সরলা বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় এ-সংবাদে যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি অশ্রুজলে আপনার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

শচীদেবী কাতর হৃদয়ে গৌরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই নাকি সন্ন্যাসী হ'বি?" এই কথা বলিতে বলিতে, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। গৌরচন্দ্র বলিলেন, "মা, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম প্রচার করিব স্থির করিয়াছি, সেজন্য তুমি দুঃখিত হইও না।" শচীদেবী কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা নিমাই, বিশ্বরূপ ছেড়ে চলে গেছে, কেবল তোর মুখ চেয়ে এখন সংসারে বাস করিতেছি, তুই চলে গেলে, বাবা আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবে মরিব ; তুই যদি সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যাস্, তবে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে লইয়া যা ; তাহাকে কে দেখিবে বাবা !" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল ; তিনি শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ; তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নিমাই জননীর বক্ষে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক শোকাভিভূতা জননীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "মা, এ-সংসারে কেহ কাহারই নয়, লোকে সর্ব্বদা মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছে, এই মোহ মায়া পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য ; তুমি শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ মন অর্পণ করিয়া বাস কর, মায়া পরিত্যাগ কর।"

তৎপর শচীকুমার জননীকে আপনার অবতারত্ব বিষয়ে কয়েকটি কথা উল্লেখ করেন। সন্তানের কথাতে যখন তাঁহার এই প্রতীতি হইল যে, তাঁহার গৌরসুন্দর মানুষ নহেন, স্বয়ং ভগবান মানবাকারে তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার তাপিত ও দুঃখ-জর্জ্জরিত হৃদয়ে, শান্তির শিশিরবিন্দু কিয়ৎপরিমাণে নিপতিত হইল, আনন্দের রশ্মি ক্রীড়া করিতে লাগিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইলেও শচীদেবীর পুত্রবাৎসল্য চলিয়া যাইতে পারে না ; নিমাই তাঁহার সন্তান। গৌরের প্রবোধ বাক্যে ক্ষণকাল তাঁহার হৃদয় সুস্থ হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সন্তানের বিচ্ছেদ-কথা স্মরণ করিয়া দ্বিগুণতররূপে তাঁহার দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। গৌর পুনরায় নানাপ্রকারে সেই অনলে শান্তির বারি সিঞ্চন করিবার জন্য বলিলেন, "মা ! তুমি যখনই আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তখনই তোমার নিকট প্রকাশিত হইব, আমি যেখানে বসিয়া আহার করি, তুমি সেখানে আমার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন রাখিয়া, আমাকে স্মরণ করিবে।" সন্তান বিবিধ

প্রকারে তাঁহার দুঃখানল নিবৃত্তি করিতে প্রয়াস পাইলেন বটে, কিন্তু মাতৃস্নেহ কি সামান্য জিনিস? গৌরের প্রবোধ বাক্যে কি তাঁহার জননীর হৃদয়ের জ্বালা নিবারিত হইতে পারে? প্রতি নিমেষে নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা, তাঁহার স্মরণে উদিত হইয়া, ঘৃতাহুতির ন্যায় শোকের অনলশিখাকে অধিকতর প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

পতিপরায়ণা, লক্ষ্মীস্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর সন্ন্যাসের কথা স্মরণ করিয়া, যেন মৃতের ন্যায় গৃহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে, তাঁহার অঞ্চল সিক্ত হইতেছে। এদিকে বৃদ্ধা শচীদেবী শোকাভিভূতা হইয়া ভূতলশায়িনী হইয়া রহিয়াছেন। পুরন্দর মিশ্রের গৃহে সূর্য্যের জ্যোতিঃ ও চন্দ্রের বিমল স্নিগ্ধ কিরণ যেন বিষাদের ঘন মেঘে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার গৃহ নিরানন্দের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বিশ্বম্ভর জননীকে সান্ত্বনা দিয়া মনে বুঝিলেন, আবার প্রবোধ বাক্যে পত্নীর শোক অপনোদন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

রজনী সমাগত হইল। নবদ্বীপচন্দ্র ভক্তদিগের সঙ্গে কীর্ত্তনাদি করিয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, এবং আহারাদি করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বামী নিদ্রিত। তিনি সজল নয়নে তাঁহার চরণসেবা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্তস্পর্শে গৌরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া দেখিলেন, সুন্দরী সরলা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পদযুগলে আপনার সুকোমল হস্ত স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুখকমল মলিন; আর তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারে বারি নির্গত হইতেছে। তিনি ভাবিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করা বড় কঠিন সমস্যা; আর তরুণবয়স্কা যুবতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সংসারের অনিত্যতার কথা বুঝাইয়া তাঁহার চিত্তকে বৈরাগ্য প্রণোদিত করিয়া, স্বামিবিচ্ছেদে সুস্থির রাখিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা

চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি পত্নীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাঁদিতেছ কেন ?'

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি না সন্ন্যাসী হবে ?

গৌর। কে বলিল ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। লোকের মুখে শুনিতেছি, তুমি সন্ন্যাসী হবে। তুমি নবদ্বীপের গৌরব; তোমার জন্য আমি ভাগ্যবতী; তোমার গৌরবে আমি গৌরবান্বিতা। আমার জীবনে কত আশা ছিল; সে সকলই কি ভাঙ্গিয়া দিবে ? তুমি সন্ন্যাসী হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলে, তোমার ঐ রাঙ্গা চরণে কত কাঁটা বিঁধিবে ;—

এই সকল কথা বলিতে বলিতে তিনি স্বামীর ক্রোড়ের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গৌরসুন্দর তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া নানারূপ মিষ্টালাপে তাঁহার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করিতে যত্নবান হইলেন। গৌর বলিলেন, "তুমি কাঁদিও না, শোক পরিত্যাগ কর, আমি হরিনাম প্রচারের জন্য বাহির হইতেছি। আমি তোমাকে কখন ভুলিব না।" লোচনদাস বলেন, সেদিন শ্রীগৌরাঙ্গ পত্নীর নিকট শঙ্খ, চক্র গদাপদ্মধারী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সে-রূপ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, গৌর তাঁহার নিকট স্বামিরূপে প্রকাশিত হইয়া, বিবিধ উপদেশে তাঁহার ভগ্নহৃদয়ে ধর্ম্মবলের সঞ্চার করিতে যত্নবান হন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে কৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া, তাঁহাকে নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এবং সে-বিশ্বাসে তিনি সে-সময় কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রাণে শান্তিও লাভ করিয়াছিলেন। গৌর প্রেমভরে বলিলেন, "শুন বিষ্ণুপ্রিয়া ! কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া তুমি তোমার নামের সার্থকতা সম্পাদন কর।"

গৌর দেবতা হইলেও তিনি তাঁহার স্বামী। সতী-হৃদয়ে স্বামী

বিচ্ছেদের যন্ত্রণা অসহনীয়। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া, স্বামি-হৃদয়ের মহৎ বাসনা হৃদয়ঙ্গম করিলেও তাঁহার সংসার পরিত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া আকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। গৌর আবার মধুর বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তুমি যখনই আমাকে স্মরণ করিবে, নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তখনই তোমার নিকট উপস্থিত হইব।" তাই লোচন দাস, চৈতন্য মঙ্গলে বলিতেছেন,—

"শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তোরে কহিল হিয়া,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, আছয়ে তোমার ঠাঁই,
সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ়॥"

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন, তাঁহার স্বামী সামান্য মানব নহেন। ইনি ভগবানের অবতার, এমন স্বামীর আমি পত্নী; ইনি নরনারীর উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিতেছেন; আমি আর ইঁহার পথে বাধা দেই কেন?, আমার হৃদয় মন ভাঙ্গিয়া গেলেও ইঁহার জীবনের মহান্ ব্রতের অন্তরায় হইব না। এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি নীরবে সজলনেত্রে তাঁহার দেবসদৃশ স্বামীর চরণকমলে প্রণিপাত করিলেন। হৃদয়ের প্রবল শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া স্বামীর হৃদয়ে সন্তোষ উৎপাদনের জন্য, অবনত মস্তকে, ধীর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি যাহা ভাল মনে কর তাহাই কর।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহত্যাগ

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। লোকের মনে গৌরের সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা ক্রমে কিছু ম্লান হইয়া পড়িল। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া

এ-বিষয়ে আর কোন কথাই উত্থাপন করিতেন না; গৌরও এ বিষয়ের কোন কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগের মনে অশান্তি ও উদ্বেগের সঞ্চার করিতেন না। তিনি নিত্য শিষ্যবৃন্দের সঙ্গে কীর্ত্তনাদি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু গৌরের হৃদয়ে সন্ন্যাসগ্রহণের যে সঙ্কল্প উদিত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই ম্লান হইবার নহে। তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে যে অগ্নি প্রধূমিত হইতেছে, তাহা শীঘ্রই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

১৪৩১ শকের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন, গৌর নবভানু আকাশে উদিত হইতে না হইতেই, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন। হরিপ্রেমানুরাগী ভক্তগণ একে একে মিলিত হইতে লাগিলেন। যে সুরাপানে তাঁহারা অনুদিন মত্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, হরিকীর্ত্তনরূপ সেই সুধাপানে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন। নামরসে বিভোর হইয়া তাঁহারা মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনে যাপন করিলেন। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে, আহারাদির জন্য সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন, শচীনন্দনও গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি স্নান ও আহারান্তে আপন শয়নগৃহে ভার্য্যার সঙ্গে কিছু সময় হাস্য-পরিহাসে অতিবাহিত করিলেন। অপরাহ্ণে কিছু জলযোগ করিয়া অনুগত বিষ্ণু-ভক্ত সহচরদিগের সঙ্গে প্রসন্ন-সলিলা জাহ্নবীতটে গমন করিলেন। তথায় ভক্তগণ সঙ্গে আত্মার কল্যাণকারী হরিপ্রসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, গৃহে আগমন করিলেন। অনেকে তাঁহার অনুগমন করিলেন। গৌরসুন্দর গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলে, ভক্তগণ তাঁহার কণ্ঠে পুষ্পের মালা পরাইয়া দিলেন, ও তাঁহার অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত করিলেন। এই দিব্যকান্তিবিশিষ্ট যুবা পুরুষের সৌন্দর্য্য যেন আরো ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। গৌর প্রাণপ্রদ হরিপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মধুর কথামৃত সকলেই প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিল। সেদিন তাঁহার কথার মিষ্টতা যেন মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কমনীয় কান্তির ভিতর হইতে যেন

এক অপূর্ব্ব লাবণ্য বাহির হইতে লাগিল। সমবেত লোকেরা তাঁহার অমিয়মাখা কথা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণে জীবন সমর্পণ তাঁহার জীবনের শিক্ষা; যিনি নরনারীর দ্বারে দ্বারে হরিনাম ঘোষণা করিবেন; প্রাতঃসূর্য্য পশ্চিম গগনে উদিত হইতে না হইতেই যিনি পরমারাধ্যা জননী, প্রাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ও তাঁহার প্রাণসম গদাধর নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া কাটোয়া নগরে যাত্রা করিবেন, আজ সায়ংকালে সেই হরিগুণ কীর্ত্তনে রত হইবার জন্য তিনি সকলকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন। গৌর বলিলেন, "ভাই সকল, যদি আমার প্রতি তোমাদের কিছু ভালবাসা থাকে তাহা হইলে আমার এই কথা সর্ব্বদা পালন করিবে,—শ্রীকৃষ্ণ জগতের সার, তাঁহার চরণে সর্ব্বদা মতি রাখিবে। আর, কি ভোজনে, কি শয়নে, সর্ব্বদা তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিবে।"

এমন সময় তাঁহার ভালবাসার পাত্র তরকারী-বিক্রেতা শ্রীধর প্রভুর ভোজনের জন্য একটি লাউ হস্তে করিয়া আগমন করিল। গৌর তাহার সহিত দুই একটি কথা বলিয়া, তাহার প্রেমের উপহারের ফলটি গ্রহণ করিলেন। এমন সময় আর এক ব্যক্তি তাঁহার জন্য দুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত করিল। গৌর জননীকে দুগ্ধ দিয়া লাউয়ের পায়স প্রস্তুত করিতে বলিলেন। শচীদেবী তৎক্ষণাৎ পাকশালায় গমন করিয়া তাঁহার প্রাণের নিমাইয়ের জন্য পায়স প্রস্তুত করিলেন। রাত্রি অধিক হইলে, একে একে সমাগত ব্যক্তিরা আপনাপন গৃহে গমন করিতে লাগিল। সেদিন নিশাবসানে যে নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা কয়েকজন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। গৌর নিত্যানন্দকে সন্ন্যাস-যাত্রার সময় অবগত করিয়া, শচীদেবী আর কয়েকজনকে উহা জানাইতে অনুমতি করিয়াছিলেন। গৌরজননীর হৃদয়ের যাতনা স্মরণে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়।

গৌর আহারাদি সমাপন করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুকবি লোচন দাস বলেন, সে দিবস তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে মধুর আলিঙ্গনে ও প্রেমালাপে সুখী করিয়াছিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যিনি চিরদিনের জন্য সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পথের ভিখারী হইবেন, তৎপূর্ব্বে তিনি যেরূপ শান্ত ও প্রফুল্ল চিত্তে, জননীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও পত্নীর সঙ্গে প্রেমালাপে রত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে কি আর সামান্য মানব বলিয়া মনে হয়? এইরূপ ঈশ্বরপ্রেমিক ধৈর্য্যশীল স্বার্থত্যাগী নরপ্রেমিক লোকদিগকেই মানব নরলোকের অতীত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে—ঈশ্বরাবতার বলিয়া, তদীয় চরণে পূজোপহার প্রদান করিয়া থাকে।

গৌরসুন্দরের চক্ষে আজ আর নিদ্রা নাই। শচীদেবীও বাণবিদ্ধা মৃগীর ন্যায় গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়া ভূতলশায়িনী হইয়া ছট ফট করিতেছেন। সরলা বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝিতে পারেন নাই, যে, স্বামীর অদ্যকার প্রেমালিঙ্গন ও প্রেমালাপ চিরদিনের জন্য শেষ হইল। তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে, গৌরের পার্শ্বে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি আর চারি দণ্ড আছে। গৌর শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। কি এক মোহন রব তাঁহার কর্ণকুহরে সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতেছে; তিনি সে ধ্বনি শ্রবণে আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণের জন্য ভগবান তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন; তিনিই স্বয়ং বীণা বাজাইয়া নবদ্বীপচন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়া, সন্ন্যাসী করিতেছেন। গৌর শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন, দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন; আবার একটু পশ্চাৎপদ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। একবার মনে হইল, হায়, কিরূপে এ পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই? পরক্ষণেই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হইলেন।

দ্বারে শচীদেবী ভূতলশায়িনী হইয়া রহিয়াছেন; পুত্র চলিয়া যাইবার সময় চিরদিনের জন্য একবার সে চন্দ্রানন প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইবেন, এই তাঁহার বাসনা। গৌর শচীদেবীর নিকটে আসিলেন, আসিয়া বলিলেন, "মা! তুমি আমাকে খাওয়াইয়াছ পরাইয়াছ, বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছ, আমি তোমার ঋণ ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। মা! শ্রীকৃষ্ণই সংযোগ বিয়োগের কর্ত্তা; মানুষ স্বাধীন নয়। মা, আমি যেখানেই থাকি, তোমার সকল ভার আমার উপর।" এই কথা বলিয়া বিশ্বম্ভর জননীকে প্রদক্ষিণ করতঃ দ্রুতপদে বাটীর বহির্দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বহির্গত হইলেন। শচীদেবী সন্তানের সঙ্গে একটি কথাও কহিলেন না। সে শোকের গভীরতা এতই অধিক যে, তাঁহার বাক্যস্ফুরণের সামর্থ্য ছিল না। তিনি স্পন্দহীনের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

ধর্ম্মাচার্য্য ও ভক্ত কবি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুবিখ্যাত 'চৈতন্যের সন্ন্যাস' নামক কবিতা হইতে কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। শাস্ত্রী মহাশয় নিমাই-জননীকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন;—

"ওই গেল চলে পাগলের প্রায়;
জান না ত মাতা কে তাঁরে লওয়ায়!
উন্নত আকাশে খধূপ প্রকাশে
আপনার বেগে সে কি সেথা যায়?

প্রবল আগুন জ্বলেছে ভিতরে,
আর তারে হেথা কেবা রাখে ধরে?
তাই মহাবেগে যায় অনুরাগে,
পাপী জগতের পরিত্রাণ তরে।

ধরেছ জঠরে তাই বলে তারে,
পার কি রাখিতে আপন আগারে ?
যে কাজ সাধিতে আসা অবনীতে,
নিলেন ঈশ্বর সে কাজে তাহারে।

নদীয়াতে ছিল তোমার নিমাই,
আজি সে হইল পাপীদের ভাই ;
জগতের তরে সে যে প্রাণ ধরে,
বুঝিলে না মাতা কাঁদিতেছ তাই।”

ধর্ম্মাচার্য্যেরা অধিকাংশ স্থলে আপনাদিগের পুত্র ও আত্মীয় স্বজনাপেক্ষা শিষ্যদিগের সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন। গৌর যখন গৃহত্যাগ করিবেন, তখন শিষ্যেরা শুনিলেন, গদাধর ও হরিদাস তাঁহার সঙ্গের সাথী হইবার জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন । কিন্তু গৌর নিবারণ করিয়া বলিলেন, “কাহারও সঙ্গ আমি প্রার্থনা করি না, একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই আমার সঙ্গী।” সেই অখিলের একমাত্র স্বামীর প্রতি গৌরচন্দ্রের কি অটল বিশ্বাস, কি অপূর্ব্ব প্রেম !

যামিনী প্রভাত হইল। গৌর-শিষ্যেরা আসিয়া দেখিলেন, গৌর-জননী যেন মৃতবৎ গৃহ-প্রবেশ-দ্বারে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন-পথের নেতা ও তাঁহাদের পথপ্রদর্শক চলিয়া গিয়াছেন। অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া তখনও নিদ্রিতা। গৌরের সন্ন্যাসযাত্রার কথা শ্রবণ করিয়া এক একটি করিয়া লোক আগমন করিতে লাগিল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি বুঝিলেন, স্বামী চলিয়া গিয়াছেন। অন্তঃপুরবাসিনী, লজ্জাশীলা বিষ্ণুপ্রিয়া আজ লোকলজ্জায় বিসর্জ্জন দিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। ক্রমে

গৌর-সন্ন্যাসের সমাচার চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; বহুলোক ব্যথিত-হৃদয়ে আগমন করিতে লাগিল। জনতায় শচীভবন পূর্ণ হইয়া গেল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নব-প্রচারিত ভক্তি-ধর্ম্মের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহারাও আজ শোকাকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গৌরসুন্দরের অভাবে নবদ্বীপের সকল গৃহই যেন শোকাবরণে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এ-সময়কার বর্ণনা স্থলে, লিখিয়াছেন, গৌরাঙ্গ-শোকে কেহ কেহ অধীর হইয়া বলিতে লাগিল,—গৌর বিহনে এ জীবন ধারণে আর সুখ কি? চল, গৃহ দগ্ধ করিয়া আমরাও গৌর-পথ অনুসরণ করি।

হরিপ্রেমানুরাগী গৌরচন্দ্র প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে, গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাই ভক্ত শিবনাথ যেন সেই ছবি দর্শন করিয়া বলিতেছেন,—

"এদিকেতে গোরা নিজ বেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায়।
হরিগুণ গান করি পথে যান্,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়।

প্রিয় হরিনাম, ঘুষিব বিদেশে,
দ্বারে দ্বারে যাব ভিখারীর বেশে;
নিজে পায়ে ধরি ভজাইব হরি;
হরিনামে পাপী ঘুচাবে ক্লেশে।

এত বলি গোরা নদে ছাড়ি যায়,
নদে পুরী শোকে করে হায় হায়!

কারে কি যে কর জান হে ঈশ্বর !
দেখে শুনে কবি হত-বুদ্ধিপ্রায় ।”

এদিকে গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি পঞ্চজন শিষ্য, গুরুর তত্ত্বাবধান ও শরীর রক্ষা করিবার জন্য, দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ইঁহারা পথিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কেশব ভারতীর আশ্রমে

সন্ধ্যা হইয়াছে। সান্ধ্য-সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; পক্ষিগণ বৃক্ষোপরি আপনাপন কুলায়ে উড়িয়া যাইতেছে। রাখালেরা গরুর পাল লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। এমন সময়ে, গৌরসুন্দর সঙ্গীদিগের সহিত কাটোয়া নগরে কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কেশব ভারতী শিষ্যগণসহ শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া, আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। গৌর ভক্তির সহিত ভারতীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “প্রভো! অদ্য উত্তরায়ণ সংক্রমণ, আগামী কল্য আমাকে দীক্ষা দান করিয়া আমার সংসার-বন্ধন মোচন করুন।” ভারতী বলিলেন, “তোমার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের এখনও সময় হয় নাই; তুমি যুবা পুরুষ, পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। তোমার মা ও পত্নী তোমার এ কার্য্যের কি অনুমোদন করিয়াছেন? তুমি এখনও পুত্রমুখ দর্শন কর নাই। এ সঙ্কল্প

পরিত্যাগ কর।” কেশব ভারতীর নিকট হইতে এই নিরাশার কথা শ্রবণ করিয়া, গৌর ভারতীকে তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌর সংসারের সকল মায়া পরিত্যাগ করিয়া দ্বারে দ্বারে হরিপ্রেম বিলাইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন, কে তাঁহার গতিরোধ করিবে? তিনি হরিধ্বনি করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সুগায়ক মুকুন্দ প্রভুর নৃত্য দর্শন করিয়া মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সে মধুর গীত যেন বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় লোকের প্রাণ বিমোহিত করিতে লাগিল; মুকুন্দের সঙ্গীতে গৌরের অনাসক্ত ও ভাবপ্রবণ হৃদয়ে যেন প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল; তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, অবিরাম নৃত্য ও হরিধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত করিয়া তুলিলেন।

সংসারে ভগবৎ-প্রেমের এরূপ অপরূপ দৃশ্য আর কেহ কখন দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গের অপার্থিব মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি মনে করিলেন, আমি কাহাকে সন্ন্যাস গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছি, গৌর ত মানুষ নন, ইনি ত সাক্ষাৎ দেবতা। অবশেষে তিনি গৌরকে বলিলেন, “আমি তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিলাম, সেরূপ ভক্তি সাধারণ মানবে কখনও সম্ভব নহে। তুমি নরনারীর গুরু হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ; আমি তোমার গুরুর যোগ্য নহি। তবে ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য গুরুকরণ যে আবশ্যক, এই সত্যটা শিক্ষা দিবার জন্য তুমি আমাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে, আমার তাহাই বোধ হইতেছে।” শ্রীগৌরাঙ্গ কেশব ভারতীর কথা শ্রবণে বলিলেন, “আমাকে এমন ভাবে দীক্ষিত করিবেন যেন আমি শ্রীকৃষ্ণের চিরসেবক হইয়া দিন কাটাইতে পারি।”

ভক্তবৃন্দের আগমনে কেশব ভারতীর আশ্রম আজ স্বর্গপুরী

হইয়া উঠিল। সমস্ত রজনী সংকীর্ত্তনে কাটিয়া গেল। ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গকে লাভ করিয়া, অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। আজ দীক্ষার দিন। দিনমণি পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতে না হইতেই গৌর চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে দীক্ষার আয়োজন করিতে বলিলেন। শচীকুমার জননী ও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া কেশব ভারতীর আশ্রমে আগমন করিয়াছেন, এ বার্ত্তা ইতঃপূর্ব্বেই কাটোয়াতে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের কাটোয়া নগরীতে আগমনের সময়েই বহুসংখ্যক নরনারী ভারতীর আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এমন রূপবান যুবাপুরুষ, মাতা ও পত্নীকে বিষাদের অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া, সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করিবে, ইহা ভাবিয়া সকলেই অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে লাগিল।

আজ গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিবেন। তিনি মস্তকের চাঁচর কেশ ফেলিয়া দিবেন, গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। এই দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য প্রাতঃকাল হইতে দলে দলে পুরুষ ও নারী আগমন করিতে লাগিল। গৌরের ন্যায় চিত্তবিমোহন যুবাপুরুষ সন্ন্যাসী হইবেন, ইহা স্মরণ করিয়া, বহু-সংখ্যক নরনারী কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িল। কত লোকে তাঁহাকে এ পথ হইতে ফিরাইবার জন্য করুণ বচনে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। বয়ঃস্থা নারীগণ বলিতে লাগিল, "বাবা, তোমার মা স্ত্রী তোমার বিচ্ছেদে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? তুমি চলিয়া আসিবার পর হয় ত তাঁহারা আর জীবিত নাই।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাহাদের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তাহারা মনের কষ্টে কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে চন্দ্রশেখর আচার্য্য দীক্ষা-গ্রহণের যথাবিধি আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীক্ষার জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, অযাচিতরূপে সেই সকল দ্রব্য বহুল পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। দুগ্ধ,

দধি, চিনি প্রভৃতি বস্তুতে আশ্রমের গৃহ ও প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সহস্র সহস্র লোকের সমাগমে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেরই হৃদয় বিষাদে পূর্ণ; সকলেরই অশ্রুবারিতে বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতেছে। কিন্তু গৌরসুন্দর আপনার ভাবে বিভোর; তিনি আপনার হৃদয়-দেবতার মোহনমূর্ত্তি আপনার হৃদয়ধামে দর্শন করিয়া, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন করিতেছেন; ও কখন নৃত্য করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতেছেন।

বিশ্বম্ভরের মস্তক মুণ্ডন করিবার জন্য নাপিত আসিলে, চারিদিক ক্রন্দনের রবে পূর্ণ হইয়া গেল। এমন রূপবান যুবাপুরুষ মুণ্ডিত মস্তকে দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন, এ দৃশ্য স্মৃতিপথে উদিত হইলে, কাহার চক্ষু হইতে বারিধারা নির্গত না হয়? নবদ্বীপচন্দ্রের সেই দৃশ্য আজ দেখিতে হইবে বলিয়া, সকলের প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষৌরকার শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তক কিরূপে মুণ্ডন করিয়া দিবে, ইহা ভাবিয়া সেও কাঁদিয়া আকুল হইল, এবং ক্ষৌরকার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। পরে গৌরের অনুরোধে সে যখন ক্ষুর হস্তে করিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিতে বসিল, তখন জলধারায় তাহার চক্ষু অন্ধপ্রায় হইয়া আসিল। তাহার হস্ত কাঁপিতে লাগিল। এদিকে গৌরচন্দ্রও সুস্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না; 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কখন কাঁদিতেছেন, কখন নৃত্য করিতেছেন, কখন বা সেই মোহনমূর্ত্তি ধরিবার জন্য ধাবিত হইতেছেন। নাপিতও ক্ষুর হস্তে কিরূপে গৌররূপের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবে ভাবিয়া, অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। অপরদিকে গৌরও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে চঞ্চল; ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপে কাটিয়া যাইতে লাগিল, অবশেষে দিবাবসানে গৌর একটু স্থির হইয়া জীবনের মহাব্রত সাধনের জন্য, ক্ষৌরকারের সম্মুখে একটু স্থির হইয়া উপবেশন করিলে, ক্ষৌরকার পুনরায় যখন ক্ষুর হস্তে মস্তক মুণ্ডনে প্রবৃত্ত হইবে,

তখন ক্রন্দন করিতে করিতে সে বলিয়া উঠিল "আমি আজ যাঁহার মস্তকে হাত দিতেছি, আমি আবার এ হাত কার পায়ে দিব,—আমি একার্য্য আর করিতে পারিব না।" গৌর নাপিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি আজ হইতে ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়া, সেই নাম কীর্ত্তনে জীবন যাপন করিবে।"

তৎপর সে যখন শচীদেবীর নয়নমণি, বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনবল্লভ, রূপের আধার গৌরসুন্দরের চাঁচর কেশ মুণ্ডন করিতে আরম্ভ করিল, তখন নর-নারীর হৃদয়ভেদী ক্রন্দন-ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। নিত্যানন্দ ক্রন্দন করিতে করিতে ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বিলাপ ধ্বনির মধ্যে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। গৌর স্নানান্তে অরুণ বসন পরিধান করিলেন।

অল্পকাল পরেই গৌরচন্দ্র কেশব ভারতীর সমীপে সন্ন্যাসীর বেশে দীক্ষা গ্রহণের জন্য যখন উপবেশন করিলেন, তখন তিনি ভারতীকে বলিলেন, "আমি স্বপ্নে একটি মন্ত্র লাভ করিয়াছি, যদি সেই মন্ত্র আপনার নিকট ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ মন্ত্রেই আমাকে দীক্ষিত করিবেন।" দীক্ষার্থীর ভাবী গুরু উক্ত মন্ত্র শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইলে, গৌর ভারতীর কর্ণে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দীক্ষার পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ আচার্য্যকে অগ্রেই দীক্ষিত করিলেন। সেই স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র শ্রবণে ভারতীর হৃদয় যেন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া গেল; তিনি সেই মন্ত্রেই তাঁহাকে দীক্ষিত করিতে সম্মত হইলেন।

চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন প্রভৃতি তাঁহার গলদেশ পুষ্পমালায় পরিশোভিত করিয়া, তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবরণ দেহ চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া দিলেন। তাঁহার এক হস্তে দণ্ড ও অপর হস্তে কমণ্ডলু শোভা পাইতে লাগিল। কেশব ভারতী গৌরের সেই স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র দানেই তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। গৌরভক্তেরা উচ্চরবে সুমঙ্গল হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

নবজীবন লাভের সঙ্গে নূতন নামকরণ অনেক স্থলে প্রয়োজন হইয়া থাকে। কেশব ভারতী এই নবদীক্ষার্থীর, এই নবীন সন্ন্যাসীর একটি উপযুক্ত নামকরণের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভারতী দেখিলেন, যিনি তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন, ইনি মোহান্ধ জীব সকলের আত্মাকে জাগ্রত করিয়া, শ্রীহরির চরণানুরাগী করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য এই শুভদিনে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাখিলেন। ১৪৩১ শকাব্দে, মাঘমাসে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, বঙ্গদেশে ও ভারতভূমিতে মধুর হরিপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

দীক্ষাকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। তিনি দীক্ষাগুরুর চরণে ভক্তিভরে প্রণত হইলেন, এবং এক নব বলে বলীয়ান হইয়া হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতভূমিতে এক সুরসাল ভক্তি-ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন; এক নবযুগের সূত্রপাত করিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। কেশব ভারতী এই দীক্ষাকার্য্যে আপনাকে উপকৃত বোধ করিতে লাগিলেন। গৌর-হৃদয়ের ভগবৎপ্রেমের মধুর ও স্নিগ্ধ হিল্লোলে তাঁহার জীবনও শীতল হইতে লাগিল; ভক্তকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার চিত্তও ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া গেল; তিনি নবদীক্ষিতের সহিত হরিগুণ কীর্ত্তনে রত হইলেন। ভারতীর আশ্রমে সমস্ত রজনী নামসংকীর্ত্তনেই অতিবাহিত হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তিপুরে

পরদিন প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরুর চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, "আমি অরণ্যে গমন করিয়া তথায় আমার অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিব।" এই বলিয়া তিনি অরণ্যযাত্রায় উদ্যত হইলেন। কেশব ভারতী চৈতন্যের প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে অরণ্যে যাইয়া হরিনামামৃত পানে প্রাণ জুড়াইব।" ভারতীকে অগ্রগামী করিয়া, চৈতন্যদেব ও চন্দ্রশেখর আচার্য্য তাঁহার পশ্চাদনুবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে, গৌরচন্দ্র চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জননীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিতে বলিলেন। চন্দ্রশেখর নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইয়া শচীদেবীর ভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, গৌরজননী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভূতল-শায়িনী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি গৌরজননীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বিষহ শোকানল কে নিবারণ করিতে পারে? চন্দ্রশেখরের আগমনবার্ত্তা নবদ্বীপে প্রচারিত হইলে, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ শচীদেবীর ভবনে আগমন করিলেন, এবং গৌর-বিরহে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা এক দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, "তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর, দুই চারিদিন পরেই গৌর তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন।" এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন। এই সংবাদে শচী-মাতার শোকদগ্ধ হৃদয়ও কথঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি লাভ করিল।

এদিকে প্রভু ভক্তবৃন্দসহ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কেশব ভারতী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দও তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন হরিধ্বনি করিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিকের বায়ু যেন হরিনামে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার অমানুষিক দেবতুল্য পবিত্র মূর্ত্তি, সন্ন্যাসবেশ, অনুপম ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শন করিয়া, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কোন কোন স্থলে তিনি সমবেত লোকমণ্ডলীকে সংসারে অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী হইবার জন্য উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা রাঢ়দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাঢ়দেশের পর্ব্বত ও বৃক্ষলতাদির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া প্রভু বিমোহিত হইয়া গেলেন; এবং হরিবোল হরিবোল বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। কতকদূর গমন করিয়া বলিলেন, "আমি বক্রেশ্বরের আশ্রমে যাইব;—সেস্থান অরণ্যময়, সাধনের অনুকূল।"

সন্ধ্যা সমাগত হইলে যাত্রিদল যাইতে যাইতে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গৃহস্বামী তাঁহাদিগের যথোচিত সম্মান করিয়া আতিথ্য-সৎকার করিলেন। আহারান্তে আগন্তুকগণ সেইখানেই শয়ন করিলেন। নিত্যানন্দ নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া দেখেন, গৌর নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্যান্য সকলকে জাগ্রত করিলেন, এবং সকলে মিলিয়া গৌরের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহারা চারিদিকে ধাবিত হইতেছেন, এমন সময়ে ক্রন্দনের ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল; কণ্ঠস্বর, তাঁহাদিগেব প্রভুর কণ্ঠস্বর বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে তাঁহারা সেই দিকেই ধাবিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের প্রভুই অশ্রুসিক্ত নয়নে, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহার ভক্তিভাব দর্শনে তাঁহাদেরও ভাবোদয় হইল; তাঁহারাও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ দত্ত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রেমোন্মত্ত চৈতন্যদেব আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, পশ্চিমাভিমুখেই চলিতে লাগিলেন।

বক্রেশ্বরের আশ্রম আর চারি ক্রোশ আছে; এমন সময়, গৌর পশ্চিমাভিমুখ হইতে হঠাৎ পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন; এবং বলিলেন, "জগন্নাথ প্রভুর আদেশ হইয়াছে আমাকে নীলাচলে যাইতে হইবে।" ভক্তগণ তাঁহার কথা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহারা সকলেই উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলেন, পথে যাইতে যাইতে শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন, "কাহারও মুখে ত কৃষ্ণনাম শুনিতে পাইতেছি না!" এমন সময়ে দেখিলেন, পথিমধ্যে কয়েকজন রাখাল গাভী চরাইতেছে; তাহাদের মধ্যে একজনের মুখ হইতে হঠাৎ হরিধ্বনি শ্রবণে তাঁহার প্রাণ যেন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি রাখাল-বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখান হইতে গঙ্গা কত দূর? তাহারা বলিল, এক প্রহরের পথ। গঙ্গা দর্শন ও তাহাতে অবগাহন করিয়া শরীর শীতল করিব, এই আশায় তিনি প্রফুল্ল হৃদয়ে হরিধ্বনি করিতে করিতে সেই দিকেই ধাবিত হইতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত দেহে যাত্রিদল সন্ধ্যার সময় জাহ্নবী-তীরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জাহ্নবী দর্শনে পুলকিতচিত্তে তাহাতে অবগাহন ও গণ্ডূষ ভরিয়া সে বারি পান করতঃ শরীর মনের তৃপ্তি সাধন করিলেন।

পরদিবস গৌরভক্তগণ গৌরাঙ্গসহ নীলাচলাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তিনি নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে যাইতে আজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "তুমি নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীবাসাদি সকলকে বলিবে, আমি একবার শান্তিপুর হইয়া নীলাচল গমন করিব। এখন আমি ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের আশ্রমে গমন করিতেছি।"

নিত্যানন্দ গৌরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গমন করিলেন, এবং তথায় গমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রভুর ভবনে উপস্থিত হইলেন। আজ দ্বাদশ দিন হইল, গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসব্রত বঅলম্বন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ

গিয়া দেখিলেন, শচীদেবী সন্তানের সন্ন্যাসাবধি অনাহারে পড়িয়া রহিয়াছেন। এই নিদারুণ পুত্রশোকে ও দীর্ঘকাল অনশনে তাঁহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিত্যানন্দকে দেখিয়া, অপ্রকৃতিস্থা নারীর ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন। নিতাই এখন শচীদেবীর প্রাণে একটু আনন্দের সঞ্চার করিলেন, তিনি বলিলেন, "নিমাই শীঘ্রই শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে আসিবেন, আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাইব।" নিত্যানন্দকে তিনি পুত্রসম স্নেহ করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে গৌর শান্তিপুরে আসিবেন, এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, যেন তাঁহার মৃত শরীরে নবজীবনের সঞ্চার হইল; তাঁহার শোকাভিভূত হৃদয় এই আনন্দের সমাচারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। যিনি এতদিন পুত্র বিরহে ভূতলশায়িনী হইয়া অনশনে কালযাপন করিতেছিলেন, তিনি আজ পাকশালায় গমন করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিত্যানন্দকে আহার করাইলেন, এবং নিজেও আহার করিয়া পুত্রমুখ দর্শনাভিলাষে শান্তিপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকার বলেন, চৈতন্য বৃন্দাবন যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করাতে, নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া জাহ্নবীর তীরে আনিয়া, উহাকে যমুনা বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং সেই সময় কোন লোকের দ্বারা শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট প্রভুর আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। অদ্বৈত লোকমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ গঙ্গা পার হইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং গৌরকে শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া শান্তিপুরে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন।

নিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে আগমন করিয়া প্রভুর আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তিনি প্রথমে ফুলিয়া হইয়া শান্তিপুরে গমন করিবেন, নিত্যানন্দ ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গঙ্গা

পার হইয়া ফুলিয়ার দিকে যাত্রা করিল। ফুলিয়া গ্রাম শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী। সহস্র সহস্র লোক নৌকা করিয়া যখন গঙ্গা পার হইতে লাগিল এবং হরিধ্বনিতে চারিদিক বিকম্পিত করিতে লাগিল, তখন গঙ্গাবক্ষে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ নৌকা না পাইয়া সন্তরণে নদী পার হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য ফুলিয়া হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং আচার্য্যের চরণে প্রণত হইয়া, চক্ষের জলে সে চরণ ধৌত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যও কাঁদিতে কাঁদিতে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া নবীন সন্ন্যাসীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। সে সময় অদ্বৈতের একটি পুত্র, সেই স্থলে ক্রীড়া করিতেছিল; তাহার নাম অচ্যুত। তাহার কোমল অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। সেও ছুটিয়া আসিয়া গৌরচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিল। গৌর তাহাকে বলিলেন, "অচ্যুত! আচার্য্য তোমার পিতা, সে সম্বন্ধে তুমি আমার ভাই হইলে।"

এদিকে নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি গৌরের অনুগত ভক্তগণ, শচী-দেবীকে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে উপস্থিত হইলেন। জননী সন্তানের মুণ্ডিত মস্তক ও সন্ন্যাসি-বেশ দর্শন করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মাতৃভক্ত গৌর মাতৃ-চরণে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিলেন; তাঁহার অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শচী স্নেহভরে পুত্রের বদনে ও গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অদ্বৈত অতিথিদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাদের আহারের বিবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন; এবং তদীয় পত্নী সীতাদেবীসহ, যাহাতে কাহারো যত্নের ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন।

বেলা অধিক হইল। সকলে গৌরচন্দ্রকে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে সকলে ফিরিয়া আসিলে, আহারের আয়োজন হইল। আচার্য্য নানারূপ ব্যঞ্জন পিষ্টকাদি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সকলে বসিয়া

পরম আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আচার্য্য ভবনে বাস করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদিতে সময় অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশ দিন কাটিয়া গেল; শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে আর কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেও তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না।

গৌর নীলাচল যাইবেন যখন স্থির হইল, তখন শচীদেবী কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি জননীকে বলিলেন, "মা! তুমি আমার জন্য চিন্তা করিও না, আমি নীলাদ্রিতে থাকিলে, তুমি মধ্যে মধ্যে আমার সংবাদ পাইবে।" এই প্রকার নানারূপ মধুর বচনে তাঁহার প্রাণে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলাচল-যাত্রা

শান্তিপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচল যাত্রা করিলেন। তাঁহার বিচ্ছেদ সকলের অসহনীয় হইয়া পড়িল; সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলেন। চৈতন্যদেব সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কাহার নিকটে কি আছে বল? পথের সম্বলের জন্য তোমাদের কেহ কি কিছু দান করিয়াছেন?" সকলেই বলিলেন, "তোমার বিনা অনুমতিতে, কোন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিতে কাহার সাধ্য আছে?"

তাঁহার প্রতি শিষ্যদিগের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক অনুরাগের পরিচয় পাইয়া শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পরম বৈরাগী, বিশ্বাসীর চূড়ামণি ও ভক্তদিগের শিরোভূষণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তখন ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সেই বিশ্বনিয়ন্তাই আমাদের অন্নজলবিধাতা। যদি অদৃষ্টে থাকে, অরণ্যে বাস করিলে সেখানেও খাদ্য মিলিয়া থাকে, আর পরমেশ্বর যদি অন্ন না যোগান তাহা হইলে রাজপুত্র হইলেও উপবাস থাকিতে হয়; কারণ গৃহে তাহার আহারের বহুবিধ সামগ্রী থাকিলেও হয় ত সে কোন কারণে কাহারো সহিত বিবাদ করিয়া ক্রোধভরে 'আমি ভাত খাব না,' বলিয়া, উপবাসী থাকে। অথবা আহারের সকল বস্তু প্রস্তুত থাকিলেও হঠাৎ জ্বররোগে দেহ আক্রান্ত হইয়া পড়ে, আহার বন্ধ হইয়া যায়। তিনিই সর্ব্বত্র অন্নছত্র খুলিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছা হইলে, মানুষ সর্ব্বত্র আহার পাইয়া থাকে।" পথে আনন্দিত মনে চলিতে চলিতে চৈতন্যদেব শিষ্যবৃন্দকে এইরূপে ভগবানের প্রতি অটল নির্ভরের কথা বলিয়া, তাঁহাদিগের চিত্তকে সুদৃঢ় করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন।

যাত্রিদল সানন্দে গুরুদেবের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে করিতে আঠিসারা (১) নামক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে গ্রামে অনন্ত পণ্ডিত নামে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পরিব্রাজকেরা তাঁহার আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সাধু অনন্ত পণ্ডিত, চৈতন্যদেবের ন্যায় ব্যক্তি তাঁহার ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন দেখিয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, এবং যথাবিধানে সকলের পরিচর্য্যা

(১) আঠিসারা—২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর নামক স্থানের নিকট আটঘরা নামক একটি স্থান আছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বোধ হয়, এই স্থানটিকেই আঠিসারা নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

করিলেন। চৈতন্যচূড়ামণি সমস্ত রজনীই কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস গঙ্গার উপকূল দিয়া সশিষ্যে ছত্রভোগের দিকে যাত্রা করিলেন। ছত্রভোগে (১) গঙ্গা শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন। এখানে আম্বূলিঙ্গ নামে একটি ঘাট আছে। প্রবাদ এই, ভগীরথ যখন গঙ্গাকে লইয়া যান, তখন শিব তাঁহার বিরহে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার দর্শন লালসায় বহির্গত হইয়া ছত্রভোগে আসিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। শঙ্কর দেখিলেন, প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী-দেবী কল কল নিনাদে প্রবাহিতা হইতেছেন। তিনি গঙ্গাদেবীর এই অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অনুরাগভরে তাঁহার মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। জাহ্নবীও প্রসন্নচিত্তে মহাদেবকে গ্রহণ করিলেন। শঙ্করের দেহ গঙ্গাবক্ষে সলিলরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই স্থলেই শিবদেহ জাহ্নবী দেহে একীভূত হইয়াছিল বলিয়া, এই স্থান আম্বুলিঙ্গ ঘাট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যাত্রিদল ছত্রভোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রেমিক চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য আম্বুলিঙ্গ ঘাটে গঙ্গাদেবীর এই মনোহর সৌন্দর্য্য অবলোকন এবং এ স্থানের পৌরাণিক কাহিনী স্মরণ করিয়া, আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মধুর ও উচ্চকণ্ঠে 'হরি হরি' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বায়ুর আঘাতে বৃক্ষ যেমন ভূতলে নিপতিত হয়, গৌরও প্রেমাবেশে সেইভাবে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠের সঙ্গে শিষ্যবৃন্দের কণ্ঠও মিশ্রিত হইয়া হরি নামের কোলাহলে সে স্থান পূর্ণ করিয়া তুলিল। শ্রীচৈতন্য শতপথবাহিনী গঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহন করিলেন, তাঁহার নয়নে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। সে মুখের জ্যোতিঃ দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তিধারা প্রবাহিত হয়।

---

(১) ছত্রভোগ—এই গ্রামটি জেলা ২৪ পরগণার মধ্যে, জয়নগর-মজিলপুর হইতে ২৷৩ ক্রোশ দক্ষিণে।

. শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আম্বুলিঙ্গঘাটে হরিনামে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, নৃত্য, কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে, ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র খান দোলারোহণে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব ভক্তির লক্ষণ দর্শন করিয়া. দোলা হইতে অবতরণ করিলেন, এবং ভক্তিভরে তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" রামচন্দ্র খান তৎক্ষণাৎ উঠিয়া করযোড়ে বলিলেন, "আমি আপনার দাসানুদাস।" উপস্থিত লোকেরা রামচন্দ্র খানের পরিচয় দিয়া বলিল, "ইনি এখানকার রাজা।" চৈতন্যদেব তাঁহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "তুমি এস্থলের অধিকারী, ভালই হইয়াছে; কিরূপে নীলাচলে নীলাদ্রিচন্দ্রকে দর্শন করিব, তাহাই বলিয়া দাও।" রামচন্দ্র খান বলিলেন, "আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহা অবশ্য পালন করিব। তবে এখন নীলাচলের পথ বড় বিপদসঙ্কুল; উৎকলের সহিত বঙ্গদেশের যুদ্ধ বাধিয়াছে। রাজারা স্থানে স্থানে ত্রিশূল পুতিয়াছে, দস্যুরা পথিকের অর্থাদি লুণ্ঠন করিয়া তাহার জীবন নাশ করিয়া থাকে। তথাপি আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া আপনাদিগকে অদ্য রাত্রে তথায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।" রামচন্দ্র খানের এই কথা শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। সে দিন রামচন্দ্র খান কোন ব্রাহ্মণের আশ্রমে তাঁহাদিগের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গৌর যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া আচমনান্তে, ব্যাকুল হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'শ্রীক্ষেত্র এখান হইতে কতদূর ?' প্রভুর ভাবাবেশ দর্শন করিয়া মুকুন্দ দত্ত সুস্বরে সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। চৈতন্য একে নিরন্তরই প্রেমানন্দে বিভোর; তাহার উপর নীলাদ্রি যাত্রা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; শ্রাবণের ধারার ন্যায় যেন তাঁহার অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; এইরূপে রাত্রি তৃতীয় প্রহর কাটিয়া গেল। এমন সময়ে রামচন্দ্র খান আসিয়া বলিলেন, "প্রভো, আপনাদের জন্য নৌকা

আসিয়াছে।” চৈতন্যদেব হরিধ্বনি করিতে করিতে, সশিষ্যে নৌকারোহণ করিলেন। স্রোতস্বিনীর উপর দিয়া মাঝিরা নৌকা বাহিয়া চলিল। চৈতন্যচন্দ্রের আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি মুকুন্দকে গান গাহিতে বলিলেন। মুকুন্দ সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন, অপরাপর ভক্তগণও মহোল্লাসে মুকুন্দের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

নৌকা চলিতে লাগিল। কিন্তু মাঝিরা আরোহীদিগের সংকীর্ত্তনে বড় ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, “এবার আর আমাদের জীবনের আশা নাই। কূলে জঙ্গলের মধ্যে বাঘ ঘুরিতেছে, জলে কুম্ভীর বাস করিতেছে, আর ডাকাইতেরা আরোহীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য জলপথে গোপনে বিচরণ করিতেছে। যে পর্য্যন্ত আমরা উড়িষ্যা দেশে না যাই সে পর্য্যন্ত আর কীর্ত্তন করিবেন না।” মাঝিদিগের নিকট হইতে এই আশঙ্কার কথা শ্রবণ করিয়া, সকলের রসনা নীরব হইল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ কোন ভয়ে ভীত হইবার নহেন। তিনি সকলকে নীরব হইতে দেখিয়া, হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “সম্মুখে সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছে, তাহা কি দেখিতে পাও না? এই চক্র বৈষ্ণবের সকল বিঘ্ন হরণ করিয়া থাকে। কোন ভয় নাই, নির্ভয়ে হরিনাম সংকীর্ত্তন কর।”

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন্ত বিশ্বাসের কথায় তাঁহার ভক্তদিগের হৃদয় হইতে ভীতির মেঘরাশি যেন বায়ু প্রবাহে উড়িয়া গেল। তাঁহারা জীবন্ত বিশ্বাসে ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন, এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত সকলে সর্ব্বভয়হারী হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাঝিরা বুঝিল, পরম রূপবান নবীন সন্ন্যাসী নরদেহী হইলেও সামান্য মানব নহে।

শ্রীচৈতন্য এইরূপে শিষ্যসহ কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া গঙ্গাবক্ষ দিয়া যাইতে যাইতে উৎকল প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। মাঝিরা প্রয়াগঘাটে তরী সংলগ্ন করিলে, মহাপ্রভু সদলে কূলে অবতরণ করিলেন, এবং শিষ্যদিগকে বসিতে বলিয়া, ভিক্ষার্থ গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি

যখনই যে গৃহীর দ্বারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তখনই সেই পরিবারস্থ লোকেরা তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল ও বিবিধ আহার্য্য সামগ্রী প্রদান করিতে লাগিল। চৈতন্য ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া প্রিয় সঙ্গীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে আশাতীত খাদ্যবস্তু দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন, এবং সহাস্য বদনে বলিতে লাগিলেন, প্রভো, আপনি আমাদের পোষণ করিতে পারিবেন, দেখিতেছি। ভক্তদলের মধ্যে জগদানন্দ সেদিনকার পাককার্য্য সমাধা করিলে, হরিধ্বনি সহকারে পরমানন্দে প্রভুর সঙ্গে সকলে ভোজন করিতে বসিলেন। সে দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা সমস্ত নিশা কীর্ত্তনানন্দে যাপন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে, যাত্রিদল পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা এক খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন। ঘাটে কড়ি না দিলে মাঝি কাহাকেও পার করে না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সেখানে উপস্থিত হইলেন, তখন মাঝি তাঁহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, তাঁহাকে বিনামূল্যে পার করিতে প্রস্তুত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে ক'জন লোক আছে?" নবীন সন্ন্যাসী বলিলেন, "এ জগতে আমার কেহ নাই, এবং আমি কাহারও নই; আমি একা, অথচ সকলেই আমার।" মাঝি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিঃসঙ্গ মনে করিয়া বলিল, "ঠাকুর, তুমি নৌকায় উঠ; তোমাকে বিনা কড়িতে আমি পারে লইয়া যাইব; আর সকলের মূল্য না পাইলে পার করিব না।" এই বলিয়া, নবীন সন্ন্যাসীকে সে পরপারে লইয়া গেল। এদিকে তাঁহার সঙ্গীরা প্রভুর লীলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া একটু চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমরা কিছুই চিন্তা করিও না; প্রভু আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করিয়া

যাইবেন না।" এমন সময় মাঝি আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিল, "তোমরা ত আর সন্ন্যাসী নহ, তোমরা উচিতমত মূল্য দাও, তবে তোমাদের পার করিব।"

গৌর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী; কিন্তু তাঁহার প্রাণ কোমলহৃদয়া নারীর ন্যায়। তিনি পরপারে যাইয়া একটা স্থানে উপবেশন করতঃ মস্তক নত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন, সে অশ্রুপূর্ণ লোচন দর্শন করিয়া মাঝির প্রাণ গলিয়া গেল। সে চৈতন্যের সঙ্গীদিগের নিকটে আসিয়া বলিল, 'উনি ত সামান্য লোক নহেন, তোমরা কে? কাহার লোক আমাকে ভাঙ্গিয়া বল দেখি।' নিত্যানন্দ প্রভৃতি চৈতন্য-শিষ্যেরা বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম শুনিয়াছ? উনিই সেই; আমরা উঁহার ভৃত্য।" তখন আনন্দে ও বিস্ময়ে মাঝির হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল; তাহার দুই চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে লইয়া পার করিয়া দিল। সে বহু পুণ্যফলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শন লাভ করিল, মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরের চরণে প্রণত হইয়া বলিল, "প্রভো! তোমার দর্শনে আমি আজ কোটি জন্মের পুণ্যফল লাভ করিলাম, হে করুণার অবতার! আমি তোমার চরণে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তুমি আমার সে সকল অপরাধ ক্ষমা কর।" শ্রীচৈতন্য মাঝিকে কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগী হইতে বলিয়া, সশিষ্যে আবার তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

যাত্রিদল চলিতে চলিতে কয়েকদিন পরে সুবর্ণরেখা নদীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্রোতস্বিনী সুবর্ণরেখার (১) জল অতীব নির্ম্মল। শ্রীচৈতন্য, সঙ্গিগণসহ এই নির্ম্মল বাহিনীতে অবগাহন করিলেন। স্নানান্তে তিনি নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া

(১) সুবর্ণরেখা—মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়া এই নদীটি প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি প্রসিদ্ধা নদী।

চলিলেন ; এবং কিয়দ্দূর গমনানন্তর একটা স্থানে বসিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী শিষ্যদিগের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ, তাঁহাকে পথের মধ্যে কোন স্থানে বসিতে বলিয়া ভিক্ষার্থ পল্লীর মধ্যে গমন করিলেন। জগদানন্দ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসদণ্ড বহন করিতেন। তিনি ভিক্ষায় যাইবার সময় নিত্যানন্দ দণ্ডখানি হস্তে করিয়া তাঁহার মনে কি এক ভাবের উদয় হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন, "দণ্ড! আমি যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করি, তিনি তোমাকে বহন করিবেন?" এই বলিয়া তিনি প্রভুর দণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। জগদানন্দ ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, ভগ্নদণ্ড দেখিয়া, নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভুর দণ্ড কে ভঙ্গ করিয়াছে?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "প্রভুর দণ্ড প্রভুই ভাঙ্গিয়াছেন।" জগদানন্দ, আর কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া, ভগ্নদণ্ড হস্তে করিয়া প্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য ভগ্নদণ্ড দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দণ্ড কে ভাঙ্গিয়াছে?" জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভো, নিত্যানন্দ আপনার দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন।" শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে দণ্ড ভাঙ্গিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "বাঁশখান ভাঙ্গিয়াছি, এতে আমার প্রতি যেরূপ শাস্তি বিধান করা কর্ত্তব্য মনে কর, তাহাই কর।" নিত্যানন্দের বাক্য শ্রবণে শ্রীচৈতন্য অধিক কিছু না বলিয়া এই মাত্র বলিলেন, "যাহাতে সর্ব্বদেবতার অধিষ্ঠান, তুমি তাহাকে কেবল বাঁশখণ্ড বলিলে?" এটি তাঁহার সন্ন্যাস-দণ্ড, দীক্ষার সময় কেশব ভারতীর আশ্রমে গৌর উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য দুঃখিতান্তকরণে সকলকে বলিলেন, "আমার আর কাহারো সঙ্গ আবশ্যক নাই ; হয় তোমরা অগ্রে যাও, না হয় আমি অগ্রে গমন করি।" তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যেরা বড়ই দুঃখিত হইলেন ; কিন্তু প্রভুর কথার কোন প্রতিবাদ করা তাঁহারা গর্হিত কর্ম্ম বলিয়াই মনে করিতেন। এই জন্য

মুকুন্দ দত্ত বলিলেন, "তুমিই অগ্রে যাও,আমরা তোমার পশ্চাতে যাইতেছি।" শ্রীচৈতন্য মুকুন্দের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভাল তাহাই হইল", এই বলিয়া, তিনি নৃত্য করিতে করিতে একবারে জলেশ্বর (১) গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে শিবের মন্দির আছে। চৈতন্যদেব যখন আগমন করিলেন,তখন বাদ্যধ্বনি সহকারে তথায় শঙ্করের পূজা হইতেছিল। তিনি তথায় গমন করিয়া, সেই বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্য ও ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, প্রভু উন্মত্তপ্রায় হইয়া নৃত্য করিতেছেন ; সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য মুকুন্দের সঙ্গীতে সঙ্গীদিগের আগমন-সমাচার বুঝিতে পারিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। নিত্যানন্দকে ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, তুমি সে বিষয়ে সহায় হইবে, তাহা না করিয়া তুমি আমায় পাগল করিতে চাও ? আর যদি কখন এরূপ কর, তবে তুমি আমার মাথা খাও।" গৌর নিত্যানন্দকে এত ভালবাসিতেন যে, তিনি তৎকালে সকলের সমক্ষে বলিলেন, "নিত্যানন্দ আমার দেহ অপেক্ষাও বড়, তাহার প্রতি যাহার ভাল ভাব নাই, সে ব্যক্তি আমার ভক্ত হইলেও, আমার ভালবাসার পাত্র হইবার উপযুক্ত নয়।"

তাঁহারা সে দিবস জলেশ্বরে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথিমধ্যে বাঁশধা নামক স্থানে একজন শাক্তধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হয়, চৈতন্যদেব তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করেন। সন্ন্যাসী তাঁহার বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, "আমার

---

(১) জলেশ্বর—উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি প্রাচীন সহর।

মঠে চল, সেখানে সকলে মিলিয়া আজ আনন্দ করিব।” শ্রীচৈতন্য জানিতেন, শাক্তেরা সুরাপানে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। তিনি শাক্ত সন্ন্যাসীর সেই অভিপ্রায় বুঝিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আপনি অগ্রে গমন করিয়া ব্যবস্থা করুন, আমরা পরে যাইতেছি।” সন্ন্যাসী হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে ত্বরিতপদে মঠে গমন করিলেন। কোন বৈষ্ণব লেখক বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত ধর্ম্মালোচনায় ও তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে শাক্ত সন্ন্যাসীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শাক্তকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিয়া, গৌরসুন্দর রেণুমাগ্রামে আসিলেন, এবং গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন, এবং নৃত্য ও কীর্ত্তনাদি করিয়া, কয়েকদিন ভ্রমণানন্তর যাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যাজপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি রমণীয়। এখানে বৈতরণী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তরুরাজি চারি দিকে শোভা পাইতেছে। গৌরসুন্দর নদীতে স্নান, ভক্তদিগের সঙ্গে দেবমন্দির দর্শন ও নাম সংকীর্ত্তনাদিতে সময় অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিল। ভক্তেরা প্রভুকে আর দেখিতে পান না। তাঁহারা চারিদিকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, “তিনি দেবমন্দির সকল দর্শন করিতেছেন, আমাদের কোন চিন্তার আবশ্যক নাই, আগামী কল্যই তিনি আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবেন।” তাঁহারা নিত্যানন্দের বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা রন্ধন করিয়া আহারাদি করিলেন। কিন্তু যিনি নিকটে না থাকিলে, তাঁহাদের হৃদয় জ্যোতিহীন হইয়া পড়ে, সেই গৌরসুন্দরকে না দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় যেন ম্লানভাব ধারণ করিল। সেদিন এইরূপেই কাটিয়া গেল।

এদিকে ভাবুকহৃদয় শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাজপুরের দেবমন্দির সকল দর্শন করিবার জন্য একাকী হইয়া পড়েন। তিনি

মন্দিরে দেবদেবী দর্শন ও সাধু সন্ন্যাসীদিগের সহিত কথোপকথনে সে-দিবস যাপন করিয়া, পরদিবস, তাঁহার সঙ্গীদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিয়া, হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যাজপুর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কয়েকদিন ভ্রমণানন্তর কটক সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে স্বচ্ছসলিলা মহানদী দর্শনে গৌরসুন্দরের হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি উহাতে স্নানাবগাহন ও মন্দিরে দেবাদি দর্শন করতঃ, শিষ্যগণসহ ভুবনেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভুবনেশ্বরের অন্য নাম গুপ্তকাশী। এখানে গৌর বিন্দু সরোবরে (১) অবগাহন ও শিব দর্শন করিয়া, সদলে কমলপুরে গমন করিলেন।

কমলপুর (২) হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়ার উপরিস্থিত ধ্বজা দর্শন করা যায়। শ্রীচৈতন্য সেই ধ্বজা দর্শন করিয়া যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন, তিনি ভাবে ও আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, ভাগবতের এই শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইতে লাগিলেন।

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো,
মামালোক্যস্মিত সুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥

যাহার বদন বিকশিত পদ্মের ন্যায়, সেই বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ আমাকে

(১) বিন্দুসরোবর—ভুবনেশ্বরে।

যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে,—
"তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী-বাসে যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দু সরোবরে শিব সৃজিলা আপনি॥"

(২) কমলপুর—পুরীর মধ্যে। এথান হইতে জগন্নাথদেবের মন্দির-চূড়া দেখা যায়।

দর্শন করিয়া মৃদু মধুর হাস্তে, শ্রীবদনের শোভা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদের উপরি মদীয় পুরোভাগে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।”

এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি যখন চলিতে লাগিলেন তখন তাঁহার প্রাণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িল, তাঁহার চক্ষু হইতে অনর্গল বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল; তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; এবং অনুরাগভরে ভূতলে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। চারিদিকের লোক এই অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসীর মধ্যে ভক্তির এই অভিনব ব্যাপার দর্শন করিয়া, বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা বলিতে লাগিল, “এমন ভক্তির লক্ষণ কোন মানবে ত দেখা যায় না; ইনিই নারায়ণের অবতার।” ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্য এইরূপে ভক্তজন পরিবেষ্টিত হইয়া আঠারোনালায় (১) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া, তিনি স্থির হইয়া উপবেশন করিলেন। জগন্নাথ দর্শনে তিনি আজ মনের বাসনা পূর্ণ করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত বহিতে লাগিল; তিনি প্রেম গদগদভরে সঙ্গীদিগকে বলিলেন, “তোমরা আমাকে এখানে আনিয়া যথার্থই বন্ধুর কার্য্য করিলে। এখন তোমরাই অগ্রে যাইবে, না আমিই যাইব, বল।” মুকুন্দ দত্ত, বলিলেন, “তুমিই অগ্রে যাও; আমরা পরে যাইতেছি।”

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ত্বরিত গতিতে পুরুষোত্তমে যাইয়া জগন্নাথ দর্শনার্থ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। নীলাদ্রিনাথ দর্শনে তাঁহার ভাবসিন্ধু দ্বিগুণতর উথলিয়া উঠিল। সে প্রেম, সে ভক্তি, সে ব্যাকুলতা বর্ণনাতীত। তিনি জগন্নাথের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে বক্ষে গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। ঈদৃশ কার্য্য দেব-মন্দিরের

(১) আঠারোনালা—পুরীর মধ্যে ইহা একটি ক্ষুদ্র নদী। ইহার উপর একটি সাঁকো আছে।

বিরুদ্ধ বলিয়া পাণ্ডারা তাঁহার গতিরোধ করিতে ও তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

সুবিখ্যাত রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেই সময় মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই নবীন যুবার প্রবল ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়া, ইঁহাকে সামান্য মানব বলিয়া মনে করিলেন না। যখন পাণ্ডারা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চৈতন্যকে প্রহারোদ্যত হইল, তখন সার্ব্বভৌম "হাঁ হাঁ" শব্দে তাহাদিগকে এ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। এদিকে দিগ্বিজয়ী জয়ী নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ দর্শনে ভক্তিতে বিভোর হইয়া ভূতলে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। সার্ব্বভৌম সে মূর্চ্ছা অপনোদনের জন্য যত্ন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে তাঁহার ভবনে লইয়া যাইবার জন্য পরিহারিদিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা শ্রীচৈতন্যকে সেই অচৈতন্যাবস্থায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে বহন করিয়া লইয়া গেল।

এদিকে গৌরচন্দ্রের সঙ্গীরা পুরীতে প্রবেশ করতঃ, জগন্নাথদেবের মন্দিরে আসিয়া শুনিলেন, একজন গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ মন্দিরাভ্যন্তরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ঘটনার বিষয় তাঁহারা সকলই বুঝিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক আপনার ভবনে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, প্রভু তখনও মূর্চ্ছিতাবস্থায় শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন; এই মূর্চ্ছিতাবস্থাতে সঙ্গীতের ধ্বনি গৌরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীকে আলোড়িত করিতে লাগিল। মধুর হরিকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চৈতন্য লাভ করিলেন।

শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তি দাঁড়াইতে পারে না। ধার্ম্মিকদিগের হৃদয় স্বভাবতই

বড় কোমল। তাঁহারা রসজ্ঞ। এই জন্য কবি-হৃদয়ের সহিত ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ের যেন এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তেরা স্বভাবতই বড় সঙ্গীতপ্রিয়। তাঁহারা মধুর সঙ্গীতে আত্মহারা হন্, আবার সঙ্গীতেই যেন চেতনা লাভ করেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই, ইউরোপের সুবিখ্যাত মার্টিন লুথার একবার প্রার্থনা করিতে করিতে, ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, আশ্রমস্থিত সন্ন্যাসীরা অন্য কোন উপায়ে যখন তাঁহাকে চেতনা দান করিতে পারিলেন না, তখন উঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি একটি সঙ্গীত ধরিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, লুথার বড় সঙ্গীতপ্রিয়। গায়ক গান গাহিতে গাহিতে লুথার চেতনা লাভ করিলেন। ভক্ত হৃদয়ের রহস্য সকল স্থলেই যেন একরূপ দেখা যায়।

এ দিকে অতিথিদিগের সেবার যাহাতে কোনরূপ ত্রুটী না হয়, তদ্বিষয়ে সার্ব্বভৌম বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। আগন্তুকদিগের জন্য বিবিধ অন্ন. ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইল। স্নানান্তে তাঁহারা একত্রে আহার করিতে বসিলেন। সার্ব্বভৌম স্বয়ং পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য নবাগত ব্যক্তিদিগের জন্য স্বতন্ত্র বাসার ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার শ্যালক গোপীনাথকে তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। শ্রীচৈতন্য ও তদীয় সঙ্গীরা আহারান্তে নূতন বাসায় গমন করিলেন। গোপীনাথ তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সার্ব্বভৌমকে ভক্তিদান

গোপীনাথ একদিন মুকুন্দকে লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে বলিলেন, "নবীন সন্ন্যাসীর রূপ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার মন বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছে।" তৎপর তিনি গোপীনাথকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, গোপীনাথ বলিলেন, "ইনি নবদ্বীপের পুরন্দর জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র; ইঁহার নাম বিশ্বম্ভর।" এইরূপে তিনি বিশ্বম্ভরের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দান করিলেন। সার্ব্বভৌম বিশ্বম্ভরের পরিচয় পাইয়া বলিলেন, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতা বিশারদের সমপাঠী ছিলেন।" সার্ব্বভৌম বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়া, গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কোন্ সম্প্রদায়ের মতানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন?" গোপীনাথ বলিলেন, "ইনি কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত লোক। তিনি ভারতী সম্প্রদায়কে অতি সামান্য বলিয়া মনে করিতেন, সেজন্য তিনি বলিলেন, "ইঁহার নাম সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু ভারতী সম্প্রদায় সেরূপ বড় সম্প্রদায় নহে।" গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "শ্রীচৈতন্য বাহ্যাড়ম্বর ভালবাসেন না, সে জন্য বড় সম্প্রদায় উপেক্ষা করিলেন।"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, শ্রীচৈতন্যের এই অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন যে, "আমি তাঁহাকে প্রতিদিন বেদান্ত শুনাইব এবং অদ্বৈত

মার্গের পথে তাঁহাকে লইয়া আসিব।" সার্ব্বভৌমের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। গোপীনাথ সার্ব্বভৌমাচার্য্যকে বলিলেন, "তুমি ইঁহার মহিমা কি বুঝিবে, ভক্তির উচ্চতম লক্ষণ সকল ইঁহাতেই প্রকাশ পাইতেছে।" সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে আগামী কল্য আমার বাড়ীতে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবে।" গোপীনাথ ও মুকুন্দ সার্ব্বভৌমের বাড়ী হইতে প্রভুর নিকট গমন করিলেন এবং ভট্টাচার্য্যের সমস্ত কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। চৈতন্য তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য আমায় অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে তিনি আমাকে সৎপরামর্শই প্রদান করিবেন।"

গৌর সার্ব্বভৌম-ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক বসিতে আসন দান করিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মভাব ও তাঁহার বংশাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আচার্য্য তৎপর তাঁহাকে বলিলেন, "তোমাকে এমন বুদ্ধিমান দেখিতেছি, কিন্তু তুমি এমন বুদ্ধিমান হয়ে সন্ন্যাস ধর্ম্ম কেন গ্রহণ করিলে? ভেবে দেখ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে প্রথমেই মনে একটা অহংভাব উপস্থিত হয়। দণ্ডধারী হইয়া, সকলকেই সামান্য মনে করে, এবং অনেক সময় 'আমিই নারায়ণ' এই কথা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। পরমেশ্বর সকল দেহেতেই অংশরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেজন্য প্রত্যেক জীব-জন্তু ও সকল বর্ণের লোকের নিকটেই মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু দণ্ডধারী সন্ন্যাসীদিগের নিকট সকলেই দণ্ডবৎ হয়, কিন্তু তাঁহারা কাহারও নিকটে মস্তক নত করিতে চাহেন না। অনেকে শঙ্করাচার্য্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, শিখা সূত্র পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া অশেষ কষ্ট পাইয়া থাকেন। তুমি এমন পথ কেন গ্রহণ করিলে? যদি বল, মাধবেন্দ্র প্রভৃতি পরম ভাগবতেরা, এই পথই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন,

কিন্তু তাঁহারা সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া, শেষে পরিণত বয়সে ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তোমার কাঁচা বয়স, এ সময় সংসারধর্ম্ম পালনের সময়, তোমার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের অধিকার হয় নাই।”

পরম বৈরাগী, বিনয়ের অবতার, ভক্তের শিরোভূষণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সার্ব্বভৌমাচার্য্যের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “আচার্য্য! আপনি আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিবেন না, আমার হৃদয়ের নিধি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হইয়া, শিখা সূত্র পরিত্যাগ করে, গৃহের বাহির হইয়াছি। যাহাতে আমার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মতি থাকে, আমাকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন।” যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

প্রভু বোলে, “শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়!
“সন্ন্যাসী” আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলুঁ শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥
“সন্ন্যাসী” করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥”

শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের অনেক গুণানুবাদ করিলে, তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “শাস্ত্রমতে তুমিই বন্দনীয়, আমি উপাসক; কিন্তু তুমি আমার স্তব স্তুতি করিতেছ, ইহা যুক্তিযুক্ত নয়; ইহাতে আমার অপরাধ হইবে।”

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সার্ব্বভৌমাচার্য্য বলিলেন, “আমার এখানে প্রতিদিন প্রাতে বেদান্ত পাঠ হয়; সন্ন্যাসীদিগের বেদান্ত শ্রবণ করা আবশ্যক, তুমি বেদান্ত শ্রবণ করিবে।” চৈতন্য আচার্য্যের বাক্যে সম্মত হইয়া তৎপরদিবস প্রভাতে গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত বাসা হইতে সার্ব্বভৌম-ভবনে আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, সার্ব্বভৌমাচার্য্য শিষ্যবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া বেদান্ত শিক্ষা দিতেছেন। চৈতন্যদেব তথায় উপবেশন করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে

লাগিলেন। এইরূপে সাত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌমাচার্য্য চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সাত দিন বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছ, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে একটি কথাও ত আমাকে বলিলে না? তুমি এ সকলের অর্থ বুঝিতে পার কি না, তাহা আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আপনি বলিয়াছেন বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, আমি তাই আপনার নিকট বেদান্ত শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু আমি অন্ধ, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা কি আমার ন্যায় লোকের সাধ্য?" সার্ব্বভৌম নবীন সন্ন্যাসীর কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "যাহা বুঝিতে পার না, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেই পার।"

তখন শ্রীচৈতন্য বাহ্য বিনয় পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনার বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনিতেছি; ব্যাসবর্ণিত সূত্রের অর্থ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে; কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে যাইয়া মন যেন বিকল হইয়া পড়িতেছে; ভাষ্যের দ্বারাই সূত্রের অর্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু আপনার ভাষ্যে সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইতেছে না। আপনার ব্যাখ্যায় সূত্রের প্রকৃত অর্থ যেন কল্পনায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ব্যাসসূত্রের প্রকৃত অর্থ উপনিষদেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। আপনি সেই ব্যাস-সূত্রের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া, গৌণার্থ করিয়া থাকেন। মহামুনি বেদব্যাসবর্ণিত সূত্রগুলি যেন সূর্য্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল, কিন্তু আপনি সেগুলি আপনার স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যায় যেন মেঘাবৃত করিয়া ফেলিয়াছেন।"

গৌর ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যার দোষের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বেদে ও পুরাণে ব্রহ্মের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান। এমন পরমেশ্বরকে আপনি নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন? শ্রুতিতে যদিও তাঁহাকে নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতরূপে তাহার বিচার করিলে,

ভগবানের সবিশেষ ভাবই তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, এবং পুনরায় সেই পরব্রহ্মতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। এইজন্য ভগবানে, অপাদান, করণ ও অধিকরণ, এই তিন কারকের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি এক হইয়া বহুরূপে এই বিশ্বে আপনার সত্তা প্রকাশ করিবার জন্য লৌকিকভাব আশ্রয় করিলেন, এবং সেই ভাবেই এই সংসার দেখিতে লাগিলেন। বেদেতে ব্রহ্মস্বরূপের যাহা নিরূপিত না হয় পুরাণে তাহার মীমাংসা পাওয়া যায়। শ্রুতিতে ভগবানকে নিরাকার বলা হয়, সত্য, কিন্তু তৎসঙ্গে আবার ইহাও বলা হয় যে, তাঁহার চরণ নাই, অথচ তিনি গমন করেন; হস্ত নাই, অথচ তিনি গ্রহণ করেন; অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতিতে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। কেবল কল্পিত অর্থে তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হইয়া থাকে। তিনি পরম ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, আপনি এমন পরমেশ্বরকে কেবল নিরাময় বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে চান?"

গৌর আবার বলিতে লাগিলেন, "সেই পরমাত্মাতে তিনটি শক্তি বিরাজ করিতেছে; সৎ, চিৎ, আনন্দ। সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর এই বিশ্বের সকল স্থান পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, ইহাই সন্ধিনী শক্তি; তিনি জ্ঞানময়, সকলই জানিতেছেন, ইহা সংবিৎ; সেই পরমাত্মাতে পূর্ণ আনন্দ বিরাজ করিতেছে, ইহাকে হ্লাদিনী শক্তি (১) বলে। ভগবানে এই

---

(১) তাই পরম ভাগবত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন,—

"হ্লাদিনী' করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন;
'হ্লাদিনী' দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ;
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
চিদংশে সম্বিত, যারে জ্ঞান করি মানি।"

যে তিনটি শক্তি বিরাজ করিতেছে, ইহাকে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বলা যায়। আর জীবনশক্তি তটস্থা অন্তরঙ্গা শক্তি ভগবানে চিরবিরাজিত। আর তটস্থা শক্তি সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে। বহিরঙ্গ শক্তিকে মায়াশক্তি বলে। এই মায়া শক্তি ব্রহ্ম হইতে প্রসূত হইয়া, সৃষ্টির উপর আধিপত্য বিস্তার করে, ব্রহ্মের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না; ব্রহ্মেতে মায়ার প্রভাব নাই। মায়াবাদীরা এই মায়াকে অবস্তু বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা মিথ্যা নহে, অসম্পূর্ণ জ্ঞানমাত্র। যাঁহার সত্তা জগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে; যিনি জ্ঞানেতে অনন্ত ও মায়াতীত,—যাঁহার আনন্দকণা লাভ করিয়া, ভক্তেরা আনন্দ ও প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়েন, আপনি সেই পরমাত্মাকে মানবের সহিত কিরূপে অভেদাত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে চান?"

সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গের সুযুক্তিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি যাঁহাকে অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী মনে করিয়া, বেদান্ত শিক্ষা দিয়া, নিজমতাবলম্বী করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন, যে, নবদ্বীপের নবীন সন্ন্যাসী সামান্য যুবাপুরুষ নহেন। গৌর ভগবানের স্বরূপ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন, "যাঁহারা এমন সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহকে স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে পাষণ্ডী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। বুদ্ধ বেদ মানিতেন না বলিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলা হইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা বেদ আশ্রয় করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে বিশ্বাস না করেন, তাঁহাদের নাস্তিকতা কি তদপেক্ষা অধিকতর বলিয়া বোধ হয় না? কেহ কেহ এই কথা বলিতে পারেন, পরমেশ্বর বিকারশূন্য হইয়া কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিলেন? এ সকল কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।"

মণি হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যদি উহা অবিকৃত থাকিতে পারে,

তাহা হইলে, সেই অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর হইতে এ জগৎ প্রসূত হইলে, তিনি কি আর অবিকৃত হইয়া থাকিতে পারেন না ?"

নবদ্বীপের নবীন সন্ন্যাসী এইরূপে বহুবিধ যুক্তিদ্বারা বৈদান্তিক চূড়ামণি সার্ব্বভৌমের অদ্বৈতমত খণ্ডন করিলে তিনি অবাক্ হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তখন ভক্তচূড়ামণি, ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম প্রচারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন, "ভগবানে ভক্তিই মানবের পরম পুরুষার্থ; তাঁহাতেই ভক্তি অর্পণ করিয়া, পরম শান্তিলাভ করুন।"

এই বলিয়া চৈতন্যদেব ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহেতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ ॥

আত্মারাম মুনিগণ বিধি ও নিষেধের অতীত হইয়াও সেই অমিত পরাক্রমশালী হরিতেই অহৈতুকী ভক্তি স্থাপন করিয়া থাকেন। কারণ সেই শ্রীহরির গুণই এইরূপ।

ভট্টাচার্য্য গৌরকেই ভাগবতের এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন, কিন্তু গৌর তাহা না করিয়া, ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতেই উহার ব্যাখ্যা শ্রবণের অভিলাষ জানাইলেন। সার্ব্বভৌম ত্রয়োদশ প্রকারে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলেন। গৌর তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আপনি পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া, শ্লোকটির যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু উহার আর একটা দিক আছে।" এই বলিয়া, তিনি শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, অথচ, সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার কোন অংশই গ্রহণ করিলেন না। সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন, এবং এ শক্তি যে সাধারণ মানবের অতীত, তাঁহার মনে এই প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। কথিত আছে,

এমন সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ষড়্ভুজরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম সে মোহনরূপ দর্শনে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যদেব অবশেষে তাঁহার হস্ত ধরিয়া "উঠ উঠ," বলিয়া ভূমি হইতে উত্তোলন করিলেন; ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার জ্ঞানে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত লইয়া পাড়িলেন। বৈষ্ণব লেখকেরা বলেন, সার্ব্বভৌম সে সময় এক-শত শ্লোক রচনা করিয়া, তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাবের সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে ভক্তির ফোয়ারা খুলিয়া গেল; তাঁহার দু'নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল! তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল; তিনি প্রকৃত অনুরাগী ভক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় নৃত্য ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সুবিখ্যাত বৈদান্তিক রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যের নিকট বিচারে পরাস্ত হইলেন; এবং তৎপ্রদর্শিত ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিলে, পাণ্ডারা তাঁহাকে মালা ও প্রসাদান্ন প্রদান করে। চৈতন্যদেব, উহা প্রাপ্ত হইয়া, ভট্টাচার্য্যের ভবনে আগমন করিলেন। তিনি তখনও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের নামধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তদীয় চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন। চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে মালা ও জগন্নাথের প্রসাদান্ন প্রদান করিলেন। সার্ব্বভৌম তখনও মুখ প্রক্ষালন, বা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেন নাই; কিন্তু তথাপি প্রভু-প্রদত্ত মালা গ্রহণ করিয়া প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিলেন।

চৈতন্যদেব ইহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অবশেষে দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। উভয়ের কণ্ঠ হইতে হরিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল; উভয়ের অশ্রুজলে, উভয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রভু তাঁহার অনুগত ভক্তের মধ্যে ভক্তির লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদসহকারে সার্ব্ব-ভৌমকে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইল, তুমি অকপট হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিলে; তোমার সকল বন্ধন ছিন্ন হইল; তুমি বেদধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিলে; তোমার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের অধিকারের উপযুক্ত হইয়াছে।"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একদিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাছে উপস্থিত হইয়া, ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে, মহাপ্রভু, তাঁহাকে নাম সংকীর্ত্তনই ভক্তি সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং নারদীয় পুরাণের এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ করান,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখ হইতে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, সার্ব্বভৌমের হৃদয় ভক্তিরসে আরো আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি অবনত মস্তকে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন, চৈতন্যদেবও তাঁহার নূতন শিষ্যকে প্রেমালিঙ্গন দানে পরম সুখী করিলেন। সার্ব্বভৌম তৎপর চৈতন্যদেবের অনুমতি লইয়া, জগন্নাথ দর্শনানন্তর গৃহে আগমন করিলেন। বাটীতে আগমন করিয়া, তিনি বহুবিধ প্রসাদান্ন আনাইয়া, দুই জন লোক দ্বারা, প্রভুর নিকট প্রেরণ করেন। এই সময় সার্ব্বভৌমাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের স্তবস্তুতিসূচক দুইটি শ্লোক রচনা করিয়া, জগদানন্দের হস্তে দিয়া উহা প্রভুকে দিতে বলিলেন। মুকুন্দ দত্ত, জগদানন্দের হস্ত হইতে

তালপত্রে লিখিত শ্লোক দুইটি দর্শন করিয়া, দেয়ালে উহা লিখিয়া রাখিয়া দেন। জগদানন্দ সার্ব্বভৌম-লিখিত শ্লোক দুইটি গৌরের হস্তে প্রদান করিলেন। চৈতন্যদেব শ্লোক দুইটি পাঠ করিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মুকুন্দ দত্ত সে শ্লোক দুইটি পূর্ব্বেই দেয়ালে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সকলে সেই শ্লোক দুইটি কণ্ঠস্থ করিয়া চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই শ্লোক দুইটি এই ঃ—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী,
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

যে এক করুণার অবতার পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্য, বিদ্যা এবং স্বকীয় ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম।

বৃন্দাবন দাস তাই কবিতায়,—

"কালবশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে।
পুনর্ব্বার নিজ ভক্তি প্রকাশ কারণে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রভু অবতার।
তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত বসুক আমার ॥"
"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ,
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে।
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥"

যিনি কালপ্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় স্বকীয় অসাধারণ ভক্তিযোগ সমর্পণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া, আবির্ভূত হন, তাঁহার চরণারবিন্দে আমার মনোমধুকর প্রগাঢ়রূপে বিলীন হউক।

বৃন্দাবন দাস তাই কবিতায়,—

"বৈরাগ্য সহিতে নিজ ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তনু পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান॥
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ-গুণ নাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপদেশে ভক্তিপথাবলম্বী হইলে, নীলাচলের চারিদিকে এ বার্ত্তা বিস্তারিত হইয়া পড়িল। লোকে চৈতন্য-দেবের অপূর্ব্ব শক্তি দর্শন করিয়া, তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। অনেকে বলিতে লাগিল, ইনিই ত সচল জগন্নাথ। নীলাচলের ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই নবদ্বীপের এই নূতন সন্ন্যাসীর বিদ্যা বুদ্ধি, জীবনের অনুপম সৌন্দর্য্য ও তাঁহার অসাধারণ ভক্তিভাব দর্শন করিয়া, তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে হরিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল—যাঁহাদের রসনা হইতে কখন ভগবানের মধুর নাম বহির্গত হয় নাই, তাঁহাদের রসনাও এ নাম উচ্চারণে সুধারসে সিক্ত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন পথে বাহির হইতেন, তখন পথের দুই পার্শ্বের লোক হরিনামের মধুর রবে যেন চারিদিকের বায়ুমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া তুলিত। শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপে নিজে হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন।

"ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাশীমিশ্র আদি করি নীলাচলবাসী।
স্মরণ লইল সবে প্রভুপদে আসি॥"

সুবিখ্যাত বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বিচারে পরাস্ত করতঃ নীরস অদ্বৈতবাদের পথ হইতে, মধুময় জীবনপ্রদ ভক্তির পথে আনয়ন করা, চিত্তবিমোহন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলার মধ্যে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বলিয়া, ভারতের ভক্তি-ইতিবৃত্তে চিরদিনই লিখিত থাকিবে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ অঞ্চলে যাত্রা

গৌর সন্ন্যাসী। তাঁহার আত্মা বিহঙ্গমের ন্যায় এখন মুক্তাকাশে বিচরণ করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে; তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন। এখন দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া নানা তীর্থ দর্শন করিবেন, সাধুগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিবেন ও হরিগুণ-কীর্ত্তনে নরনারীকে প্রেমের পথে, পরিত্রাণের পথে আনয়ন করিবেন, এই তাঁহার সংকল্প। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ তিথিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সংসারের সকল মায়ামমতায় বিসর্জ্জন দিয়া, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন, এবং সন্ন্যাসান্তে ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আগমন করেন। চৈত্রমাসে তথায় অবস্থিতি করিয়া সার্ব্বভৌমাচার্য্যকে নিজ মতে আনয়ন করেন। চৈত্রমাস অন্তে তিনি দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তিনি আপনার শিষ্যদিগকে বলিলেন, "দেখ, তোমরা আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়; প্রাণ ছাড়া যায়, কিন্তু তোমাদিগকে পরিত্যাগ করা যায় না। তোমরা আমাকে এখানে আনিয়া যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। এখন আমি দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিবার জন্য বাসনা করিয়াছি। বিশ্বরূপের

অন্বেষণ ইহা আমার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। আমি একাকীই গমন করিব, তোমরা আমাকে অনুমতি প্রদান কর।" মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিষ্যবৃন্দ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল যেন মেঘাবৃত হইয়া পড়িল। তিনি দুর্গম পথে কিরূপে বিচরণ করিবেন, ইহাই তাঁহাদিগের প্রধান চিন্তার কারণ হইয়া উঠিল।

নিত্যানন্দ বলিলেন, "না তাহা হইবে না; তোমার সঙ্গে দুই একজন লোক গমন করুক। আমি দক্ষিণাপথে পর্য্যটন করিয়াছি, তুমি যদি আজ্ঞা কর,আমি তোমার সঙ্গে গমন করি।" চৈতন্যদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার, তুমি যেমন ভাবে আমাকে নাচাও আমি সেই ভাবেই নাচিয়া থাকি। আমি বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিলাম, তুমি আমাকে শান্তিপুর অদ্বৈতভবনে আনিয়া উপস্থিত করিলে। নীলাচলে আসিবার সময় তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। আর এক কথা, তোমাদের গাঢ় স্নেহেতে আমার সন্ন্যাসধর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে। জগদানন্দ আমাকে বিষয়-সুখে আবদ্ধ করিতে সর্ব্বদাই প্রয়াসী। আমি তাহার কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে, সে অভিমান করিয়া আমার সঙ্গে তিন দিন কথা বন্ধ করিয়া থাকে। শীত কালেও আমি দিবসে তিনবার স্নান করি ও ভূমিতে শয়ন করি দেখিয়া, মুকুন্দ বড়ই দুঃখিত হয়; অথচ মুখে প্রকাশ করে না। তাহার দুঃখ দেখিয়া আমারও প্রাণে বড় কষ্ট হয়। তোমরা সকলে নীলাচলে বাস কর,আমি একাকী তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসি।" মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুগত শিষ্যেরা তাঁহাকে একাকী তীর্থ পর্য্যটনের অসুবিধা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু তবুও তাঁহার সঙ্কল্প অটুট রহিল দেখিয়া অবধূত নিত্যানন্দ অতি বিনয়ের সহিত তাঁহার জীবনের নেতা ও গুরু শ্রীচৈতন্য-দেবকে বলিলেন, "তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু আমার একটা নিবেদন আছে,তুমি বিচার করিয়া দেখ,তোমার অঙ্গুলি সদাই হরিনাম

জপেই নিযুক্ত থাকে। তুমি কখন কখন প্রেমাবেশে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িবে এই জন্য তোমার কৌপীন বহির্ব্বাস ও জলপাত্র বহন করিতে ও তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যও একজন লোকের আবশ্যক।" নিত্যানন্দ গুরুকে এই কথা বলিয়া, তিনি কৃষ্ণদাস নামক একজন ব্রাহ্মণকে তাঁহার সঙ্গের সাথী করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণদাস তোমার সঙ্গে গমন করুক, সে তোমার জলপাত্র ও কৌপীন বহন করিবে এবং তোমার সকল আদেশই সে মস্তকে বহন করিয়া কার্য্য করিবে।" নিত্যানন্দের এত অনুনয় বিনয় শ্রবণ করিয়া, শ্রীচৈতন্য তাঁহার কথায় সম্মতি দান করিলে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গের পর চৈতন্যদেব ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন, "বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাপথে গমন করিয়াছেন, আমি তাঁহার অন্বেষণে সেই অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, এখন তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।" সার্ব্বভৌম তাঁহার দেশ ভ্রমণের কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখে কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, "আমি বহু পুণ্যফলে তোমার সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম, হায়! বিধি সে সঙ্গ আমার ভাঙ্গিয়া দিলেন, আমার শিরে যদি বজ্র নিপতিত হয় ও আমার সন্তান মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, আমি তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ, তদপেক্ষা আমার পক্ষে অসহনীয়। তবে যদি তুমি নিতান্তই যাইতে চাও, তাহা হইলে আর দিন কয়েক এখানে থাক; আমি তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া জীবন শীতল করি।"

শ্রীচৈতন্যের হৃদয় স্নিগ্ধ কুসুমসদৃশ কোমলতায় পূর্ণ। তিনি সার্ব্বভৌমের মিষ্ট কথায় ও মধুর ব্যবহারে তাঁহার অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি গৌরের অচলা ভক্তি; তাঁহাকে একটু সুখী করিতে পারিলে তিনিও নিজেকে

আনন্দিত মনে করেন। চৈতন্যদেব তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া চার পাঁচ দিবস পুরীতে অবস্থিতি করিলেন, এবং সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া এই কয়েক দিবস তাঁহারই ভবনে আহার করিলেন। সার্ব্বভৌমের পত্নী প্রভুর জন্য বিবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। প্রভুও আহার করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন।

নির্দ্ধারিত দিবস ফুরাইয়া গেল। চৈতন্যদেব আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। সার্ব্বভৌমের নিকট দক্ষিণাপথ যাইবার প্রস্তাব করিয়া অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। পর্য্যটনের পূর্ব্বে মহাপ্রভুও তাঁহার অনুচরবর্গসহ জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গমন করিয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পূজারী এই অতুল সৌন্দর্য্যপূর্ণ নবীন সন্ন্যাসীর গলে মালা পরাইয়া, তাঁহাকে প্রসাদান্ন প্রদান করিলেন। গৌরসুন্দর জগন্নাথ দেবের অনুগ্রহ ও সকলের শুভ প্রার্থনা মস্তকে ধারণ করিয়া দক্ষিণ দেশে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সার্ব্বভৌমাচার্য্য, চৈতন্যদেবের জন্য চারিটা নূতন কৌপীন ও চারিটা বহির্ব্বাস প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন; গোপীনাথ তাহা লইয়া আলালনাথ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত গমন করিলেন। যাইবার সময় ভট্টাচার্য্য প্রভুকে বলিলেন, "গোদাবরী (১) তীরে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায় নামে একজন সাধু পুরুষ আছেন; ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিলেও এমন সুপণ্ডিত ও ভগবদ্ভক্ত অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বিষয়ী বা শূদ্র বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে না। তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে. তিনি কি প্রকার লোক। এমন কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী, সুরসিক ভক্তকে আমি পূর্ব্বে ভালরূপ

(১) গোদাবরী—দাক্ষিণাত্যের মধ্যে প্রসিদ্ধা নদী; উহা ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া উপহাস করিতাম, এখন তোমার কৃপায় বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি। গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের বাক্য পালন করিতে অঙ্গীকার করিয়া, আপনার বাহুদ্বারা তাঁহাকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন অনুগত শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিলেন। এদিকে সার্ব্বভৌমাচার্য্যের অন্তরে প্রভুর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা এতই প্রবলতর হইয়া উঠিল যে, তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া বিচেতন হইয়া পড়িলেন। যাত্রিদল বিশাল বারিধির উপকূল দিয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা আলালনাথে উপস্থিত হইলেন। প্রভু আলালনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং আপনার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি অনুসারে নৃত্য করিতে লাগিলেন; হরিনামের মধুর ধ্বনিতে সকলের কর্ণে যেন সুধা বর্ষিত হইতে লাগিল। এই যুবা পুরুষের রূপলাবণ্য, তরুণ যৌবনে কঠোর বৈরাগ্য ও ভগবানের প্রতি অলৌকিক প্রীতি দর্শন করিয়া লোকে দলে দলে আলালনাথ দেবমন্দির সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিকে লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। গৌর-হৃদয়ের ভগবৎ-প্রেম তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় সকলকে হরিপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। বহুজনাকীর্ণ লোকমণ্ডলীর মধ্য হইতে আকাশভেদী হরিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য ক্রমে পশ্চিমদিকে হেলিয়া পড়িলেন, কিন্তু তবুও জনতার হ্রাস হইল না; গৌরের অশ্রু-কম্প-পুলক-মিশ্রিত ভাব দর্শন করিয়া, সকলেই বিমুগ্ধ; হরিনামের পীযূষ পানে সকলেই আত্মহারা। সমবেত নরনারীর সে স্থান পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা ছিল না। নিত্যানন্দ সেই আনন্দ কোলাহলপূর্ণ প্রেমের হাট দর্শন করিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই সকল, হরিনামের মধুর হিল্লোল চারিদিকে প্রবাহিত হইবে, গ্রামে গ্রামে নরনারী এই হরিসংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিবে।"

নিত্যানন্দ দেখিলেন, গৌরকে ধরিয়া লইয়া আহার না করাইলে, দিন অবসান হইলেও তাঁহার নৃত্য থামিবে না; হরিনামোন্মত্ত দর্শক-বৃন্দও এস্থান পরিত্যাগ করিবে না। তিনি গৌরসুন্দরকে ভোজন করাইবার জন্য সেস্থান হইতে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। কিন্তু বহুসংখ্যক লোক, অলিকুলের ন্যায়, তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল। নিত্যানন্দ তাঁহাকে একটু নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া ভোজন করাইলেন। প্রভুর ভোজনান্তে ভক্তেরাও আপনাদের জীবনকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহার ভোজন-পাত্রের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের কিছু কিছু অংশ ভক্ষণ করিলেন। আহারান্তে নিত্যানন্দ তাঁহাকে লইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং লোকসংঘ হইতে কিছুকাল প্রভুকে বিশ্রাম করাইবার জন্য, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু সহস্র সহস্র লোক দেবমন্দিরের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া হরিনামের ধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আলালনাথ-দেবমন্দিরে আগমন ও তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তি লীলার কথা, রসনা হইতে রসনান্তরে বর্ণিত হইয়া, গ্রাম-গ্রামান্তরও প্রবেশ করিয়াছিল। মানবজীবনের এমন শান্তিপথ-প্রদর্শক, এমন মুক্তিপথের সহায়কে দর্শন করিয়া জীবন কৃতার্থ করিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গ আজ আনন্দে ভরপুর। তিনি রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিতে বলিলেন। দ্বার উন্মুক্ত হইল। চৈতন্য-দর্শনাভিলাষী নরনারী তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া মহোল্লাসে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। গৌরসুন্দরও আবার পূর্ব্ববৎ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আলালনাথের মন্দির আজ এক জীবন্ত দেবতার আবির্ভাবে উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক শ্রীচৈতন্যের পদানুসরণ করিয়া তৎপ্রদর্শিত বৈষ্ণবধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রামানন্দ সম্মিলন

রজনী প্রভাত হইয়া গেল। গৌরসুন্দর স্নান করিয়া দক্ষিণাপথ পর্য্যটনের জন্য আলালনাথ হইতে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে তিনি প্রেমভরে ভক্তদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু গৌরের বিচ্ছেদ তাঁহাদের এতই অসহনীয় হইয়া পড়িল যে, তাঁহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। চৈতন্যদেব সকল মায়ার অতীত হইয়াছেন—তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি যাত্রাকালে কাহারও জন্য পশ্চাৎদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না; অতুল অনুরাগভরে কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার কণ্ঠ হইতে, সুধাবর্ষী হরিনামের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, শত শত লোক তাঁহার পশ্চাদনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সঙ্গে সেই সুধামাখা নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বহুলোক তাঁহার অনুসরণ করিলে, তিনি কিয়দ্দূর গমনানন্তর, সকলকে আলিঙ্গন করিয়া, গৃহে গমন করিতে বলিলেন। লোকে সে পবিত্র হরিরসপূর্ণ দেহের আলিঙ্গন লাভ করিয়া, হরিপ্রেমে আপ্লুত হইয়া পড়িল—সকলের দেহ মনে এক অপার্থিব তেজোময় শক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল,—সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিনব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে গৃহে গমন করিতে লাগিল। তাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া, অপরেও সে সুধামাখা নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। এইরূপে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নামের পবিত্র ও মধুর হিল্লোলে,

সকলের হৃদয় শীতল হইতে লাগিল; দক্ষিণাপথের সহস্র সহস্র নরনারী হরিভক্ত হইয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্য ক্রমে সেতুবন্ধে * আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সেখান হইতে তিনি কূর্ম্ম নামক স্থানে গমন করিলেন। এখানে কূর্ম্মাবতারের মন্দির আছে। শ্রীচৈতন্য কূর্ম্মদেবের মন্দিরে গমন করিয়া যথারীতি তাঁহার স্তবস্তুতি করিলেন, এবং আপনার প্রকৃতি অনুসারে নৃত্যগীতাদিতে বহু সময় ক্ষেপণ করিলেন। যাহারা তাঁহার মোহন মূর্ত্তি ও হরিপ্রেমের অপূর্ব্ব নিদর্শন দর্শন করিল, তাহারাই বিমুগ্ধ হইয়া গেল; তাঁহার হরিপ্রেমানুরাগের কথা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। গ্রামবাসীরা দলে দলে এমন নবীন সন্ন্যাসীর দর্শন লালসায়, দেবমন্দিরের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল—এবং শত শত লোক সে মধুর স্রোতে আপনাদের অঙ্গ ভাসাইয়া দিল। তাই কৃষ্ণদাস তাঁহার অমর গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন;—

"আশ্চর্য্য শুনি সব লোক আইল দেখিবারে।
প্রভু রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি॥
কৃষ্ণনাম লোক মুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল॥"

এই কূর্ম্মস্থানে কূর্ম্ম নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রভুর চিত্তহারী শক্তির কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিবার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং করযোড়ে, আপন

---

* সেতুবন্ধ—ইহাকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ বলে। ইহা একটি সুবিখ্যাত দ্বীপ।

অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুসারে তাঁহার ভবনে গমন করিলেন। কূর্ম্ম এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে, প্রভুর আগমনে পরম কৃতার্থ বোধ করিলেন। কূর্ম্ম তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দিলেন, এবং তিনিও তাঁহার পরিবারবর্গ সকলে মিলিয়া সেই চরণামৃত পান করিলেন। পাদপ্রক্ষালনানন্তর গৃহস্বামী তাঁহার ভোজনের আয়োজন করিয়া, অতিবিনীতভাবে তাঁহাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে, প্রভু সম্মত হইয়া, কূর্ম্মের বাড়ীতে সে-দিবস ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে তাঁহার প্রসাদান্ন সকলে ভক্ষণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। কূর্ম্ম মনে করিতে লাগিলেন যে, তিনি ঘরে বসিয়া আজ স্বর্গের দেবতাকে দর্শন করিলেন, এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই বহু পুণ্যফলে আজ সে দেবতার দর্শন লাভে জীবন সফল করিল। কূর্ম্ম অবশেষে হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, চৈতন্যদেবকে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! তোমার পাদপদ্ম দর্শনের জন্য ব্রহ্মাদির ন্যায় দেবগণও তপস্যা করিয়া থাকেন, আজ তুমি স্বয়ং আমার ন্যায় ব্যক্তির গৃহে আগমন করিলে, তোমার শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শ করিলাম; ইহার তুল্য আমার উচ্চভাগ্য আর কি হইতে পারে? আজ আমার জন্ম ধন্য হইল, আমার কুল কৃতার্থ হইল। প্রভো! তুমি যদি কৃপা কর, আমি তোমার সঙ্গের সাথী হই, বিষয়ের দুঃখ আর ভোগ করিতে ইচ্ছা হয় না।"

কূর্ম্ম সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গের সাথী হইবার বাসনা নিবেদন করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে সংসার পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তুমি গৃহে বসিয়া কৃষ্ণনাম কর, ঘরে বসিয়াই তুমি সে ধন লাভ করিবে। যাহাকে দেখিবে তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়া উপদেশ দিবে। আমার আদেশে তুমি গুরুর ন্যায় এদেশে শ্রীকৃষ্ণের মধুময় নাম কীর্ত্তন করিয়া, দেশের উদ্ধার সাধন কর। সংসার তোমার কার্য্যের

প্রতিকূলাচরণ করিতে সমর্থ হইবে না।” মহাপ্রভু বৈদিক ব্রাহ্মণ কূর্ম্মের গৃহে সে-দিবস যাপন করিয়া, পরদিবস প্রাতে পর্য্যটনের জন্য যাত্রা করিলেন। কূর্ম্মও তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিলে, প্রভুর আদেশে তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ঐ অঞ্চলে বাসুদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার শরীরের ক্ষতস্থান সকল কীটাণুতে পূর্ণ হইয়া থাকিত। বাসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার দর্শন লালসায়, কূর্ম্মের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন; কিন্তু কূর্ম্মভবনে উপস্থিত হইয়া যখন শুনিলেন যে, মহাপ্রভু চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি শোকে ও দুঃখে অধীর হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। এদিকে দয়ার্দ্রচিত্ত করুণার অবতার শ্রীচৈতন্যদেব যাইতে যাইতে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাসুদেবের কাতরোক্তি হৃদয়ে অনুভব করিয়া, পুনরায় কূর্ম্মস্থানে কূর্ম্মগৃহে আগমন করিয়া বাসুদেবকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন; তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে বাসুদেবের ব্যাধি আরোগ্য হইয়া গেল; তাঁহার রোগগ্রস্ত কুৎসিত অঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠিল। বাসুদেব তাঁহার অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া, বলিলেন, “প্রভো! এ শক্তি তোমাতেই সম্ভবে, অন্য কাহাতেও নহে; কিন্তু প্রভো, আমার দেহ এমন সুন্দর হইল বলিয়া মনে অহঙ্কার জন্মিতে পারে; আমি যখন কীটদষ্ট হইয়া রোগভোগ করিতেছিলাম, তখন আমি নিজেকে অধম বলিয়াই মনে করিতাম; আমার আত্মার কল্যাণের পক্ষে তাহাই শ্রেয়স্কর ছিল।” চৈতন্যদেব বুঝিলেন, বাসুদেব ভক্ত; তিনি তাই বলিলেন, “তুমি সদাই শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন কর, ও সকল লোকের মধ্যে সে নাম প্রচার কর; অভিমান তোমাতে স্থান পাইবে না।” এই বলিয়া, তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কূর্ম্ম ও

বাসুদেব পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া উভয়ে প্রভুর প্রেমলীলা স্মরণ করতঃ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কূর্ম্মস্থানে হরিনামের প্লাবনে সকলকে প্লাবিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরদিবস তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে, তিনি কয়েকদিবস পরে গোদাবরী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী তীরস্থ সুরম্য বনরাজি ও নদীর নির্ম্মল জল দর্শন করিয়া, তাঁহার মনে বৃন্দাবনের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মলসলিলা গোদাবরী যমুনা ও তাহার তীরস্থ ঘনপল্লবাবৃত বৃক্ষসমূহ বৃন্দাবনের বন বলিয়া তাঁহার প্রতীয়মান হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ নৃত্যগীতাদিতে ক্ষেপণ করিলেন, এবং স্নানাবগাহন করিয়া ঘাটের অনতিদূরে বসিয়া, নামকীর্ত্তনে রত হইলেন। এই স্থানের নাম বিদ্যানগর। তিনি কীর্ত্তনানন্দে মত্ত রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক ব্যক্তি বহুজন পরিবেষ্টিত হইয়া দোলারোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে বাদকেরা বাদ্য বাজাইতেছে ও বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য দোলা-রোহণকারীকে দর্শন করিয়া মনে করিলেন, ইনিই কি রামানন্দ রায়, ইঁহার বিষয়ই কি সার্ব্বভৌম আমাকে বলিয়াছেন? এদিকে রামানন্দ রায় লোকজনসহ স্নানঘাটের সমীপে আসিয়া দোলা হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময় নবীন সন্ন্যাসী নদীতীরে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার রূপে যেন চারিদিক আলোকিত হইতেছে; তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে যেন এক অপার্থিব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছে। কৃষ্ণভক্ত রাজা রামানন্দ রায়, সন্ন্যাসীর চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি রামানন্দ রায়?" রামানন্দ প্রভুর কথার উত্তরে অতি বিনীতভাবে

বলিলেন, "আমি সেই অধম শূদ্রই সত্য।" মহাপ্রভু তখন আপনার বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের হৃদয়ে প্রেমতরঙ্গ উথলিত হইল; উভয়েই ভক্তির আবেশে অচেতন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাজা রামানন্দের সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা, উভয়ের ভাব দর্শনে অবাক্ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, এ সন্ন্যাসীর মধ্যে ব্রহ্মতেজ প্রকাশ পাইতেছে; আমাদের রাজা শূদ্র, ইনি ইঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কেনই বা ক্রন্দন করিতেছেন; আর আমাদের রাজা মহাপণ্ডিত, ইনিই বা কেন, এ সন্ন্যাসীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করেন? রাজা রামানন্দের সমভিব্যাহারী লোকদিগের নিকট এ দৃশ্য এক অভিনব ঘটনা বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে উভয়ে স্থির হইয়া বসিলেন। চৈতন্যদেব রামানন্দ রায়কে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমাকে আপনার অনুপম চরিত্রের কথা বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে দর্শন করিবার জন্যই এখানে আগমন করিয়াছি। আমার এখানে আসা সার্থক হইল।" রামানন্দ চৈতন্যের কথা শ্রবণ করিয়া বিনম্র বচনে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এ দাসের প্রতি কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণের জন্যই আপনাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন; আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আমার মানবজীবন ধারণ আজ সফল হইল। আপনি নরদেহধারী নারায়ণ; আমি রাজসেবী বিষয়ী, আপনি এ অধমের উদ্ধারের জন্যই এখানে আগমন করিয়াছেন; আপনি দয়ার অবতার। যে শত শত লোক আজ আমার সঙ্গে আগমন করিয়াছে, তাহাদের সকলেরই হৃদয় আপনার দর্শনে দ্রবীভূত হইয়াছে; সকলেরই চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতেছে; সকলেরই মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের মধুর নাম উচ্চারিত হইতেছে।" শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আপনার অঙ্গস্পর্শে আমার হৃদয়ও কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছে; আপনি মহাভাগবত।" উভয়ে এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবকে

আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন; ব্রাহ্মণ একজন ভক্ত বৈষ্ণব। চৈতন্যদেব তাঁহার বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত হইয়া, রামানন্দ রায়কে বলিলেন, "আপনার মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে আমার বড়ই ভাল লাগে, পুনরায় যেন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়।" রামানন্দ বলিলেন, "যদি অধমকে তরাইবারই সাধ থাকে, তাহা হইলে আরো পাঁচ সাত দিন এখানে অপেক্ষা করুন।" এই কথা বলিয়া রাজা রামানন্দ স্নান ও তর্পণাদি কার্য্য সমাধা করিয়া লোকজন পরিবেষ্টিত হইয়া, বাদ্যধ্বনি সহকারে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; শ্রীচৈতন্যও ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণার্থ গমন করিলেন।

রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। ইঁহার উপাধি রাজা। ইনি বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও জীবনে কৃষ্ণভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে, রাজা রামানন্দ ভগবৎ-কথায় সময় অতিবাহিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীচৈতন্যও তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন। তৎপর উভয়ে একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া উপবেশন করতঃ ভগবৎ-প্রসঙ্গে রত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য রামানন্দ রায়কে সাধন সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলে, রামানন্দ বলিলেন, "বিষ্ণুভক্তিই পরম সার।"

চৈতন্য। ইহা বাহিরের কথা, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। শ্রীকৃষ্ণে সকল কর্ম্ম সমর্পণই সাধনার সার। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আহার, দান, তপ, যাহা কিছু করিবে, সকলই আমাতে অর্পণ করিবে।

চৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সাধনার সার। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি বেদবিহিত আচার পরিহার পূর্ব্বক আমাকে ভজনা

করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন হয়, সে সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে।

চৈতন্য। ইহাও বাহিবের কথা, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধনার সার। ভগবদ্গীতায় আছে, সমদর্শী প্রসন্নচিত্ত ব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি লাভ করে।

চৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা, আগের কথা বল।

রামানন্দ। জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সার।

চৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। প্রেমভক্তিই সকলের সার।

চৈতন্য। ইহা সত্য বটে, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। দাস্য প্রেম উৎকৃষ্ট। ভাগবতে দুর্ব্বাসা অম্বরীষকে বলিতেছেন, যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জীবের পরিত্রাণ হয়, তাঁহার দাসেদের আর অবশিষ্ট কি আছে?

চৈতন্য। বেশ কথা, আরো বল।

রামানন্দ। সখ্য প্রেম সকল ধর্ম্মের সার।

চৈতন্য। সত্য কথা, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। বাৎসল্য প্রেম।

চৈতন্য। ইহাও উত্তম, আবার বল।

রামানন্দ। কান্তভাব প্রেম সাধনার সার। ইহা মাধুর্য্য রস। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য; ইহার মধ্যে সকল রসেরই সমাবেশ আছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছেন, যাহারা আমার প্রতি ভক্তি অর্পণ করিয়াছে, তাহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে।

চৈতন্য। ইহা সাধনার সুন্দর কথা, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ বলিলেন, "ইহার পর সাধনার বিষয় জানিতে চায় আমি

এমন লোক ত এ সংসারে দেখি নাই। তবে রাধাপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" তিনি রাধাপ্রেমের নিগূঢ় তত্ত্বের কথা বলিলে, শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এখানে আসা আমার সার্থক হল।"

সে-দিবস এইরূপে রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সমস্ত রজনীই ভক্তিবিষয়ক প্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল। শ্রীচৈতন্য রামানন্দ রায়ের রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তির উচ্চ অঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া, গাঢ়রূপে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভাতে রামানন্দ রায় বিদায় কালে শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, "যদি কৃপা করিয়া এখানে পাতকীর উদ্ধারের জন্য আসিয়াছ, তবে আরও দশ দিবস অপেক্ষা কর।" শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "তোমার জন্য দশ দিবস কি, তোমার জন্য এ জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারি।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর রামানন্দ রায় চৈতন্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপন ভবনে গমন করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইলে, রামানন্দ রায় আবার চৈতন্য সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় আবার ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। শ্রীচৈতন্য রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদ্যার মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার?"

রামানন্দ। কৃষ্ণভক্তির সম আর বিদ্যা নাই।

চৈতন্য। কোন্ কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিক বলিয়া যাঁহারা খ্যাত; তাঁহাদের কীর্ত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

চৈতন্য। সম্পত্তির মধ্যে কোন্ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ। যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে প্রেম আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিশালী।

চৈতন্য। দুঃখের মধ্যে প্রধান দুঃখ কি?

রামানন্দ। কৃষ্ণভক্তি বিহনে মানবের আর দুঃখ নাই।

চৈতন্য। কোন্ জীবকে মুক্ত বলা যায়?

রামানন্দ। যাহার কৃষ্ণপ্রেমে সাধনা হইয়াছে, সেই মুক্ত।

চৈতন্য। সঙ্গীতের মধ্যে কোন্ সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ ?

রামানন্দ। যে সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি আছে।

চৈতন্য। শ্রেয়ের মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের সার ?

রামানন্দ। কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা আর শ্রেয়ঃ নাই।

চৈতন্য। মানব সর্ব্বদা কাহার স্মরণ লয় ?

রামানন্দ। কৃষ্ণনাম গুণ লীলা।

চৈতন্য। ধ্যেয়ের মধ্যে মানবের কোন্ বস্তু প্রধান ধ্যেয় ?

রামানন্দ। রাধাকৃষ্ণের চরণ ধ্যানই প্রধান।

চৈতন্য। জীবের কোথায় বাস করা কর্ত্তব্য ?

রামানন্দ। শ্রীবৃন্দাবন ভূমিই বাসের শ্রেষ্ঠ।

চৈতন্য। শ্রবণের মধ্যে কোন্ কথা শ্রবণের শ্রেষ্ঠ উপযোগী ?

রামানন্দ। রাধাকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন।

চৈতন্য। উপাস্যের মধ্যে কাহার উপাসনা প্রধান ?

রামানন্দ। রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ।

শ্রীচৈতন্য রামানন্দ রায়কে বলিলেন, "এখানে আসিয়া তোমার নিকট হইতে আমি রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তির নব নব তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম।" রামানন্দ রায় বলিলেন, "প্রভো! তোমার মুখ দিয়া তুমি তোমার কথাই প্রকাশ করিলে। তুমি নিজেই রাধা প্রেমতত্ত্বের বক্তা ও নিজেই শ্রোতা।"

ভক্তিপ্রসঙ্গে উভয়ে মাতোয়ারা, এমন সময়ে রাজা রামানন্দ রায় বলিলেন, "আমি প্রথমে তোমাকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর তোমার সে রূপ দেখিতেছি না। তোমার শ্যামরূপের নিকটে সোনার প্রতিমার ন্যায় পঞ্চালিকা রহিয়াছে। তাঁহার উজ্জ্বল জোতিতে তোমার দেহ আলোকিত হইয়াছে।" চৈতন্য বলিলেন, "রাধাকৃষ্ণের প্রতি তোমার প্রেম অসাধারণ, সেইজন্য সকল বস্তু দর্শনেই তোমার হৃদয়ে

কৃষ্ণপ্রেমের স্ফূর্ত্তি হয়।” কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তৎপর ঈষৎ হাস্য করিয়া রসরাজ ও মহাভাব এই দুই ভাবে রামানন্দের নিকট প্রকাশিত হন। রামানন্দ রায় সে রূপ দর্শনে আনন্দের আবেগে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তাঁহার চেতনা হইল; তিনি পুনরায় শ্রীচৈতন্যকে সন্ন্যাসীর বেশে দর্শন করিলেন। দশ দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইলে, উভয়ের বিদায়কালে রামানন্দ রায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; প্রভু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, “তুমি পুরীতে যাইও, আমি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তথায় যাইব; উভয়ে কৃষ্ণপ্রসঙ্গে দিন কাটাইব।” তাই চৈতন্যচরিতামৃতে,—

“বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে;
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে।
দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে;
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণ কথা সঙ্গে।”

রাজা রামানন্দ রায় প্রভুর বিচ্ছেদে বিষাদিত অন্তরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিশাবসানে বিদ্যানগর পরিত্যাগ করিয়া দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নানা তীর্থে

"দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ ;
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন।
সে সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈলা ;
সেই ছলে সে দেশের লোক নিস্তারিলা।"

—চৈঃ চরিতামৃত।

ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যানগর (১) হইতে গোবিন্দ দাসকে সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন। গোবিন্দ দাস প্রভুর দক্ষিণাপথ ভ্রমণের সাথী হইয়া কড়চায় অনেক স্থানের অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কয়েক দিবস পরে প্রভু মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে গমন করিলেন। এখানে দেবমন্দিরে প্রবেশ করতঃ তিনি মহেশকে দর্শন করিলেন। তিনি যেখানেই গমন করিতেন, সেখানেই তাঁহার ভক্তির লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া লোকে বিমোহিত হইত। মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে তাহাই হইল। বহুলোক তাঁহার দর্শনে তাঁহার ভগবদ্ভক্তির জীবন্ত নিদর্শন পাইয়া তাঁহারই পথ অনুসরণ করিল। প্রভু তথা হইতে আহোবলে গমন করিয়া নৃসিংহ দর্শন ও তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক সিদ্ধবটে আসিয়া রাম-সীতা দর্শন করেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইলে, অনেকে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আগমন করিল। এখানে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে আগ্রহপূর্ব্বক আপন ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন।

---

(১) বিদ্যানগর—রাজমহেন্দ্রীর অপর নাম বিদ্যানগর।

গৌর তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া স্কন্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া স্কন্ধ দর্শন করিলেন। এখান হইতে তাঁহার পুনরায় সিদ্ধবটে প্রত্যাগমন করিবার বাসনা হইলে, তিনি তথায় আসিয়া সেই রামভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। বিপ্র তাঁহাকে অতি সমাদরে ও ভক্তি সহকারে আপন বাটীতে স্থান দান করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হন। গৌর দেখিলেন, গৃহস্বামী পূর্ব্বে রাম নাম জপ করিতেন, কিন্তু এখন তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার রসনা হইতে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইতেছে। তিনি এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া অবধি, আমার মনের কেমন এক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে; আমার জিহ্বা হইতে রাম নামের পরিবর্ত্তে আপনাপনিই কৃষ্ণনাম বহির্গত হইতেছে।"

যথা, চৈতন্য চরিতামৃতে,—

"বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥
সেই হইতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥"

এই বলিয়া নূতন কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ, গৌরের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুবারি ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "আমি তোমারই মধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিতেছি।" গৌর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধ কাশীতে আসিয়া শিব দর্শন করিলেন, এবং এখান হইতে কোন নিকটবর্ত্তী গ্রামে গমন করিলেন। এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই তার্কিক, বৈদান্তিক ও মায়াবাদী। চৈতন্যদেব তথায় উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু গৌরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে সকলেই পরাভব স্বীকার করিয়া, তদীয় মধুময় ভক্তিপথের পথিক হইয়া পড়েন।

এস্থলে একজন বৌদ্ধাচার্য্য বাস করিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য

ছিল। বৌদ্ধাচার্য্য গৌরকে পরাস্ত করিবার মানসে তাঁহার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। স্বামীকে পরাস্ত হইতে দেখিয়া, তাঁহার শিষ্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া এক অবৈধ উপায় অবলম্বন করেন। চৈতন্যচরিতামৃত-লেখক বলেন, তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া একটি থালে, উচ্ছিষ্ট অন্ন পূর্ণ করিয়া, কোন ব্যক্তির দ্বারা শ্রীচৈতন্যের নিকট প্রেরণ করেন। সেই সময় একটি পক্ষী চঞ্চু দ্বারা থালাটি তুলিয়া লইয়া যায়, এবং উচ্চ স্থল হইতে টেরচাভাবে বৌদ্ধ গুরুর মস্তকে সজোরে নিক্ষেপ করে। থালার আঘাতে আচার্য্যের মস্তক কাটিয়া রুধির-ধারায় অঙ্গ প্লাবিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বৌদ্ধাচার্য্য ও তদীয় শিষ্যগণ গৌরের শরণাগত হইয়া, বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

গৌর ত্রিমন্দ নগরে গমন করিলেন। তথায়ও অনেক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বাস করিতেন। তিনি তথায় গমন করিলে, বৌদ্ধেরা তাঁহার সহিত বিচারার্থী হইলেন। ত্রিমন্দ নগরের রাজা এই বিচারের মধ্যস্থ হইলেন। তিনিও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধেরা বিচারে পরাস্ত হইলেন। বৌদ্ধদিগের শীর্ষস্থানীয় রামগিরি ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যের বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও অদ্ভুত ভক্তির লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া কাতরান্তরে বলিতে লাগিলেন, "নবীন সন্ন্যাসি! তোমাকে দেখিয়া ত মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে না; আমি ঘোর পাষণ্ড, তোমাকে দেখিয়া আজ আমার হৃদয় গলিয়া গেল। আমি তোমারই সঙ্গে থাকিব। প্রভো! তুমি আমাকে মুক্তির পথ প্রদর্শন কর।"

তাই গোবিন্দ দাস কড়চায় লিখিয়াছেন,—

"তুমি ত মানুষ নহ নবীন সন্ন্যাসী।
থাকিতে তোমার সহ বড় ভালবাসি॥
পাষণ্ডের শিরোমণি ছিলাম সংসারে।
কৃপা করি ভক্তিমার্গ দেখাও আমারে॥"

চৈতন্যদেব বৌদ্ধাচার্য্যের ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মনে তাঁহাকে মধুময় হরিনাম দান করিলেন ; রামগিরি তাঁহার নিকট হইতে প্রাণপ্রদ ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবজীবন লাভ করিলেন ; তাঁহার শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির অমৃতধারা বহিতে লাগিল। ত্রিমন্দরস্থ সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিমার্গের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন ; বৌদ্ধগুরু রামগিরির শিষ্যবৃন্দও তাঁহাদের গুরুর পথানুসরণ করিলেন।

"পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ।
রামগিরি পথে সবে করিল গমন ॥"

রামগিরি গৌরের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে, ঢুণ্ডিরাম নামক এক সুবিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌর তার্কিকের চূড়ামণি হইলেও জ্ঞানের অস্ত্রে অনেকের জ্ঞানগর্ব্ব ছেদন করিতে অগ্রসর হইতেন না। ভক্তির স্নিগ্ধ ও মধুর ভাবে তিনি অহঙ্কারী জ্ঞানীদিগের জ্ঞানের গর্ব্ব প্রশমিত করিয়া তাঁহাদিগকে ভগবৎ প্রেমের জালে জড়িত করিয়া ফেলিতেন। ঢুণ্ডিরাম প্রভুর সহিত বিচারার্থী হইলে, তিনি অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ; আমি অজ্ঞ সন্ন্যাসী ; আমি তোমার সহিত বিচার করিতে সমর্থ হইব না, আমি তোমার নিকট পরাভব স্বীকার করিলাম বলিয়া জয়পত্র লিখিয়া দিতেছি।" গৌর এই সকল বাক্যে তাঁহার সহিত বিচারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, ঢুণ্ডিরাম এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যদেবের ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে ঢুণ্ডিরামের সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল, তিনি নবজীবনের পথে নীত হইয়া মধুময় হরিনাম গ্রহণ করিলেন। ঢুণ্ডিরামের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল ; সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জ্ঞানগর্ব্বিত ঢুণ্ডিরাম তখন হইতে হরিদাস নামে অভিহিত হইতেন।

পরদিন প্রাতে গোবিন্দ দাসকে সঙ্গে লইয়া, প্রভু তথা হইতে

বহির্গত হইলেন। গোবিন্দ খড়ম্ কোরঙ্গ বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। ভানু অস্ত গমন করিলে তাঁহারা বটেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, এবং ভক্তিভরে বটেশ্বর দর্শন করিয়া সেদিন অনাহারেই সেই স্থানে রাত্রিযাপন করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে প্রভু স্নান করিবার জন্য গমন করিলেন। গোবিন্দ ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য বহির্গত হইলেন। ভিক্ষা-সংগৃহীত বস্তুতে মধ্যাহ্নকালে প্রভু রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিলেন। আহারান্তে তাঁহারা বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে তত্রত্য কোন বিখ্যাত ধনী, এই নবাগত সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্য দুইজন কুলটা নারী সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। ধনীর নাম তীর্থরাম। নারীদ্বয়ের নাম সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই। অসচ্চরিত্রা নারীদ্বয় নবীন সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিল। তাহারা যখন দেখিল, তাহাদের মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত, তখন সত্য-বাই লোকসমক্ষে নারীর নির্লজ্জতা প্রদর্শন যতদূর সম্ভব, তাহা করিতে ত্রুটি করিল না; সে আপনার বক্ষের বস্ত্রাঞ্চল কতক উন্মোচন করিয়া প্রভুর চিত্তবিকারের চেষ্টা করিল। সত্যবাই এরূপ নির্লজ্জতার কার্য্য প্রদর্শন করিলে, প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তখন তিনি তাহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, আমাকে কেন অপরাধী করিবার জন্য এরূপ করিতেছ!" এই বলিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার মস্তকের জটাবন্ধন খুলিয়া গেল; শরীর রোমাঞ্চিত হইল; নয়নাশ্রুতে বক্ষ ভাসিতে লাগিল। এইরূপ পরীক্ষার অনলের মধ্যে কোন মানবসন্তান যে অবিকৃত হৃদয়ে থাকিয়া ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারে, কুলটা নারীদ্বয় তাহা কখন দর্শন করে নাই। সত্যবাই প্রভুর চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অবশেষে উভয়েই সেস্থান হইতে পলায়ন করিল।

তীর্থরাম সকলই দেখিলেন। তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখনই প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। প্রভু তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নৃত্য করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের মুখে অনুপম স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ও তাঁহার মনের অমানুষিক শক্তি দর্শনে তীর্থরামের হৃদয় মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তীর্থরামকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, প্রভু তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "সংসারের বিষয় বিভব সকলই অতি অসার; এই যে দেহ ধারণ করিতেছ, এই দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণ-পাখী যখন উড়িয়া যাইবে, তখন উহা ভস্মসাৎ হইবে, অথবা কীটের আধার হইবে; অথবা মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে। চক্ষু মুদিলে আর কেহ কাহারই নহে; সকল আত্মীয়তাই চলিয়া যাইবে। তুমি ধন, মান, বসন, ভূষণ সকলই দূরে ফেলিয়া দিয়া, সেই একমাত্র সত্য ও নিত্য বস্তু পরমেশ্বরেরই আশ্রয় গ্রহণ কর।"

শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যগুলি যেন যাদুকরের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল; যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া, মানব-জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ইহলোকের খ্যাতি ও ধনৈশ্বর্য্যকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন—যে ব্যক্তি অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই, চঞ্চল ও নির্লজ্জ যুবার ন্যায় নারীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, গৌর-সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তিনি এখন আর সে মানুষ নাই। তীর্থরাম, আপনার পত্নী ও আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অগাধ সম্পত্তি চরণাঘাতে শুষ্ক তৃণবৎ ঠেলিয়া ফেলিলেন। চিক্কণ বসন পরিত্যাগ করিয়া, কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক, হরিনামের তিলকে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহার গর্ব্বিত মস্তক ভক্তি ও বিনয়ে নত হইল। তীর্থরাম হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"তীর্থরাম তৃণ সম বিষয় ছাড়িয়া।
হরি বলি নাচে দুই বাহু পসারিয়া॥"

তীর্থরাম কৌপীন পরিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা তাঁহার ভবনে প্রবেশ করিলে, তাঁহার পরমাসুন্দরী পত্নী কমলকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার রূপের আলোতে যেন চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। তীর্থরাম-পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিলে, তীর্থরাম কমলের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "আমি নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তুমিই ভোগ কর।" পতির মুখ হইতে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কমলকুমারী ভূমিতে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তীর্থরাম তাঁহার পত্নীকে অত্যন্ত অধীরা দেখিয়া মায়াজাল ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে হরিনাম গ্রহণ করিতে বলিলেন। কমল দেখিলেন, স্বামীকে গৃহে ফিরাইবার চেষ্টা করা বৃথা; তখন নয়নের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তীর্থরাম সংসারের ধন মান ঐশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মধনে ধনী হইয়া পথ-ভিখারীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

"কাঁদিতে কাঁদিতে তবে কমলকুমারী।
ফিরে গেল তীর্থ হলো পথের ভিখারী॥"

—গোঃ দাস।

তীর্থরামকে ভক্তিপথাবলম্বী করিয়া, শ্রীচৈতন্য সাত দিবস পরে বটেশ্বর গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহাদিগকে এক নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিতে হইল। প্রভু বিভুগান কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই, কিন্তু গোবিন্দের প্রাণ সময়ে সময়ে ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রভুর পশ্চাতে যাইতে যাইতে তাঁহার সকল ভীতি ক্রমে বিদূরিত হইয়া গেল। দশ ক্রোশ ব্যাপী সেই নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিয়া তাঁহারা

মুন্নানগরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলে, পল্লীবাসী দুই জন গৃহস্থ তাঁহার সেবার জন্য আটা প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহারা প্রভুর মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার দিকে অনিমিষ নয়নে তাকাইয়া রহিল। এই নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে, নগরের লোকেরা দলে দলে তাঁহার দর্শন-লালসায় তথায় আগমন পূর্ব্বক সেই দেবসদৃশ যুবাপুরুষের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিতে লাগিল ; এবং তাঁহাকে অনেকেই বৃক্ষতল ছাড়িয়া আপনাদিগের বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগের সে আশা পূর্ণ করিলেন না। তিনি ভগবৎ-প্রেমে বিভোর। কিছুক্ষণ পরেই তিনি করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবে আগন্তুক লোকেরাও ভাবে বিভোর হইয়া উঠিল এবং শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠোত্থিত মধুর ধ্বনির সঙ্গে আপনাদিগের কণ্ঠ মিলাইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ রজনী কাটিয়া গেল। মুন্নানগরে অন্তঃপুরের মধ্যে এই নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা প্রবেশ করিয়াছিল, সেজন্য কুলবধূরা শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। দেখিয়া সকলেই বিস্মিত। এমন সুন্দর যুবাপুরুষ সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কৃচ্ছ্র সাধনে আপনার দেহকে শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তাহাদের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তাহারা গৌরসুন্দরের মনোহর গঠন ও অনিন্দিত রূপমাধুরী, কঠোর বৈরাগ্যের নিষ্পীড়নে রুগ্ন ও মলিন হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয় বলাবলি করিতে লাগিল। তাই গোবিন্দদাসের কড়চায়—

"অবশেষে কুল হতে কুলবধূগণে।
গৌরাঙ্গ দেখিতে আসি মিলে সেই স্থানে॥
দেখিয়া নয়ন মেলি গৌরাঙ্গসুন্দরে।
নারীগণ যাইতে না পারে ফিরে ঘরে॥

মুখ তাকাতাকি করি এ বলে উহারে।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রাণ আকু-বাকু করে ॥
এমন সুন্দর দিদি কভু দেখি নাই।
ইহাকেই বলে সবে চৈতন্য গোঁসাই ॥
আহা মরি না খাইয়া অস্থিচর্ম্মসার।
এ বয়সে বাঁধিয়াছে কেন জটা-ভার ॥
এই কথা বলি যত মুন্নাবাসী নারী।
কাঁদিয়া আকুল হলো চক্ষে বহে বারি ॥”

সেদিন ও সেরাত্রি এইরূপেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে প্রভু অন্য স্থানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক অন্নক্লিষ্টা, ছিন্নবস্ত্র পরিধেয়া বৃদ্ধা নারী গৌরাঙ্গের নিকট আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধাকে দেখিয়া চৈতন্য গোঁসাইয়ের হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। তিনি ভিক্ষার্থিনীর বাসনা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে মুন্নাবাসী নরনারীদিগের নিকট হইতে খাদ্য ও বস্ত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাঁহার চরণে লোকে কোন বস্তু উপহার প্রদান করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, আজ তিনি স্বয়ং ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই বিবিধ খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্রাদি আনিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিল। এইরূপে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্র সংগৃহীত হইলে, শ্রীচৈতন্যদেব বৃদ্ধাকে সকলই প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আশাতীত ফললাভে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া দাতাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। মুন্নাবাসীরা তখন শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয়ের প্রত্যক্ষ নিদর্শন লাভ করিল।

বৃদ্ধার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব সে-স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। গোবিন্দও তাঁহার কৌপীন ও কোরঙ্গ লইয়া সঙ্গে চলিলেন।

মুন্নাবাসী বহুলোক শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। কিন্তু তিনি একবারও পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বিভুনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়া একে একে সকলেই আপনাপন গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। এক ব্যক্তি আর ফিরিলেন না; তাঁহার নাম রামানন্দ স্বামী। শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়া তাঁহার সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তিনি যাইতে যাইতে গোবিন্দকে বলিলেন, "প্রভুকে দেখিয়া আমার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে, তিনি যদি আমাকে শিষ্য না করেন, তাহা হইলে, আমি এ দেহ আর রাখিব না।"

তাঁহারা যাইতে যাইতে বেঙ্কট নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সুবিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। নাম রামানন্দ। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিচারার্থী হইলে, তিনি প্রথমে আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু রামানন্দ কিছুতেই ছাড়িলেন না। গৌর অগত্যা বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বাধিয়া গেল। বিচারে পণ্ডিত রামানন্দই পরাস্ত হইলেন। তাঁহার জ্ঞানের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল। চৈতন্যদেবের বুদ্ধির প্রখরতা ও ভগবৎ ভক্তির নিদর্শন পাইয়া রামানন্দ অদ্বৈতবাদের গণ্ডী পরিত্যাগপূর্ব্বক কুসুমিত ভক্তি-পথ অনুসরণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপে তিন দিন বেঙ্কট নগরে অবস্থিতি করিয়া সকলকে প্রেমরসে মত্ত করিয়া তুলিলেন। বৈদান্তিক রামানন্দের শিষ্যেরাও তাঁহাদের গুরুর পথ অনুসরণ করিয়া ভক্তি-পথাবলম্বী হইলেন।

পাপীদিগের জন্য সর্ব্বদাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাণ ক্রন্দন করিত। নরনারীকে শান্তিময় ভক্তিপথে পরিচালিত করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। বেঙ্কট নগর পরিত্যাগ করিবার সময় তিনি শ্রবণ করিলেন,

তথা হইতে কিয়দ্দূরে এক নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পন্থভীল নামে এক দস্যু বাস করে। প্রভু তাহার কথা শ্রবণ মাত্র তথায় যাইতে উদ্যত হইলে সকলে পন্থভীলের ভীতিজনক স্বভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিল, "সে আপনার সঙ্গীদিগকে লইয়া পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও জীবন বিনাশ করিয়া থাকে। তুমি সেখানে কখনই যাইও না।" পাপীর বন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সেই অরণ্যের দিকে ধাবিত হইলেন। তদীয় সহচর গোবিন্দদাসও প্রভুর সাথী হইলেন। এই নিবিড় জঙ্গলের নাম বগুলা। প্রভু বনে প্রবেশ করিলে, পন্থ শ্রীচৈতন্যকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া উপবেশন করিতে বলিল। তিনি দস্যু-পতির নিকট উপবেশন করিয়া বলিলেন, "তুমি সাধু পুরুষ; সংসারের সকল মায়া ও নারী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপনার বন্ধুদিগের সঙ্গে অতি সুখেই এই নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে বাস করিতেছ। আমি তোমাকে দেখিবার জন্যই এখানে আগমন করিয়াছি।" পন্থ, গৌরের মনোহর মূর্ত্তি ও এই সকল মধুমাখা কথা শ্রবণ করিয়া মস্তক নত করিয়া রহিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। গৌর অমনি তাহাকে আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়া তাহার কর্ণ-কুহরে সেই পাপতাপহারী মধুর হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই নবীন সন্ন্যাসীর কণ্ঠনিঃসৃত সে নামের ধ্বনি যেন পন্থভীলের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পাষাণসম প্রাণ দ্রবীভূত হইল; সে নবজীবন লাভ করিয়া, নূতন মানুষের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে বিভুগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। গুরুর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শনে তদীয় সহচরেরা অবাক্ হইয়া গেল, এবং তাহারাও ঐ নামের শক্তিতে জীবন লাভ করিয়া হরিনাম করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল। হরিনামের ধ্বনিতে নিস্তব্ধ নিবিড় জঙ্গল প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দস্যুনিবসিত অরণ্য যেন আনন্দ-কাননে পরিণত

হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ পন্থভীল ও তাহার শিষ্যদিগকে উদ্ধার করিয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাইতে বিলাইতে চলিতে লাগিলেন। যে তাঁহাকে একবার দেখিত, তাহারই চিত্ত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। প্রভু যাইতে যাইতে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনাহারে সেই বৃক্ষতলে তিন দিবস কাটিয়া গেল। শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহার রসনা পবিত্র ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে বিরত নহে। তিন দিবস পরে এক বৃদ্ধা নারী আটা ও দুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভু ও গোবিন্দদাস তাহাতেই সে-দিন ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া গিরীশ্বর শিব দর্শন মানসে গমন করিলেন। এখান হইতে সে দেবমন্দির তিন ক্রোশ। তিনি সেই মন্দির সমীপে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরটির নিকট একটি প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষ ছিল। গোবিন্দদাস বলেন, গাছটির শাখা প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। গৌর সেই শত শত শাখা ও পত্রবিশিষ্ট বিল্ববৃক্ষ হইতে পত্র তুলিয়া ভক্তিভরে শিবকে অঞ্জলি দান করিলেন। সেখানে দুই দিবস অবস্থিতির পর গৌর দেখিলেন, এক সন্ন্যাসী পর্ব্বত-শিখর হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরে শিবারাধনা করিয়া পুনরায় পর্ব্বতারোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী মৌনব্রতধারী। তাঁহার ভিতরের জ্যোতি তাঁহার মুখে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে; তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে কেমন এক ভাবের সঞ্চার হইল। তাঁহার দর্শন লালসায় তিনি পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইলেন। গোবিন্দও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। গিরিশিখরে বৃক্ষতলে সন্ন্যাসী চক্ষু নিমীলিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি যথার্থ উদাসীন। শ্রীচৈতন্যদেব যোড়হস্তে তথায় দাঁড়াইয়া যোগিবরের স্তব করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া, তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। গৌর তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী আশ্রমাগত অতিথিদিগের জন্য পরটা নামক কয়েকটা সুমিষ্ট ফল আনিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান

করিলেন। গোবিন্দদাস বলেন যে, পরটা খাইয়া তাঁহার লালসা আরো বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া নিজের দুইটি ফল তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী ইহা দর্শন করিয়া পুনরায় কিয়দ্দূর হইতে আরো কয়েকটি ফল আনিয়া প্রভুকে প্রদান করিলেন।

নিস্তব্ধ নির্জ্জন পর্ব্বতোপরি নির্ঝরিণী কুলু কুলু রব করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে; পল্লবাবৃত তরুরাজির মধ্যে বিহঙ্গকুল আপনার মনে গান করিতেছে; প্রকৃতির এই রমণীয় স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব কি স্থির হইয়া থাকিতে পারেন, তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল। তিনি আনন্দে বিভুগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন; অবশেষে ভূতলে পতিত হইলেন। পাথরের আঘাতে মস্তক ফাটিয়া রুধির ধারায় তাঁহার শ্রীবদন অনুরঞ্জিত হইয়া পড়িল। এই অমানুষিক ভক্তিপ্রবণতা দর্শন করিয়া সন্ন্যাসীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনিও ভূতলে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। তাঁহারও নয়নযুগলের বারি-ধারায় শুভ্র শ্মশ্রু সিক্ত হইয়া গেল। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "তুমি ত মানব নহ, স্বয়ং ঈশ্বর।" কিন্তু চৈতন্য এইরূপ স্তুতিতে প্রীত না হইয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসিবর, একথা মুখে আনিও না।"

শ্রীচৈতন্যদেব তৎপর ত্রিপদিনগরে গমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি দর্শন করতঃ ভাবে বিভোর হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইলেন। তথায় মথুরা নামে এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অনেক শিষ্যসহ বাস করিতেন। তাঁহারা রামোপাসক; রামাইত বলিয়া পরিচিত। রামাইত সম্প্রদায়ের শীর্ষ-স্থানীয় মথুরা পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিচারার্থী হইলে, তিনি অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "পণ্ডিত! শুষ্ক বিচারে প্রয়োজন নাই; ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াবাদ, ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রভৃতি সুললিত ভাবে ব্যাখ্যা কর, শুনিয়া আমাদের প্রাণ শীতল হউক। তুমি সুপ্রসিদ্ধ তার্কিক,

আমি তোমার সঙ্গে বিচার করিতে অক্ষম।" এই বলিয়া প্রভু আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মথুরা পণ্ডিত ও তদীয় শিষ্যগণ শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এই দেবভাব দর্শন করিয়া তাঁহারাও সকলে হরিধ্বনি করতঃ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু রামোপাসকদিগকে আপনার মতাবলম্বী করিয়া পানানরসিংহ দর্শন মানসে ধাবিত হইলেন। মথুরা পণ্ডিত আপনার হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মানসে শ্রীচৈতন্যদেবের পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিলে, প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে আপন আশ্রমে গমন করিতে বলিলেন। চৈতন্যদেব পানানরসিংহ আসিয়া নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিলেন। দেবপুরোহিত মাধবেন্দ্র ভুজা নবাগত নবীন সন্ন্যাসীর গলে তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন। শর্করার সরবতে নৃসিংহদেবের সেবা হইয়া থাকে। চৈতন্যদেব ও গোবিন্দ সেই পানা-প্রসাদ লাভ করেন। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিয়া তাঁহারা পক্ষগিরিতে পক্ষতীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন। পক্ষগিরির পাদদেশে ভদ্রানদী প্রবাহিতা হইতেছে। গৌরসুন্দর সেই নদীতে অবগাহন করিয়া, কিছু জলযোগান্তে এক বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। নিশিতে শার্দ্দূল আসিয়া বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। গোবিন্দদাস পশুর রবে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলেন, গোরাচাঁদ ব্যাঘ্রের ভীষণ চীৎকারে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, আনন্দিত মনে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া গেল। প্রভুর মুখবিনিঃসৃত হরিনামের এই অপূর্ব্ব শক্তি দর্শন করিয়া গোবিন্দ বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

ভদ্রানদী হইতে প্রায় পঞ্চ ক্রোশ দূরে কালতীর্থে বরাহদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গৌর উহা দর্শন করিবার জন্য তথায় গমন করিলেন, এবং নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে বরাহদেবের অর্চ্চনা করিলেন।

তীর্থের এক পাণ্ডা ফুলের মালা আনিয়া তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। গৌরের চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি তথা হইতে সন্ধি-তীর্থে যাত্রা করিলেন। নন্দা ও ভদ্রা নামে দুইটি নদীর জলরাশি মিলিত হইয়া তথায় প্রবাহিত হইতেছে। তিনি তথায় স্নান করিলেন। তথাকার তীর্থস্বামীর নাম সদানন্দপুরী; তিনি সুবিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। শ্রীচৈতন্যদেব তথায় গমন করিলে, পণ্ডিত সদানন্দপুরী তাঁহার সহিত অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বিতণ্ডা উপস্থিত করিলেন। কিন্তু বিচারে পণ্ডিত সদানন্দ নবদ্বীপের দিগ্বিজয়ী গৌরের নিকট পরাভূত হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

"তুলিলা অদ্বৈতবাদ সদানন্দপুরী।
এক তর্কে পুরীর ভাঙ্গিল ভারিভুরি॥
অবশেষে সদানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া।
ভক্তিভরে প্রভুপদে পোলো লোটাইয়া॥"
গোঃ দাস।

শ্রীচৈতন্যদেব সদানন্দপুরীকে ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, চাঁইপালা তীর্থে গমন করিলেন। তথায় এক ভৈরবী বাস করিতেন। তাঁহার নাম সিদ্ধেশ্বরী। তাঁহার 'তখন বয়ঃক্রম প্রায় একশত বৎসর। কিন্তু এই দীর্ঘ বয়সেও, তাঁহার দেহের গঠন ও রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁহাকে শত-বর্ষীয়া নারী বলিয়া বোধ হইত না। তেজস্বিনী মহাতপা এক বিল্ব বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া, ভগবতারাধনায় রত থাকিয়া বহুদিন অতি-বাহিত করিয়াছিলেন। এই মহাতপার অনতিদূরে শৃগালী ভৈরবী নামে আর এক তাপসী নদীর কূলে বসিয়া তপস্যা করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই যোগিনীদিগকে দর্শন করিয়া, কাবেরী নদীতটে গমন করতঃ নদীতে স্নানাবগাহন করিলেন। অপরাহ্লে প্রভুর অনুচর গোবিন্দ ভিক্ষার্থ বহির্গত

হইয়া কিছু আটা সংগ্রহ করিয়া আনিলে, গৌরসুন্দর ভিক্ষালব্ধ আটা লইয়া রুটি প্রস্তুত করিলেন। গোবিন্দও প্রভুর প্রসাদ লাভে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

শ্রীচৈতন্য তথা হইতে পরদিন প্রাতঃকালে বাহির হইয়া, নরনারীর নিকট হরিনাম বিলাইতে বিলাইতে চলিতে লাগিলেন, এবং নাগর নগরে আগমন করিলেন। সেখানে শ্রীরাম লক্ষ্মণের মূর্ত্তি দর্শনানন্তর প্রেমভরে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমানুরাগের বিষয় চারি দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িলে, দশ ক্রোশ দূর হইতে তাঁহার দর্শনলালসায় লোকে নাগর নগরে আগমন করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার প্রেমফাঁদে পড়িয়া গেল। কিন্তু তত্রত্য এক ব্রাহ্মণ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিল। সে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতি তীব্রভাবে তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল; অবশেষে তাঁহার কোমল অঙ্গে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, সমবেত জনমণ্ডলী ব্রাহ্মণের এই অসৎ ব্যবহারের জন্য সক্রোধে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব এই সুযোগে প্রহারোদ্যত ব্রাহ্মণকে সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমাকে প্রহার কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু একবার প্রাণ ভরিয়া হরিনাম কর; তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা।" গোবিন্দদাস, তাঁহার কড়চায়,—

"আমারে আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই।
প্রাণভোরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব ভক্তি, বিনয় ও ধৈর্য্য দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল। সে আপনার দুষ্কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িল, এবং প্রাণপ্রদ হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভক্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। গৌর

ব্রাহ্মণের উদ্ধার করিয়া তথা হইতে তাঞ্জোরে গমন করিলেন। তথায় ধলেশ্বর নামে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর আঙ্গিনায় একটি প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষতলে, অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য দর্শন করিলে, ঘোর সংসারাসক্ত বিষয়ীরও অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইত। গৌর এ সকল দর্শন করিয়া অনতিদূরবর্ত্তী চণ্ডালু নামক এক পর্ব্বতে গমন করিলেন। বৃক্ষলতাদি পরিবেষ্টিত এই গিরিগাত্রের বহু গহ্বরের মধ্যে অনেক সাধক, তপঃপরায়ণ ব্যক্তি ধ্যানস্তিমিত লোচনে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। গৌর সে-স্থান দর্শনার্থ গমন করিলে, তত্রত্য ভট্টনামে এক বিপ্র তাঁহাকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন। ভট্টের জীবনে ভক্তির ভাব দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বড় পুলকিত হইলেন।

এই চণ্ডালু পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত অরণ্যের মধ্যে সুরেশ্বর নামে এক সন্ন্যাসী শিষ্যসহ বাস করিতেন। এ-স্থান অতি রমণীয়। গিরিগাত্র বহিয়া নির্ঝরিণী কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছে। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরা এই রমণীয় ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও গমন করিতেন না। গ্রামবাসীরা তাপসদিগের জন্য আহার-সামগ্রী আনয়ন করিত। শ্রীচৈতন্যদেব এই রমণীয় স্থানে তিন দিবস বাস করিয়া, সন্ন্যাসী সুরেশ্বরকে হরিপ্রেমে মত্ত করিয়া পদ্মকোটে গমন করিলেন।

পদ্মকোটে অষ্টভুজা ভগবতীর মন্দির আছে। প্রভু তথায় গমন করতঃ ভক্তিভরে দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বহুলোক তথায় আগমন করিলে, তিনি সকলকে সংসার ও মানব-দেহের নশ্বরতা ও আত্মার অমরত্ব বিষয়ে উপদেশ দান করিলেন।

উপদেশান্তে যখন তিনি হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কোন বৈষ্ণব লেখক বলেন, তাঁহার মুখ-বিনিঃসৃত হরিনামের প্রভাবে বালক যুবা প্রভৃতি হরি-

প্রেমে ক্ষেপিয়া উঠিল ; অষ্টভুজা দেবী দুলিতে লাগিলেন। বায়ু পদ্মগন্ধ বহন করিতে লাগিল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল, নারীরা পুষ্প লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল।

যখন শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিপ্রবণতায় পদ্মকোট বিলোড়িত হইতেছে, তখন এক অন্ধ, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিল, "প্রভো! তুমি মানব নহ, ভগবতী স্বয়ং স্বপ্নে আমার নিকট এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন।" অন্ধ এইরূপে তাঁহাকে মানবের পরিত্রাতা জ্ঞানে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব করুণা-পরবশ হইয়া দুই বাহুপাশে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার অঙ্গস্পর্শে অন্ধ চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া, গৌরের মোহন মূর্ত্তি দর্শনে এমনই বিমোহিত হইয়া পড়িল যে, তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল, এবং সেই অচৈতন্যাবস্থায় সে চিরদিনেব জন্য চক্ষু নিমীলিত করিল।

শ্রীচৈতন্য পদ্মকোট পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপত্র নগরে গমন করিলেন। সেখানে অনেক শৈবধর্ম্মাবলম্বী বাস করিতেন। শৈবদিগের অগ্রণী ভর্গদেব একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিভাব দর্শন করিয়া ভর্গদেব বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। চৈতন্য বৃদ্ধ সুপণ্ডিত ভর্গদেবের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আমি সামান্য মানব ভিন্ন আর কিছুই নহি। আমি তীর্থ স্থান দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি ; তোমরা সকলে হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া, আনন্দে নৃত্য কর, তাহা হইলেই, আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইবে।"

শৈবধর্ম্মাবলম্বী ভর্গদেব ও তদীয় শিষ্যবৃন্দ শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত ভক্তিমার্গ গ্রহণ করিয়া, হরিগুণ কীর্ত্তনে আপনাদের রসনা নিয়োগ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া সহস্র সহস্র লোক তাঁহার নিকট আগমন করতঃ তাঁহার অমানুষিক ভক্তিভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, বৈষ্ণবধর্ম্ম

গ্রহণ করিতে লাগিল। চৈতন্যদেব এইরূপে এক সপ্তাহকাল তথায় বাস করিয়া সকলকে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা করতঃ সে-স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ভর্গদেব তাঁহার অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন; সহস্র সহস্র লোকে হরিনামের ধ্বনিতে চারিদিক যেন আলোড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু চৈতন্যদেব ভর্গদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, মিষ্ট বচনে, তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। ভর্গদেব বিদায় গ্রহণ করিলে, বহুসংখ্যক তরলমতি বালক তথায় উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, "ভাই, ও ক্ষেপা, এস আমরা সকলে হরি হরি বলে' উহাকে ক্ষেপাইয়া তুলি।" বালকেরা আমোদ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পশ্চাতে হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল; তিনিও বালকদিগের উচ্চ হরিধ্বনির সঙ্গে আপনার কণ্ঠ মিশাইয়া হরি হরি বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"আরম্ভিল ক্ষেপাইতে যত শিশুগণ।
সেই সঙ্গে নাচে প্রভু শচীর নন্দন॥"

গোঃ দাস।

শ্রীচৈতন্যদেব ত্রিপত্র নগর হইতে ঝারিবনে প্রবেশ করিলেন। এ বন বহুদূরব্যাপী। নানাজাতীয় বৃক্ষে পূর্ণ রহিয়াছে; কত পাখী এই নিস্তব্ধ বিজন বনে বৃক্ষের শাখায় বসিয়া মুক্তকণ্ঠে গান করিতেছে। ভক্তশ্রেষ্ঠ শচীনন্দন জনকোলাহলশূন্য এই অরণ্যের মধ্য দিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। এ অরণ্যে কেবল গোবিন্দদাসই তাঁহার একমাত্র সাথী। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, এ অরণ্যের মধ্যে কেবল মাত্র ফল খাইয়াই তাঁহারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। তিন দিবস পরে এক দল সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল; শ্রীচৈতন্যদেব গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীরঙ্গধামে গমন করিলেন। তথায় শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন ও নৃত্য কীর্ত্তনাদি করিলে,

বেঙ্কটভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আপন ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভট্ট তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া এত প্রীত হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে চারি মাস কাল আপন ভবনে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রভুও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করতঃ চারি মাস কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া, গোদাবরীতে স্নান ও নাম কীর্ত্তনাদি করিয়া সময় অতিবাহিত করিলেন। প্রভু বেঙ্কটভট্টের বাড়ীতে যখন অবস্থিতি করেন, তখন বেঙ্কটভট্টের গোপাল নামে একটি অল্পবয়স্ক পুত্র, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের রূপমাধুরী ও মধুর ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে গোপালের ভক্তিভাব ক্রমে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি মাতা পিতার স্বর্গারোহণের পর সংসার পরিত্যাগ করতঃ শ্রীচৈতন্য দেবের পথানুসরণ করিয়া ভক্তসঙ্গে ও হরিগুণ কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ দেবমন্দিরে বসিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত নিত্য গীতা পাঠ করিতেন। কিন্তু তাঁহার পাঠ অশুদ্ধ হইত বলিয়া লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। একদিন চৈতন্যদেব তাঁহার গীতা পাঠ শ্রবণার্থ গমন করিলেন। গমন করিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ ভক্তির সহিত গীতা পাঠ করিতেছেন। পাঠ করিতে করিতে যেন ভাবসাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন,—তাঁহার নয়নে বারিধারা বহিতেছে; তাঁহার শরীর ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছে। গৌর তদ্দর্শনে পাঠক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গীতা পাঠের সময় কোথা হইতে এত আনন্দ লাভ কর?" ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন, "আমি যখন গীতা পাঠ করি, তখন দেখি, অর্জ্জুনের রথে নবদূর্ব্বাদল শ্যাম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রজ্জু ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন—আর অর্জ্জুনকে উপদেশ দান করিতেছেন। আমি যতক্ষণ পাঠ করি, ততক্ষণই, সেই মনোহর দৃশ্যই আমার চক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত থাকে। এই জন্য গীতা পাঠ আর ছাড়িতে পারি না।" শ্রীচৈতন্যদেব

তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তুমিই গীতা পাঠের যথার্থ অধিকারী" এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। ব্রাহ্মণও প্রভুর চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমারই মধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছি।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে পুনানগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ত্যসচ্ছর নামে সরোবরের তটস্থ একটি বকুল গাছের তলায় উপবেশন করিলেন। পুনানগর বহু পণ্ডিতের আবাসভূমি। তথায় নবদ্বীপের ন্যায় বহু চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। গীতা ও ভাগবত শাস্ত্রে অনেকেই সুদক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন। এই জ্ঞানচর্চ্চার স্থানে তিনি উপস্থিত হইলে একজন ব্রহ্মবাদী পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। জ্ঞান বিচারে লোককে পরাস্ত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, ভগবদ্ভক্তির মধুর রসাস্বাদন করানই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার ভক্তি ভাবের বিবিধ লক্ষণ দর্শন করিয়া, ক্রমে বিষ্ণুভক্ত ও অন্যান্য লোকেরা সমবেত হইতে লাগিল। সকল স্থলেই লঘুচেতা লোক দৃষ্ট হয়। প্রভুর অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমানুরাগ দর্শন করিয়া, কোন লোক জলাশয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "তোমার কৃষ্ণ এই জলাশয়ের জলের ভিতর বাস করিতেছেন।" এই কথা বলিবামাত্র তিনি যেন অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং সেই কৃষ্ণধন লাভ করিবার জন্য জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে বহু ব্যক্তি প্রভুর উদ্ধারের জন্য সরোবর মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়া তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করিল। তাই প্রভুর সাথী গোবিন্দদাস বলিতেছেন,—

"এইবারে মহাপ্রভু শুনি তাঁর বাণী।
প্রেমাবেশে জলে ঝাঁপ দিলেন আপনি॥

সরোবর মধ্যে পড়ি বহুতর লোক।
ডাঙ্গায় প্রভুরে তুলি করে নানা শোক॥”

যে-ব্যক্তির কথায় গৌর জলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাকে সকলেই তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু মহাপ্রভু অতি বিনীতভাবে মধুর বচনে বলিলেন, “কেন তোমরা সকলে ও-ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করিতেছ, এমন স্থান কি আছে, যথায় কৃষ্ণ বিরাজ করেন না? তিনি যে জলে স্থলে, সকল জায়গাতেই বিরাজ করিতেছেন, যে-ব্যক্তি তাঁহাকে এই পৃথিবীর সকল স্থলেই দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ ভক্ত।” তাই গোবিন্দদাস তাঁহার কড়চায় বলিতেছেন,—

“যেইজন ব’লেছিল কৃষ্ণ আছে জলে।
সমস্ত পণ্ডিত তারে মন্দ কথা বলে॥
প্রভু বলে কেন বৃথা ভর্ৎস মহারাজে।
জলে স্থলে শূন্যে কৃষ্ণ নিয়ত বিরাজে॥
আশে পাশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগময়।
সেই দেখিবারে পায় যেই ভক্ত হয়॥”

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এখানে ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে কেমন পরিষ্কার মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ইষ্ট দেবতা শ্রীকৃষ্ণ কোন বিশেষ স্থলে বা দেশে আবদ্ধ নহেন, ইহাই তিনি প্রকাশ করিলেন।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পতিতোদ্ধার

শ্রীচৈতন্যদেব তৎপর জিজুরী নগরে গমন করিলেন। এখানে খাণ্ডবা নামে এক দেবতার মন্দির ছিল। এই দেবতার সেবার জন্য অনেক অনূঢ়া নারী এখানে বাস করিত। খাণ্ডবার সেবা-দাসীরা আজীবন চিরকুমারী থাকিয়া খাণ্ডবার পত্নী বলিয়া পরিচয় দান করিত। ইহারা মুরারী নামে কথিত হইত। চির-কৌমার্য্য বড় কঠিন ব্রত; এই নারীরা মানব-স্বভাব-দুর্ব্বলতা বশতঃ চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিয়া অসৎ পথ অবলম্বনে জীবন ধারণ করিত। কিন্তু ইহাদের কলঙ্কিত চরিত্রের কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কোন বিপদসঙ্কুল স্থানে যাইতে লোকে স্বভাবতই যেমন ভীত হয়, সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাও ইহাদিগের পল্লীতে গমন করিতে সেইরূপ ভীত হইতেন। জিজুরী নগরে অবস্থানকালীন, এই চিরকুমারীদিগের অপবাদের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি তাহাদিগের নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এমন সুন্দর পবিত্রচেতা যুবাপুরুষ এই নরকতুল্য স্থলে কিরূপে গমন করিবেন, এই মনে করিয়া, সকলেই তাঁহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিলেন। যিনি বিশ্ববিজয়ী ভগবানের মধুর নাম কীর্ত্তন করিয়া মানবকে পবিত্রতার পথে পরিচালিত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কি এই বিপথগামিনী নারীদিগের চরিত্রস্খলনের কথা শ্রবণ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? তিনি কাহারো বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাহাদিগের

বাসস্থানে উপনীত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বেই জিজুরী নগরে চৈতন্যদেবের গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, দেবদাসী মুরারীরা, তাঁহার দর্শনার্থ আগমন করিল। মলিন পঙ্কিলময় স্থানে যেমন শ্বেত শতদল শোভা পায়, মুরারীদিগের মধ্যে ভগবদ্ভক্ত, নির্ম্মলচরিত্র শচীকুমার সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মুরারীগণ এই নবাগত সন্ন্যাসীর দেবোপম সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া গেল। চৈতন্যদেব সকলকে পবিত্র হরিনাম গ্রহণ করিয়া পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে বলিলেন,—নামের স্বর্গীয় অনল-শিখায় আপনাদিগের পাপরাশি ভস্ম করিতে বলিলেন। ইন্দিরা বাই নাম্নী এক নারী প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া করজোড়ে আপনার কলঙ্কিত জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বিলাপ করিতে করিতে বলিল, "প্রভো! আমাকে তোমার পদধূলি দিয়া উদ্ধার কর।" এই বলিয়া ইন্দিরা ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া নিজ অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত করিয়া ফেলিল। শ্রীগৌরাঙ্গ বেশ জানিতেন, পতিতপাবন পরমেশ্বরের নামই পাপীর নবজীবন লাভের একমাত্র উপায়; তিনি তাঁহাকে সেই পাপতাপহারী পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে বলিলেন। ইন্দিরা অকপট হৃদয়ে, ভক্তিভরে সে নাম গ্রহণ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেল।

ইন্দিরার এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া, তাহার সঙ্গিনীরাও সেই পবিত্র নাম গ্রহণে আপনাদের জীবন সার্থক করিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে চৈতন্যদেব মুরারীদিগের মধ্যে এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতে তিনি চোরানন্দি বনে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সকলে তাঁহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিল। তাহরা বলিল, "ঐ বনে এক ভয়ানক দস্যু বাস করে, তাঁহার নাম নারোজি। তাহার সঙ্গীরাও অতি ভীষণ প্রকৃতির লোক।" পল্লীবাসীরা সকলে নারোজির ভীষণ

চরিত্রের কথা বর্ণনা করিয়া তাঁহার মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিল, এবং বলিল, "সে বনে গমন করিলে, তোমার জীবনের আর আশা থাকিবে না।" কিন্তু প্রভু সকলের নিষেধ বাক্য শ্রবণ না করিয়া, সেই বিপদসঙ্কুল নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করতঃ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, অরণ্যবাসী নারোজির দুই একজন করিয়া শিষ্য সমবেত হইতে লাগিল। ক্রমে দস্যুপতি নারোজির নিকট এই নবাগত সন্ন্যাসীর সংবাদ উপস্থিত হইল। দস্যুপতি নারোজি তাহার রাজ্যমধ্যে সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় আগমন করিল। নারোজি তথায় আগমন করিলে, তাহার অনুচরেরাও ক্রমে ক্রমে সকলে তথায় আসিয়া সমবেত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনার ভাবেই বিভোর হইয়া হরিগুণ কীর্ত্তনেই রত রহিয়াছেন। দস্যুদলপতি তাঁহার ঈদৃশ ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার বাসভবনে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি ইহাতে স্বীকৃত না হইয়া বলিলেন, "বৃক্ষতলই আমার বাসের উপযুক্ত স্থান।" তখন নারোজির আদেশে তাহার শিষ্যেরা শ্রীচৈতন্যের নিকট বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিল। আনিলে কি হইবে, তাঁহার সেদিকে দৃষ্টি নাই; হরি-প্রেম-সুধা পান করিয়া তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন। বনজাত নানাপ্রকার ফলমূল ও বিবিধ খাদ্য দ্রব্য তাঁহার সম্মুখে সজ্জিত করা হইলে, তিনি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পদাঘাতে খাদ্যসামগ্রী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নারোজি দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতেছে; আর ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে অতীত পাপের স্মৃতি উদিত হইয়া, অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ করিয়া দিতেছে। সেকি আর স্থির থাকিতে পারে? দস্যুপতি কাঁদিতে কাঁদিতে চৈতন্য-দেবের চরণ ধরিয়া বলিল, "প্রভো, আমার বয়স হইয়াছে, এজীবনে অনেক অপরাধ করিয়াছি; এ হস্তে অনেক নিরপরাধী লোকের জীবন নাশ

করিয়াছি, আজ অন্তর্দ্দাহে হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে, উদ্ধার কর। আমি তোমার সঙ্গে যাইব এবং দাসের ন্যায় তোমার সেবা করিব।” কাতর প্রাণে এই সকল কথা বলিয়া দস্যুপতি কৌপীন পরিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের অনুগামী হইল। এ দৃশ্য দর্শন করিয়া নারোজির অন্যান্য শিষ্যেরা কে কোথায় চলিয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাবে চোরানন্দি বন নারোজিশূন্য—দস্যুশূন্য হইয়া পড়িল।

গৌর নারোজির উদ্ধার সাধন করিয়া খাণ্ডলা গমন করিলেন। গোবিন্দ-দাস ত তাঁহার সঙ্গের সাথী; নারোজিও প্রভুর সেবার্থ সঙ্গে চলিল। তাঁহারা সেখানে গমন করিলে বহু লোক আসিয়া তাঁহাদের নিকট সমবেত হইল, এবং চৈতন্যদেবের ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, সকলেই তাঁহাকে আপন ভবনে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। কেহ বলিল, “আমি তাঁহাকে অগ্রে দেখিয়াছি, তিনি আমার গৃহে গমন করিবেন।” কেহ বলিল, “আমি ভিক্ষা লইয়া আসিয়াছি, আমি তাঁহাকে লইয়া যাইব।” এইরূপে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল। প্রভু কাহারো ভবনে গমন করিলেন না। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদিতে তাঁহারা দিন কাটাইলেন; তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে যখন হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেই অশ্রুধারা যখন বক্ষঃস্থল বহিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন নারোজি যে হস্তে পূর্ব্বে পথিকের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া তাহার জীবন বিনাশ করিয়াছে, আজ সেই হস্তে ভক্ত-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নয়নের অশ্রুধারা মুছাইতে লাগিল। নিশাবসানে শ্রীচৈতন্যদেব নাসিক নগরে গমন করিলেন। কথিত আছে, এখানে লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন। নাসিক হইয়া তিনি পঞ্চবটী বনে গমন করিলেন। এই রামায়ণোল্লিখিত বনে প্রবেশ করিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেন। গোবিন্দদাস বলেন, তাঁহার প্রশান্ত মুখ-মণ্ডল হইতে যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে

আমি বিমুগ্ধ হইয়া সে মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। এদিকে নারোজি ফল মূল লইয়া উপস্থিত হইল। প্রভু অগ্রে কিছু আহার করিলেন, গোবিন্দ ও নারোজি প্রসাদ লাভ করিলেন। রজনী প্রভাতে গৌর পঞ্চবটী বন পরিত্যাগ করিয়া দমন নগর হইয়া সুরথ রাজার রাজ্যে গমন করিয়া অষ্টভুজা দেবী দর্শন করেন। দেবীর মন্দিরে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সন্ন্যাসী চৈতন্যের ভাব দর্শন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার ন্যায় সাধুপুরুষ জীবনে কখন দর্শন করি নাই। তুমি বল, আমি কিরূপে ভগবানকে লাভ করিব ও এই ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইব।" শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান করিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ দেবীর নিকট বলি দিবার জন্য একটা ছাগ লইয়া উপস্থিত হইল। চৈতন্যদেব তাঁহাকে ছাগবলির বিরুদ্ধে বিবিধ যুক্তি প্রদান করিয়া, নিরীহ ছাগের জীবন রক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণ, জীবের প্রতি চৈতন্যের দয়ার কথা শ্রবণ করিয়া, বলিদানে নিবৃত্ত হইল।

তৎপর তিনি তাপ্তী ও নর্ম্মদা তীরস্থ দেবমন্দিরাদি দর্শন করিয়া বরদা নগরে গমন করিলেন। এখানে নারোজি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। দয়ার অবতারস্বরূপ চৈতন্যদেব পীড়িতের গাত্রে স্নেহভরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার জীবনের গণা দিন ফুরাইয়া আসিল; সে তিন দিন পরে তাহার প্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া হরিনাম করিতে করিতে চিরদিনের জন্য চক্ষু নিমীলিত করিল—

"নারোজী মরণকালে জোড় হাত করি।
তাকায়ে প্রভুর দিকে বলে হরি হরি॥"

যাঁহার দেবোপম জীবনের প্রভাবে নারোজি, বহুদিনের পাপ ও অধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তাহার মৃতদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, এবং তৎপরে মৃত্তিকা মধ্যে সমাধিস্থ করিয়া উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সেখান হইতে তিনি অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে তিনি যোগা নামক একটি গণ্ড গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করতঃ ভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রেমোন্মত্ততার কথা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল; গ্রামবাসীদিগের আগমনে সেস্থান পূর্ণ হইয়া গেল। বালাজী নামক একজন লোক চৈতন্যদেবের ভক্তির ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে কপট বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল, এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। দর্শকবৃন্দ এই পাষণ্ডকে ঘোরতররূপে তিরস্কার করিয়া তাহার এরূপ দুর্ব্ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই! হরিনাম বিহনে ইহার অন্তর শুকাইয়া গিয়াছে। তোমরা সেই নামরসে ইহার প্রাণ শীতল করিতে যত্নবান হও।" এই কথা বলিয়া তিনি ঐ লোকটির নিকট গমন করিয়া তাহাকে মহামন্ত্র হরিনামে দীক্ষিত করিলেন।

অগ্নিতে বারি সিঞ্চন করিলে যেমন নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, হরিনামের প্রভাবে বালাজীর দুষ্ট প্রবৃত্তি সকলও সেইরূপ নিমিষে প্রশমিত হইয়া গেল। বালাজী প্রভুর চরণে প্রণত হইল। হরিনামে বালাজী নবজীবন লাভ করিল।

ঐ পল্লীতে বারামুখী নামে এক কুলটা নারী বাস করিত। বারামুখী পরমাসুন্দরী নারী। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অনেক ধনী লোক তাহার বাটীতে গমন করিয়া আপনাদের অপবিত্র বাসনা পরিতৃপ্ত করিত। বারামুখী যেমন রূপবতী তেমনি ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিল। সে এক রমণীয় বাটীতে বাস করিত, এবং অনেক দাসদাসী সর্ব্বদা তাহার পরিচর্য্যায় রত থাকিত। যে বৃক্ষতলে বসিয়া প্রভু হরিনাম কীর্ত্তনে রত হইয়াছিলেন,

তাহারই অনতিদূরে বারামুখীর ভবন। সে আপন ভবনের জানালা হইতে দেখিল, এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে। বহুজনতার মধ্যে তুষ্ট বালাজি এই সাধুপুরুষের প্রতি অতি অভদ্র ও অন্যায় ব্যবহার করিল; অথচ ইনি কিছুমাত্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করিয়া, তাহার কর্ণে কি এক মন্ত্র প্রদান করিলেন, যাহার গুণে সে নিমিষের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এ সকল ঘটনায় বিলাসিনী, বিপথগামিনী বারামুখীর নিকট কে যেন স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। সে নিজ জীবনের পাপের কালিমা ধৌত করিবার জন্য পাপের দুর্গন্ধময় স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের পারিজাতের সুগন্ধে প্রাণকে আমোদিত করিবার উদ্দেশে ব্যাকুল হৃদয়ে নিজ ভবন হইতে বাহির হইয়া পড়িল; এবং বহুজনাকীর্ণ লোকের মধ্যে গমন করিয়া, শ্রীচৈতন্য-দেবের নিকট আসিয়া বলিল, "তুমিই হরি, তুমিই কৃষ্ণ—আমি অধম পাতকী, আমায় পরিত্রাণ কর।" শ্রীচৈতন্য তাহাকে বলিলেন, "তুমি এই স্থানে তুলসীর কানন করিয়া, হরিনাম জপে ও সে নাম কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত কর।" বারবিলাসিনী বারামুখী সর্ব্বজন সমক্ষে তাহার দীর্ঘ কেশরাশি কর্ত্তন করিয়া ফেলিল, এবং অঙ্গের সমস্ত আভরণ ও সুন্দর পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ, সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিল। মিরাবাই নামে তাহার এক দাসী ছিল। বারামুখী সকলের সমক্ষে তাহাকে নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া ধর্ম্মে মতি রাখিবার জন্য উপদেশ দিল, এবং হরিপ্রেমানুরাগিণী হইয়া সন্ন্যাসিণীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

তাই গোবিন্দদাসের কড়চায় মিরার প্রতি নবকৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী বারামুখীর উপদেশটি এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

"কান দিয়া শুন মিরা আমার বচন।
তোমারে দিলাম মোর যত আছে ধন॥

ভালরূপ সেবা কোরো অতিথি আইলে।
হরিনামে মন দিও বসিয়া বিরলে ॥
না করিবে পাপ কর্ম্ম মোর দিব্য লাগে।
ভজিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম অনুরাগে ॥

* * * *

প্রভুর কৃপায় মোর কেটেছে বন্ধন।
আজ হইতে বাসস্থান তুলসী কানন।
এত বলি বারামুখী লয়ে জপমালা।
তুলসী কানন করে ভুলি সব জ্বালা ॥”

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় আজ এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপাপীর উদ্ধার সাধনে গৌর যেন যাদুকরের ন্যায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

প্রভু বারামুখীকে উদ্ধার করিয়া সোমনাথে যাত্রা করিলেন। তথায় গমন করিয়া, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দর্শনে ব্যথিত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, “হায়! মুসলমানেরা কি সর্ব্বনাশই করিয়াছে!” সোমনাথের উদ্দেশে তিনি ব্যাকুল ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, “দেব! তোমার অদর্শনে আমার প্রাণ যে ফাটিয়া যাইতেছে, কোথায় লুকাইয়া আছ একবার এস, তোমাকে দেখিয়া হৃদয় শীতল করি।” ভারতের এই প্রসিদ্ধ স্থান হইতে চৈতন্যদেব জুনাগড়, গৃনার পর্ব্বত, ঝারিখণ্ড প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দ্বারকানগরীতে গমন করিয়া, তাঁহার ভাবসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল, তিনি তথায় মন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ যখন প্রেমভরে মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন দ্বারকাবাসীরা তাঁহাকে কোন একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করে নাই; তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। তিনি এক সপ্তাহকাল এই প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে অবস্থিতি করতঃ হরি-

প্রেমরসে সকলের চিত্ত অভিষিক্ত করিয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে দর্শনীয় দুই একটি স্থান দর্শন করিয়া তিনি পুনরায় বিদ্যানগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণ যাত্রার প্রারম্ভে যাঁহার সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে এক সপ্তাহাধিক কাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, সেই রাজা রামানন্দ রায় প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং ভক্তিভরে প্রভুর চরণে প্রণিপাত করিলেন। প্রভু প্রেমভরে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া বলিলেন, "রায় আমার সঙ্গে চল, উভয়ে নীলাদ্রিনাথকে দর্শন করি।" রামানন্দ কয়েকদিন পরে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। প্রভু পরদিন গোবিন্দের সঙ্গে যাত্রা করিয়া ক্রমে আলালনাথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নীলাচলে ভক্তদিগকে পৌঁছানোর সমাচার প্রেরণ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলাচলে প্রত্যাগমন

আলালনাথে প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ভক্তদল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, গোপীনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে আনিবার জন্য মহোল্লাসে আলালনাথের দিকে ধাবিত হইলেন। ভক্তজনসহ তিনি যখন পুরুষোত্তমের সাগরতটে উপনীত হইলেন, তখন সার্ব্বভৌমাচার্য্য সমুদ্রোপকূলে উপনীত হইয়া প্রেম ও ভক্তিভরে প্রভুর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু ভক্তগণসহ জগন্নাথ দর্শনে গমন করিয়া তথায় ক্ষণকাল নৃত্য কীর্ত্তনাদিতে ক্ষেপণ করিলে, সার্ব্বভৌম তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আপন ভবনে গমন করিলেন। গৌর সার্ব্বভৌম-গৃহে গমন করিলে, ভক্তগণ বহুদিন পরে গৌরচন্দ্রের

দর্শনাভিলাষী হইয়া ভট্টাচার্য্য ভবনে আগমন করিলেন; গৌর সে রাত্রি ভক্তদিগকে লইয়া তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন।

যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাদ্রি ছাড়িয়া দক্ষিণ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন একদিন উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি, গৌড় দেশ হইতে এক অলোকসামান্য মহাপুরুষ নীলাচলে আগমন করিয়া তোমাকে ভক্তিপথে আনয়ন করিয়াছেন, আমি সেই ভক্তচূড়ামণিকে একবার দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।" রাজার গৌর দর্শনাভিলাষের কথা শ্রবণ করিয়া, ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, রাজদর্শনে কখনই সম্মতি দান করিবেন না; বিশেষতঃ তিনি এক্ষণে তীর্থ দর্শন মানসে দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছেন।" উৎকলাধিপতি গৌরের দক্ষিণাপথে তীর্থ দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "পুরুষোত্তমের ন্যায় তীর্থে আগমন করিয়া তিনি আবার কেন অন্যত্র তীর্থ দর্শনে বাহির হইলেন?" রাজার প্রশ্নোত্তরে তিনি বলিলেন, "মহাপুরুষদিগের লীলাই এইরূপ। তবে প্রভুর উদ্দেশ্য, তীর্থস্থান সকল পবিত্র ও পাতকী উদ্ধার করা।" প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের নিকট হইতে প্রভুর পাতকী তারণের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে কেন এখান হইতে অন্যত্র যাইতে দিলে, তাঁহার চরণ ধরিয়া কেন তাঁহাকে এখানে রাখিতে যত্ন করিলে না?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তিনি ত মানব নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার; তবে তিনি পর্য্যটনান্তে পুনরায় এই স্থানেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।" রাজা তাঁহার আগমনের কথা শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বলিলেন, "আমি যেন একবার তাঁহার দর্শনে জীবন সফল করিতে পারি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তিনি এখানে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার থাকিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র নির্জ্জন বাসস্থান দেওয়া আবশ্যক।" রাজা প্রভুর নির্জ্জন বাসস্থানের কথা শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্যকে কাশীমিশ্রের

ভবনে একটি নির্জ্জন কুটীর মনোনীত করিতে বলিলেন। ভট্টাচার্য্য রাজাদেশে এই প্রস্তাব লইয়া কাশীমিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইলে, কাশী-মিশ্র আনন্দসহকারে বলিলেন, "প্রভু আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য।"

ইতোমধ্যে প্রভু সার্ব্বভৌমের সঙ্গে একদিন জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন করেন। মন্দিরে অপরাপর ভক্তগণ মিলিত হইলে, প্রভু সকলকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। জগন্নাথ দর্শনান্তে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে কাশী-মিশ্রের ভবনে লইয়া আসিলেন। পূর্ব্ব হইতে তথায় তাঁহার একটি নির্জ্জন কুটীর নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাধনোপযোগী এই কুটীর দর্শনে প্রভু বড়ই প্রীতি-লাভ করিলেন। এখানে আগমন করিলে, গৃহস্বামী মিশ্র মহাশয় ভক্তিভরে তদীয় চরণে প্রণত হইলেন। অলিকুলের ন্যায় ভক্তবৃন্দ আসিয়া কাশী-মিশ্রের ভবন পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সহিত প্রেমালাপনে পরম আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। চন্দ্রমা যেমন তারকাবেষ্টিত হইয়া শোভা পায়, গৌরচন্দ্রও সেইরূপ ভক্তগণ সঙ্গে বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে রায় রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায়, তাঁহার চারি পুত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং পুত্রগণসহ প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন। প্রভু ভবানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "রামানন্দের ন্যায় পুত্ররত্ন তুমি লাভ করিয়াছ, তুমি সাক্ষাৎ পাণ্ডু সদৃশ, এবং তোমার পত্নী কুন্তি সদৃশা; তোমার পঞ্চ পুত্রও পঞ্চ পাণ্ডবের ন্যায়।" ভবানন্দ প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি বিষয়ী অধম, আমি আমার বিত্ত ও পঞ্চ পুত্র তোমারই চরণে সমর্পণ করিলাম।" ভবানন্দ তৎপর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে বাণীনাথকে তাঁহার সেবার জন্য নিয়োগ করিয়া বলিলেন, "আমার এই পুত্র বাণীনাথ তোমার পরিচর্য্যার জন্য এখানে রহিল, তোমার সেবার জন্য যখন যেরূপ ইচ্ছা হইবে অসঙ্কোচে ইহাকে তাহাই আদেশ করিবে।" প্রভু ভবানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার আত্মীয়ের

ন্যায়, তোমার কাছে আমার আবার সঙ্কোচ কি? আর কয়েকদিন পরে রামানন্দকে এখানে আনিব।" এই সকল স্নেহপূর্ণ বাক্য বলিয়া তিনি ভবানন্দকে আলিঙ্গন করিলে, ভবানন্দ বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভবানন্দ বাণীনাথকে তাঁহার সেবার জন্য নিকটে রাখিয়া গেলেন।

প্রভুর আগমনবার্ত্তা গৌড়দেশে প্রেরিত হইল। শোকাতুরা শচী দেবী পুত্র দক্ষিণাপথ ভ্রমণের পর নীলাচলে আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তপ্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। সংবাদদাতা নবদ্বীপের বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে গমন করিয়া এই শুভ সংবাদ প্রদান করিল। চারিদিকে এই বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অদ্বৈত-ভবনে তিন দিবস ধরিয়া মহোৎসব হইল। শ্রীবাসাদি ভক্তদিগের আনন্দের আর সীমা নাই। ভক্তগণ অদ্বৈত-ভবনে সমবেত হইয়া নীলাচলে গমনের যুক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই নীলাচলে যাইবার মনস্থ করিয়া শচীদেবীর নিকট গমন করতঃ তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। কুলীনগ্রাম হইতে সত্যরাজ, এবং রামানন্দ, মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন নীলাচলে যাইবার মানসে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে আগমন করিলেন। সেই সময় পরমানন্দপুরী নীলাচল যাইবার মানসে নবদ্বীপ ধামে আসিয়া শচীদেবীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। শচীদেবী তাঁহাকে পরমাদরে আপন ভবনে স্থান দান করিয়া স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া ভোজন করাইলেন। পরমানন্দপুরী ভক্তগণের নীলাচল গমনের পূর্ব্বেই তথায় গমন করিয়া, শ্রীচৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভুও তাঁহাকে পাইয়া আনন্দ সহকারে আপন বাসগৃহের নিকট একটি নির্জ্জন কুটীরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরমানন্দপুরীর নীলাচল গমনের কয়েক দিন পরে স্বরূপ দামোদর নীলাচলে প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। ইঁহার পূর্ব্ব

নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন ইনিও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণানন্তর শিখাসূত্র পরিত্যাগ করতঃ বারাণসী ধামে গমন করেন, এবং তথায় বেদ বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া, শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি যেমন সুপণ্ডিত তেমনি আবার সুগায়ক ছিলেন। স্বরূপ দামোদর, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি রসোদ্দীপক গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রবণ করাইতেন। স্বরূপ দামোদর সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাতে বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দামোদরকে পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম তুমি আজ এখানে আসিয়াছ, যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই আজ ফলিল। অন্ধ দুই চক্ষু প্রাপ্ত হইলে যেমন আনন্দ অনুভব করে, আজ তোমাকে দেখিয়া আমার তেমনি আনন্দ হইতেছে।" তৎপর দামোদর নিত্যানন্দ পরমানন্দ-পুরী প্রভৃতির চরণ বন্দনা করিলে, তাঁহারাও প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তদিগের সঙ্গে বসিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময়ে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিল, পুরীগোঁসাই আমাকে আপনার সেবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমার নাম গোবিন্দ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরীগোঁসাই শূদ্র ভৃত্য কিরূপে রাখেন ?" প্রভু বলিলেন, "ভগবৎ-কৃপা যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট জাতিকুলাদির কোন বিচার থাকে না।" পুরীগোঁসাই চৈতন্যদেবের গুরু ; তিনি গুরুর ভৃত্যকে কিরূপে আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিবেন, চৈতন্যদেব ভট্টাচার্য্যকে এ বিষয় বিচারার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "গুরুর আদেশ পালনীয়।" প্রভু গোবিন্দকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার সেবা করিবার অনুমতি দান করিলেন।

ইতোমধ্যে একদিন মুকুন্দ দত্ত বলিলেন, "প্রভো, ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।" ব্রহ্মানন্দ ভারতী মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন। প্রভু সন্ন্যাসীর এরূপ বেশ দর্শন করিয়া কিছু দুঃখিত হইলেন। তিনি যেন ভারতীকে দেখিয়াও দেখেন নাই; প্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কোথায়?" মুকুন্দ বলিলেন, "ভারতী গোঁসাই ত এই আপনার নিকটেই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।" চৈতন্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভারতী বুঝিলেন, চর্ম্মাম্বর পরিধানের জন্যই প্রভু বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর পরিধেয় বহির্ব্বাস গ্রহণ করিলেন। তখন প্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে, গোঁসাই তাঁহার ভূয়সী গুণানুবাদ করিয়া বলিলেন, "এই পুরুষোত্তমে দুই ব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছেন; জগন্নাথ অচল, আর তুমি সচল ব্রহ্ম।"

প্রভুর আগমনবার্ত্তা পুরুষোত্তমের সকল স্থলেই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, চৈতন্যচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শনাভিলাষে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সার্ব্বভৌমাচার্য্য প্রভুর নিকট গমন করিয়া বিনীত হৃদয়ে বলিলেন, "প্রভো, রাজা প্রতাপরুদ্র আপনার দর্শন লালসায় ব্যাকুল হইয়া আমাকে আপনার নিকট তদ্বিষয় জ্ঞাপনার্থ আদেশ করিয়াছেন।" চৈতন্যচন্দ্র সার্ব্বভৌমের মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বলিলেন, "সার্ব্বভৌম! আমি সন্ন্যাসী, নারীদর্শন আর রাজদর্শন আমি উভয়ই সমান মনে করি; তুমি আর কখন এরূপ প্রার্থনা আমাকে জানাইবে না। আর কখন যদি এরূপ কর তাহা হইলে আমি নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, তোমরা আর আমার দেখা পাইবে না।" সার্ব্বভৌম ভাবিলেন, যাঁহার প্রেমানন দর্শনে শোক দুঃখ নিবারিত হয়, শুষ্ক হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির লহরী উথলিত হয়, যে প্রার্থনায় তাঁহা হইতে

বঞ্চিত হইতে হইবে, সেরূপ প্রার্থনা রসনায় আর কখন আনিব না। নিরাশ হৃদয়ে তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রভুর রাজদর্শনের আপত্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। এমন সাক্ষাৎ দেবদর্শনে তিনি বঞ্চিত থাকিবেন? যাঁহার দর্শনে সহস্র সহস্র নরনারী নবজীবন লাভ করিতেছে, তিনিই কেবল সে দর্শনের অনধিকারী হইয়া, জীবন ধারণ করিবেন? এই সকল চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "তিনি পাপীর পরিত্রাণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনি দুরন্ত জগাই-মাধাইকে মুক্তির পথ দেখাইয়া উদ্ধার করিলেন, কেবল প্রতাপরুদ্রকে করুণা হইতে বঞ্চিত রাখিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই কি তিনি অবতার হইয়াছেন? প্রভুর যদি এই পণ হয়, যে তিনি রাজদর্শন করিবেন না; আমারও প্রতিজ্ঞা এই, তাঁহার দর্শন না পাইলে আমিও এ দেহ ত্যাগ করিব। যদি এ জীবনে তাঁহার দর্শন না পাইলাম, তাহা হইলে, এ রাজ্যেই বা আমার কি প্রয়োজন?"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের প্রতি রাজার ঐকান্তিক অনুরাগ দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি একেবারে তাঁহার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইবেন মনে করিবেন না; তিনি করুণাময়, নিশ্চয়ই তিনি আপনার দর্শন-লালসা পূর্ণ করিবেন। তবে আপনি এক কার্য্য করুন, রথযাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে, এ সময় প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমোল্লাসে মত্ত হইয়া কীর্ত্তনকারীদিগের দলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া নৃত্য করিতে করিতে অবশেষে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন; আপনি সে সময় রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীন বেশধারী হইয়া ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িবেন; প্রভু এ সময় হরি-রস-পানে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকেন, দেখিবেন, তখন নিজ বাহু প্রসারণ করিয়া আপনাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিবেন।" সভাপণ্ডিত

সার্ব্বভৌমের নিকট হইতে এই আশার বাণী শ্রবণ করিয়া রাজা অতীব প্রীতিলাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রথযাত্রা কবে ?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আর অধিক দিন নাই, তিন দিবস মাত্র বাকী আছে।"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রথোৎসব ও ভক্তসম্মিলন

শ্রীচৈতন্য একদিন প্রেমবিহ্বল চিত্তে একাকী আলালনাথে চলিয়া যান। সার্ব্বভৌমাচার্য্য এই সংবাদ শ্রবণে ত্বরায় তথায় গমন করিয়া অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন, ইতোমধ্যে গৌড়দেশ হইতে দুই শত ভক্ত স্নানযাত্রা উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত আনন্দোৎসব করিবার জন্য, নীলাচলে প্রথমে সাগরের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপীনাথাচার্য্য তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা রাজা প্রতাপরুদ্রের সমীপে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "গৌড় হইতে দুই শত ভক্ত আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভোজন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।" রাজা আপনার কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া নবাগত ভক্তগণের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন এবং ভক্তদল দেখিবার জন্য, গোপীনাথ ও সার্ব্বভৌমকে লইয়া আপন ভবনের ছাদের উপর উঠিলেন। এদিকে দুই শত ভক্ত সারি বাঁধিয়া হরিনাম গান করিতে রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে, গোপীনাথ প্রতাপরুদ্রকে ছাদের উপর হইতে প্রধান প্রধান ভক্তদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র ভক্তদিগের আগমন-

বার্ত্তা শ্রবণে উৎফুল্ল হৃদয়ে স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দকে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার্থ গমন করিতে বলিলেন। তাঁহারা পুষ্পমালা হস্তে লইয়া তথায় গমন করিলেন, এবং সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বজনপূজ্য অদ্বৈতাচার্য্যের গলদেশে মালা পরাইয়া উভয়েই অবনতশিরে তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ হইলেন। রাজা গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁহার গলদেশে অগ্রে মালা পরান হইল, এই দেবোপম ব্যক্তি কে?" গোপীনাথ বলিলেন, "ইনি নবদ্বীপের বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতাচার্য্য। মহাপ্রভুর অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র।" গোপীনাথ এইরূপে রাজাকে একে একে শ্রীবাস, বক্রেশ্বর আচার্য্য রত্ন, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব, শিবানন্দ সেন, রাঘব পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রভুর ভক্তদিগকে চিনাইয়া দিতে লাগিলেন। উৎকলাধিপতি ভক্তদিগের নৃত্য, মধুর কীর্ত্তন, তাঁহাদিগের অনুপম দিব্যলাবণ্যযুক্ত মুখজ্যোতিঃ দর্শনে বিমোহিত হইয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "ইঁহাদের মুখমণ্ডলে রবিকরের উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায় এমন উজ্জ্বল ভাব আমি ত আর কোথাও দেখি নাই, এ সকল বৈষ্ণব যেন নরলোকের অতীত বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে।" গোপীনাথাচার্য্য রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বচনে বলিলেন, "রাজন্! এ সকল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অতুলনীয় ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেরই পরিচয় মাত্র। নাম-সংকীর্ত্তন তাঁহারই সৃষ্টি; মানবকে ভগবৎ-প্রেমের মধুর সলিলে নিমগ্ন করিবার জন্যই তিনি মানব-দেহ ধারণ করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিয়াছেন।"

গৌড়ভক্তগণ হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের মস্তকের শিরোভূষণ গৌরচন্দ্রের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, এবং ভক্ত-দিগকে প্রেমালিঙ্গন দান করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা বাসুদেবকে দেখিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমার জন্য দক্ষিণা-

পথ হইতে দুইখানি পুস্তক আনিয়াছি।” প্রভু দলের মধ্যে সকলকেই দর্শন করিলেন, কিন্তু হরিদাসকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার হরিদাস কোথায়?” সকলে বলিল, “তিনি দূরে রাজপথের এক প্রান্তে পড়িয়া আছেন।” ভক্তেরা হরিদাসের নিকটে গিয়া, তাঁহাকে আসিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বলিলেন, “আমি অতি নীচ জাতি ও অতি অধম; শ্রীমন্দিরের নিকটে যাইবার আমার কোন অধিকার নাই।”

এমন সময় কাশীমিশ্রের দুই জন লোক আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন, “ভক্তদিগের বাসা ঠিক হইয়াছে।” প্রভু এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপীনাথকে বলিলেন, “তুমি ইঁহাদিগকে বাসায় লইয়া যাও, এবং বাণীনাথকে মহাপ্রসাদ লইয়া বাসায় যাইতে বল।” প্রভু কাশীমিশ্রকে বলিলেন, “আমার বাসার নিকটে পুষ্পোদ্যানের মধ্যে একখানি নির্জ্জন কুটীর আছে, সেই ঘরখানি আমাকে দিতে হইবে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।” কাশীমিশ্র প্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “তোমারই ত সব; আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিবে।”

এমন সময় প্রভু ভক্তদিগকে বলিলেন, “তোমরা নিজ নিজ বাসায় গমন করিয়া আপনাপন দ্রব্যাদি ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখিয়া সমুদ্রে স্নানাদি করিয়া আমার বাসায় আগমন করিবে; সেইখানেই ভোজন করা যাইবে।” গোপীনাথাচার্য্য সকলকে তাঁহাদিগের নির্দ্ধারিত বাসায় লইয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে প্রভু হরিদাসকে আনিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিলেন। প্রভুকে দেখিয়া তিনি ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। উভয়ে প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলে, হরিদাস বলিলেন, “প্রভু আমাকে ছুঁইও না; আমি

অধম নীচ জাতি।” শ্রীচৈতন্য বলিলেন, “তুমি পরম ভক্ত। তুমি সর্ব্বদা হরিনাম জপে রত থাক। তোমাকে স্পর্শ করিলে, আমার দেহ পবিত্র হইবে, তুমি উঠ, আমার সঙ্গে এস; আমার বাসার নিকটে পুষ্পোদ্যানের মধ্যে একটী নির্জ্জন কুটীর আছে, তুমি সেইখানেই থাকিবে।” এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কাশীমিশ্রের পুষ্পোদ্যানস্থিত নির্জ্জন কুটীরে লইয়া গেলেন।

এদিকে ভক্তেরা সমুদ্রে স্নান করিয়া প্রভুর বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। প্রসাদান্ন পূর্ব্ব হইতেই বাণীনাথ আনিয়াছিলেন। আহারের আয়োজন হইল; মহাপ্রভু সকলকে বসাইয়া স্বহস্তে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তিন জনের ভোজ্যদ্রব্য এক এক জনের পাতে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং আহারে বসিলেন না বলিয়া, কেহই আর অন্নগ্রাস মুখে না তুলিয়া বসিয়া রহিলেন। দামোদর, প্রভুকে বলিলেন, “তুমি না বসিলে, কেহই আহার করিবেন না, সকলেই হাত তুলিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।” প্রভুর প্রাণের হরিদাস কুটীরে বসিয়া রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ফেলিয়া কি আহার করিতে পারেন? গোবিন্দকে তাঁহার জন্য প্রসাদান্ন লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া, স্বরূপের অনুরোধে ভক্তদিগের সঙ্গে আহারে উপবেশন করিলেন। প্রেমোল্লাসে সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রেমভোজে স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তেরা সুন্দর সুন্দর শুভ্র তণ্ডুলের অন্ন, বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন ও পিষ্টক পায়স প্রভৃতি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে প্রভু সকলের গলদেশে মালা ও অঙ্গে চন্দন লেপিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। গৌড়ীয় ভক্তদল পুনরায় প্রভুর বাসায় মিলিত হইলেন।' রায় রামানন্দও আগমন করিলেন। এই সময় জগন্নাথদেবের আরতি হইয়া থাকে। গৌরচন্দ্র তাঁহার ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য লোক-

দিগকে লইয়া জগন্নাথদেবের আরতি দর্শনার্থ মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণ ধূপ ধূনার সুন্দর সুগন্ধে আমোদিত হইল, গৌর ভক্তবৃন্দ সহ তথায় গমন করিলেন; পাণ্ডারা সকলকে মালা ও চন্দন দিয়া সম্ভাষণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তগণ চারি দলে বিভক্ত হইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। চারি দলের মধ্যে আটখানি মৃদঙ্গ ও বত্রিশ জোড়া মন্দিরা বাজিতে লাগিল। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর ও শ্রীবাস এক একজন এক একটি দলের অধিনায়ক হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গৌর সকল দলের মধ্যেই এক একবার গমন করিয়া কীর্ত্তনকারীদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শত শত লোকের কণ্ঠধ্বনির সহিত মৃদঙ্গ ও করতালের শব্দ মিশ্রিত হইয়া এক মহা মধুর ধ্বনিতে যেন চারিদিক নিনাদিত হইতে লাগিল।

উৎকলবাসীরা গৌড়ীয়দিগের সংকীর্ত্তনের মধুর রবে আর গৃহে থাকিতে পারিল না; চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া নীলাচলাধিপতি জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তারকাবেষ্টিত চন্দ্রমাসম গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সহ নৃত্য করিতেছেন, অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, এই দৃশ্য দর্শনে, ও সকলের কণ্ঠনিঃসৃত হরিনামের ধ্বনি শ্রবণে বিমোহিত হইয়া তাহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইতঃপূর্ব্বে পুরুষোত্তমে এইরূপ মধুর সংকীর্ত্তন আর কেহ কখন শ্রবণ করে নাই। গৌড়ীয় ভক্তদিগের নৃত্য ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ মানসে কেবল যে জনসাধারণেই ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিল তাহা নহে, রাজা প্রতাপরুদ্রও আপনার পারিষদবর্গ সহ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ভক্তদিগের কীর্ত্তন দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন শ্রবণে সংকীর্ত্তনের সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণব্যাপী কীর্ত্তনান্তে গৌর ভক্তগণসহ আপনার বাসায় আগমন করিলে,

সায়ংকালীন ভোজনার্থ সকলের জন্য প্রসাদান্ন উপস্থিত হইল। গৌর স্বহস্তে সকলকে তাহা বণ্টন করিয়া দিলেন। আহারান্তে সকলে আপনাদিগের বাসায় গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন দক্ষিণাপথ হইতে আগমন করিলেন, তখন হইতেই রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার দর্শন-লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। তিনি কটক হইতে আপনার এই বাসনা পূর্ণ করিবার মানসে সার্ব্বভৌমকে একখানি পত্র লেখেন। পত্রের মর্ম্ম এই, তুমি প্রভুকে জানাইবে যে, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে; গৌর যদি আমাকে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে আমি এ রাজ্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইব। সার্ব্বভৌম রাজার চিঠি প্রাপ্ত হইয়া, বড় চিন্তিত হইলেন; তিনি পত্রখানি লইয়া প্রভুর ভক্তদিগকে দেখাইলেন। সকলেই রাজার পত্র দেখিয়া প্রভুকে কিরূপে এই কথা জানাইবেন, এবং কিরূপেই বা তাঁহার সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইবে, এই চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িলেন। উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহারা সকলেই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কেহ আর কিছু সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। প্রভু ভক্তবৃন্দের সমবেত আগমন দেখিয়া, তাঁহাদিগের কিছু বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, নিত্যানন্দ না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, "বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, রাজা প্রতাপরুদ্র বহুদিন হইতে তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়াছেন; তিনি তোমার দর্শন না পাইলে, রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন।" গৌর সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহার হৃদয় হইতে স্নেহ মমতা বিনষ্ট হয় নাই; রাজার ব্যাকুলতার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রাণ দ্রবীভূত হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি সবই ভাল বুঝ, আমি আর কি বলিব।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "যে ব্যক্তি তোমাকে একবার দেখিবার জন্য এত ব্যাকুলতা

প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার অভিলাষ যদি পূর্ণ করিবার পক্ষে কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে, অন্ততঃ যদি তোমার একখানি বহির্ব্বাস তাঁহাকে দাও, তাহাতেও কথঞ্চিৎরূপে তাঁহার প্রাণ শীতল হইতে পারে।” প্রভু তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, নিত্যানন্দ গোবিন্দের নিকট হইতে প্রভুর একখানি বহির্ব্বাস লইয়া রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। প্রভুর স্নেহের চিহ্নস্বরূপ এই বহির্ব্বাস প্রাপ্ত হইয়া উৎকলাধিপতির প্রাণ কিছু শান্তিলাভ করিল, কিন্তু প্রভুকে দর্শন করিবার আশা আরো জাগিয়া উঠিল। এমন সময় রায় রামানন্দ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া রাজাকে দর্শন দিবার জন্য বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন। প্রভু রামানন্দকে সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শনের অপকারিতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলেন। রামানন্দ রায় বলিলেন, “যদি রাজাকে দর্শনের অধিকারী না করিতে চাও, তবে তাঁহার পুত্রকে তোমার দর্শন লাভের অনুমতি দান কর।” প্রভু তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। প্রতাপরুদ্রের নিকট এ সংবাদ প্রেরিত হইল। রাজা প্রভুর এই কৃপাতে পরম পুলকিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্রের নবীন বয়স, সুগঠিত গঠন ও সুন্দর শ্যামল রূপ দর্শনে প্রভুর হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি আপনার দুই বাহু প্রসারণ করিয়া প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। গৌরাঙ্গস্পর্শে রাজপুত্রের অঙ্গেও স্বেদ কম্প প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল; নয়নাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইয়া গেল; যেন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাজপুত্র প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রায় রামানন্দ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রতাপরুদ্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পুত্রের প্রতি শ্রীচৈতন্যের স্নেহের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আপনাকে আপ্যায়িত মনে করিলেন, পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে রথযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। শ্রীচৈতন্য

কাশীমিশ্র, পড়িছাপাত্র ও সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া গুণ্ডিচামন্দির পরিষ্কার করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব এই মন্দিরে কয়েকদিন অবস্থিতি করেন। রথযাত্রা উৎসবোপলক্ষে প্রভু এই মন্দির সংস্কার করিতে চাহিলে, কাশীমিশ্র প্রভৃতি সকলেই আনন্দের সহিত অনুমতি দান করিলেন। রথোৎসবের সময় গুণ্ডিচামন্দির পরিষ্কার করিবার জন্য প্রভু অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ সহকারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভক্তদিগের অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত ও তাঁহাদিগের গলদেশে মালা পরাইয়া দিলেন। তাঁহারা সকলেই সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া মন্দির সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুও স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী ধারণ পূর্ব্বক কিরূপে দেবমন্দির নিষ্ঠার সহিত পরিষ্কার করিতে হয়, তাহা আপন কার্য্যের দ্বারা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ভক্তেরা শত কলস পূর্ণ জল আনিয়া মন্দির ধৌত করিতে লাগিলেন। প্রভু সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে মন্দির ধৌত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কোন এক ভক্ত ঐকান্তিক অনুরাগবশতঃ জলপূর্ণ কলস লইয়া অগ্রে প্রভুর চরণে জলসেচন ও তাঁহার চরণদ্বয় ধৌত করিয়া সেই পবিত্র চরণামৃত পান করিল। চৈতন্য ঈদৃশ ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ স্বরূপ, এ ব্যক্তি দেবতার মন্দির ধৌত করিতে আসিয়া আমার চরণ ধৌত করিয়া সেই বারি পান করিল; দেবমন্দিরে গৌড়িয়ার এরূপ কার্য্যের জন্য আমিই অপরাধী হইলাম।" স্বরূপদামোদর এই বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ সেই গৌড়িয়াকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। প্রভুর প্রসন্ন মুখ না দেখিয়া ও তাঁহার সঙ্গে কার্য্য না করিয়া সে কি থাকিতে পারে? সে আপনার দোষ স্বীকার করিয়া, প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, প্রেমার্দ্রচিত্ত গৌরের প্রাণ দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি প্রসন্নচিত্তে আবার তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তদিগের সঙ্গে গুণ্ডিচামন্দির ধৌত করিবার অনুমতি দান

করিলেন। শত শত জল পূর্ণ কলসের জলে ও সম্মার্জ্জনী দ্বারা ভক্তেরা মন্দিরতল ও খাপরার দ্বারা মন্দিরের উপরিভাগ ধৌত করিতে লাগিলেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিক সুপরিষ্কৃত হইয়া গেল। গুণ্ডিচা সংস্কারকার্য্যে সম্মার্জ্জনী হস্তে প্রভুই অগ্রণী হইয়া সকলকে শিক্ষা দান ও ভক্ত-গণসঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অবশেষে ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে সঙ্গী-দিগের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভগবানের মধুময় নামের মধুর হিল্লোলে ভক্তদিগের হৃদয়-সরোবরে যেন প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল; গৌর ভক্তদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র গোপাল প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। গৌর আচার্য্যপুত্রকে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিয়া, ব্যস্ততার সহিত তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। গোপাল তখন সংজ্ঞা-হীন হইয়া পড়িয়াছেন। গোপালের পিতা সন্তানের এরূপ অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বিবিধ উপায়ে তাহার চেতনা উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন গৌরচন্দ্র মূর্চ্ছিত গোপালের বক্ষে স্নেহভরে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "গোপাল, ওঠ।" তাঁহার হস্তস্পর্শে ও তাঁহার আহ্বানে গোপালের মূর্চ্ছা তিরোহিত হইয়া গেল। সে উঠিয়া উপবেশন করিল। নৃত্য কীর্ত্তনাদি সমাপ্ত হইলে তাঁহারা সকলে স্নানাবগাহন করিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় বাণীনাথ প্রসাদান্ন আনিয়া উপস্থিত করিলেন; সহস্রাধিক ব্যক্তি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভোজনার্থ উপবেশন করিলে, স্বরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত পরিবেষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবিধপ্রকার ব্যঞ্জন, পিষ্টক পায়স ভোজন করিতে করিতে ভক্তদিগের আর আনন্দ ধরে না; তাঁহারা এই আনন্দোৎসবে সেই আনন্দময় বিধাতা শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নামের ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

রথযাত্রার দিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দসহ জগন্নাথদেবের মন্দির সম্মুখে গমন করিলেন। জগন্নাথদেবকে রথারোহণ করান হইলে, বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল; শত শত কণ্ঠ হইতে মহাপ্রভুর মহিমাধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল; উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্র সম্মার্জ্জনী হস্তে পথ পরিষ্কার ও তদুপরি সুবাসিত চন্দন জল সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রভুর ভক্তদিগের গাত্রে চন্দন ও গলদেশে ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। ভক্তসঙ্গে যে সংকীর্ত্তনের মধুর রবে তিনি পুরুষোত্তমবাসীদিগের অন্তরে ভক্তির উদ্দীপনা করিতেছিলেন, আজ এই মহোৎসবে সেই পাপতাপহারী হরিনাম কীর্ত্তন করিবার জন্য তিনি ভক্তদিগকে চারি দলে বিভক্ত করিলেন। ভক্তেরা কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। রথ বলগণ্ডিতে উপস্থিত হইলে, ভক্তেরা বিশ্রামার্থ একটি পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। প্রভুও কীর্ত্তন ও নর্ত্তনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বিশ্রামার্থ এক সোপানের উপর শয়ন করিলে রায় রামানন্দের পরামর্শানুসারে রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণবের বেশে প্রভুর চরণ ধরিয়া ভাগবতের এই শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং,
কবিভি রীড়িতং কল্মষাপহং;
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃণান্তি যে ভূরিদা জনাঃ।"

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "হে প্রিয়তম, তোমার কথামৃত তাপিতজনের জীবন স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সংপূজিত এবং পাপনাশক; উহা শ্রবণে মঙ্গল হয় এবং উহা শান্তিপ্রদ; এই ধরাতলে যাঁহারা নরনারীকে উহা পান করাইতে পারেন, তাঁহারাই ভূরিদ অর্থাৎ প্রকৃত দাতার ন্যায় বহু দান করিয়া থাকেন।"

শ্লোক শ্রবণে প্রভুর হৃদয় প্রেমরসে পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ছদ্মবেশী রাজা বলিলেন, "আমি আপনার দাসানুদাস হইতে ইচ্ছা করি।"

তাই চৈঃ চরিতামৃতে,—

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি করি আলিঙ্গন ;
ইহা নাহি জানে ইহো হয় কোন জন।

* * * *

"প্রভু বলে কে তুমি ? করিলা মোর হিত ;
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত।
রাজা কহে আমি তোমার দাসের দাস ;
ভৃত্যেরে ভৃত্য কর এই মোর আশ ॥"

এদিকে বাণীনাথ বিবিধ প্রসাদ দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সকলেই হরিধ্বনি করিতে করিতে প্রসাদান্ন ভোজন করিলেন।

তৎপরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তেরা গুণ্ডিচামন্দিরে রথ লইয়া গেলেন। এখানে প্রতিবৎসর জগন্নাথ নয় দিবস অবস্থিতি করেন। জগন্নাথ গুণ্ডিচায় আসিলে, গৌর কোন ভক্তের অনুরোধে আইটোটায় আসিয়া বাস করেন ; এবং জগন্নাথদেবের মন্দিরে পুনরাগমন পর্য্যন্ত এই নয়দিবস নানা গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ভোজন ও সায়ংকালে গুণ্ডিচায় কীর্ত্তনাদি করিয়া আনন্দে সময় অতিবাহিত করেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণ চারি মাস কাল পুরুষোত্তমে বাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময় প্রভুর নিকট বিদায়ের জন্য উপস্থিত হইলেন। গৌরের সঙ্গে তাঁহাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ; তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রবীণ অদ্বৈতাচার্য্যকে সকল শ্রেণীর মধ্যে হরিগুণ কীর্ত্তনের জন্য আদেশ করিলেন ; নিত্যানন্দকে বলিলেন, "তুমি গৌড়দেশে গমন করিয়া পরম রত্ন ভক্তিধন বিতরণ কর।"

শ্রীবাস পণ্ডিতের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমার গৃহে আমি যেমন নৃত্য কীর্ত্তনাদি করিতাম, এখন তেমনিই করিব ; কিন্তু তুমি ভিন্ন অপর কেহ তাহা দেখিতে পাইবে না।" মাতৃবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ও একখানি বস্ত্র লইয়া শ্রীবাসের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার মাকে এই বস্ত্র ও প্রসাদান্ন প্রদান করিবে। আর মাকে বলিবে, আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না। তিনি যেন বাতুল বলিয়া আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। তবে আমি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকি। তিনি একদিন পাত্রে অন্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া, আমার নিমাই এই সকল ব্যঞ্জন অত্যন্ত ভালবাসিত, এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; আমি সে সময় তথায় যাইয়া সে সমস্ত ভোজন করিয়া ফেলি, তিনি ক্ষণেক পরে শূন্যপাত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ; মনে করিতে লাগিলেন, তবে কি আমার ভ্রম হইয়াছে, আমি কি ভাত বাড়ি নাই ? বিজয়া দশমীতে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, তুমি তাঁহাকে এসব কথা বলিও।" শিবানন্দ সেনকে বলিলেন, "তুমি প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া এখানে আগমন করিবে। এ কার্য্যের ভার তোমারই উপর রহিল। আর এক কথা, তুমি বাসুদেব দত্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ; বাসুদেব বড় উদার। অর্থ হাতে আসিলেই তাহা ব্যয় করিয়া ফেলে, গৃহস্থ ব্যক্তির সঞ্চয় করা প্রয়োজন।" কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ ও সত্যরাজ খাঁ প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো আমরা বিষয়ী, সংসারে কিরূপে সাধন ভজন করিব ?" প্রভু বলিলেন, "নিরন্তর নামসংকীর্ত্তন করিবে।" সত্যরাজ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, বৈষ্ণব কিরূপে চিনিব ?" চৈতন্য বলিলেন, "যাঁহার রসনা হইতে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।"

চৈতন্যদেব মুরারি গুপ্তের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সকলকে বলিলেন,

"ইনি রামভক্ত ; আমি ইঁহাকে কৃষ্ণনাম করিতে বলি। ইনি আমার আজ্ঞা প্রতিপাল্য বলিয়া গৃহে গমন করিলেন। পরদিবস আমার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'রামকে হৃদয় হইতে পরিত্যাগ করিতে আমার প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়।' আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, 'তোমার বিশ্বাস দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, এইরূপ বিশ্বাসই প্রয়োজন।' "

ভক্তেরা তাঁহার প্রেমপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া ও প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া বিষাদিত অন্তরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রভুও তাঁহার স্নেহের পাত্রদিগকে বিদায় দিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তমে গদাধর পণ্ডিত, জলেশ্বর, পুরীগোঁসাই, জগদানন্দ, স্বরূপ-দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ, কাশীশ্বর প্রভৃতি ভক্ত ও সেবকেরা তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

গৌড়ভক্তেরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে একমাস কাল নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "সন্ন্যাসীর পক্ষে একমাস একাদি-ক্রমে কোন গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ উচিত নহে, উহাতে তাহার ধর্ম্মহানি হইবার সম্ভাবনা। ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বিশ দিবসের জন্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে বলিলেন, প্রভু তাহাও যতীর কর্ত্তব্য নহে বলিয়া সম্মত হইলেন না ; পঞ্চদশ দিবসের জন্য সার্ব্বভৌম অনুরোধ করিলেন, তাঁহার সে অনুরোধও রক্ষিত হইল না। অবশেষে সার্ব্বভৌম পঞ্চ দিবসের জন্য অনুরোধ করিলে, প্রভু আর কোন আপত্তি না করিয়া ভিক্ষা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। ভট্টাচার্য্য পুরীগোঁসাই প্রভৃতিকেও ভিন্ন ভিন্ন দিনে নিমন্ত্রণ করিয়া একমাস পূর্ণ করিলেন।

সার্ব্বভৌম বাড়ীতে আসিয়া আপনার পত্নীকে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিতে বলিলেন। ভট্টাচার্য্যের ষাটি নাম্নী এক কন্যা

ছিল; এবং অমোঘ নামে তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে বাস করিত। প্রভু যথাসময়ে ভট্টাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বৃহৎ কলাপাতে শুভ্র গন্ধযুক্ত অন্ন রাখা হইল, এবং তদুপরি পীতবর্ণ গব্যঘৃত ঢালা হইল। বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন দুধ কলা ক্ষীর পাতের চারিদিকে সজ্জিত করা হইল। গৌর প্রথমে এত অন্ন দেখিয়া সে পাতে বসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, সার্ব্বভৌম বলিলেন, "যাহা পার তাহা খাও।" অনুরুদ্ধ হইয়া, গৌর ভোজনে উপবেশন করিলেন। সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ, সর্ব্বদা সাধুনিন্দা করিত; গৌর আহার করিতে বসিলে, সে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া বলিল, "এ সন্ন্যাসীটা দশ জনের ভাত খাইতেছে।" সার্ব্বভৌম অমোঘের বাক্য শ্রবণ করিয়া লগুড় হস্তে তাহাকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইলেন; কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। গৌর ইহা দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বাড়ীতে আসিয়া, ষাটি বিধবা হউক, ইত্যাদি বাক্য বলিয়া অমোঘের প্রতি ভয়ানক ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গৌরের আহারান্তে সার্ব্বভৌম অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আজ তোমার মনে বড়ই ক্লেশ দিলাম।" গৌর বলিলেন, "অমোঘের কথায় আমার কোনই কষ্ট হয় নাই; সে যথার্থ কথাই বলিয়াছে।" ভট্টাচার্য্য মনের ক্লেশে সেদিন অনাহারেই দিন যাপন করেন। অমোঘ সে রাত্রে যে স্থানে অবস্থিতি করে তথায় সে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়। গোপীনাথাচার্য্য প্রভুকে এই সমাচার প্রদান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সুকোমল হস্ত অমোঘের বক্ষে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এই মাৎসর্য্যরূপ চণ্ডালকে স্থানদান করিয়া কেন এ পবিত্র স্থলকে অপবিত্র করিতেছ? উঠ; ভক্তিভরে হরিনাম কীর্ত্তন কর, অচিরে ভগবানের কৃপা লাভ করিবে।" সাধুনিন্দুক অমোঘ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সুকোমল হস্তস্পর্শে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিল; সে প্রভুর বাক্যে উঠিয়া বসিল এবং তাঁহার

চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সেই মুহূর্ত্তে অমোঘ শ্রীচৈতন্যের মধুময় ভক্তিপথের পথিক হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনযাত্রা ও গৌড়দর্শন

এইরূপে সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্যের চারি বৎসর চলিয়া গেল। দক্ষিণ যাত্রায় ও অন্যান্য স্থানে দুই বৎসর ও পুরুষোত্তমে অপরার্দ্ধ গত হইল। শেষে দুই বৎসর বৃন্দাবনগমনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠে, কিন্তু ভক্তবৃন্দ তাঁহার বিচ্ছেদ অতীব কষ্টকর হইবে বলিয়া, তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে দেন নাই। তৃতীয় বৎসরে গৌড়ীয় ভক্তগণ পূর্ব্বের ন্যায় রথ-যাত্রার সময় পুরুষোত্তমে আগমন করিলেন। এবার প্রভুর দর্শন লালসায় অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী সীতাদেবী, শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী মালিনী দেবী ও শিবানন্দ সেন প্রভৃতির পত্নীরা আপনাপন স্বামিসহ নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। গৌড়ীয় ললনারা প্রভুর জন্য নানারূপ খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহারা দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁহাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। এবৎসরও পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গুণ্ডিচা মার্জ্জন, রথোৎসবে কীর্ত্তন, পংক্তিতে প্রসাদান্ন ভোজন প্রভৃতিতে অতিবাহিত হইল। রথোৎসব সম্পন্ন হইলে, ভক্তেরা গৌরসঙ্গে চাতুর্মাস্য যাপন করিলেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যের বাসায় গৌর অনেক সময়

নিমন্ত্রিত হইতেন। গৌড়বাসীরা এই চারিমাসকাল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে ও কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করেন; এবং বিদায়কালে তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম বর্ষে গৌরাঙ্গ প্রভু বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে রামানন্দ রায় ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে আপনার সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুই বৎসরকাল আমাকে আজ কাল করিয়া এখানে রাখিয়াছ, এখন প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দাও; বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসি। গৌড়দেশে আমার দুইটি অত্যন্ত ভালবাসার জিনিষ আছে, জননী ও জাহ্নবী। যাইবার সময় গৌড়ে ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।" রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভাবিলেন, নিজেদের সুখের জন্য প্রভুর সংকল্পের পথে আর বিঘ্ন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "এখন বর্ষাকাল; এ সময় বাহির হইলে পথে অত্যন্ত কষ্ট হইবে, আগামী বিজয়া দশমীর দিন বৃন্দাবন-যাত্রা নির্দ্ধারণ করিলে ভাল হয়।" গৌর তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে কয়েক মাসান্তে বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। বহু ভক্ত সঙ্গের সাথী হইয়া প্রভুর সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। যাত্রিদল ভবানীপুরে উপস্থিত হইলে, বাণীনাথ প্রসাদান্ন লইয়া ও রামানন্দ দোলারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরদিবস তাঁহারা ভুবেনশ্বর দর্শন করিয়া কটকে উপনীত হইলেন। এখানে স্বপ্নেশ্বর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের অনুরোধে প্রভু তাঁহার ভবনে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, আহারান্তে এক বকুল বৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র ইতঃপূর্ব্বেই প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন; এখন কটক ধামে তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ত্বরায় বকুল তলায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের চরণে একাধিকবার প্রণত হইয়া, ভক্তিপ্রণোদিত অন্তরে স্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার ব্যাকুলতা দর্শনে মুগ্ধ

হইয়া তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। রাজকর্ম্মচারীরাও দণ্ডবৎ প্রণামাদির দ্বারা চৈতন্য প্রভুর প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। রাজা প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গমনপথের সর্ব্বত্র সুব্যবস্থা করিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রেরিত হইল। প্রভু সদলে নদী পার হইবেন বলিয়া তটে সুন্দর তরণী রাখা হইল। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুকে নিরাপদে লইয়া যাইবার জন্য বেত্রহস্তে কয়েক জন লোককে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন, এবং রায় রামানন্দকেও সমভিব্যবহারী হইতে বলিলেন। প্রভু সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিবেন শ্রবণ করিয়া উৎকলাধিপতি হস্তিপৃষ্ঠে পটমণ্ডপাচ্ছাদিত করিয়া রাজমহিষী ও পুরাঙ্গনাদিগকে লইয়া প্রভুর যাত্রাপথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; সন্ধ্যা সমাগমে যাত্রিদল যখন প্রভুকে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন, তখন রাজমহিলারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার ভক্তিপূর্ণ মূর্ত্তিদর্শনে বিমোহিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রভু নদীতটে উপস্থিত হইলে, অন্যান্য ভক্তদিগের ন্যায় গদাধর তাঁহার সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তুমি গেলে গোপীনাথের সেবা হইবে না।" গদাধর পণ্ডিত বলিলেন, "তুমি যেখানে থাক সেই নীলাচল; আর তোমার চরণ দর্শনেই কোটি দেবসেবার ফল হইয়া থাকে।" প্রভু তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেবসেবা পরিত্যাগ করিলে তোমার অপরাধ হইবে। আর তুমি নীলাচলে থাকিলে আমি সুখী হইব।" এই বলিয়া তিনি নৌকারোহণ করিলেন। রায় রামানন্দ, মঙ্গরাজ, হরিচন্দন, রাজাদিষ্ট কর্ম্মচারীরা ও পুরীগোঁসাই, স্বরূপদামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, গোপীনাথাচার্য্য, পণ্ডিত দামোদর প্রভুর সঙ্গে নৌকারোহণ করিলেন। গদাধর প্রভুর অনুমতি না পাইয়া

মর্ম্মভেদী যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং নদীতটে পতিত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। প্রভুর বিদায়কালে সার্ব্বভৌমাচার্য্য নিকটে ছিলেন।

যদিও গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদে তাঁহারও প্রাণ শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি গদাধর পণ্ডিতের অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি প্রবোধবাক্যে তাঁহার চিত্তে সান্ত্বনা বিধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন।

আজ জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; চন্দ্রমার রজত কিরণে চারিদিক আলোকিত; স্রোতস্বিনী বহিয়া তরণীখানি পুণ্যাত্মাদিগকে লইয়া পরপারে উপস্থিত হইল। গৌর সপার্ষদে চতুর্দ্বার নামক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিলেন। রাজাজ্ঞায় সকল স্থলেই রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগের পরিচর্য্যায় আপনাদের শক্তি নিয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহারা যেখানেই যাইতে লাগিলেন সেইখানেই অভ্যর্থনা লাভ করিতে লাগিলেন। কেবল রাজাজ্ঞায় নহে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শন ও সেবাতে লোকে আপনাদিগের জন্ম সার্থক হইল মনে করিতে লাগিল। পরদিন প্রভাতে চতুর্দ্বারে বাণীনাথ-প্রেরিত প্রসাদান্ন উপস্থিত হইল। সকলে স্নানান্তে প্রীতিপ্রফুল্ল মনে তাহা ভোজন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা যাজপুরে উপস্থিত হইলেন, যে দুই জন রাজকর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, প্রভু এখান হইতে তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিলেন। এখান হইতে যাজপুর হইয়া তাঁহারা রেমুনায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু এখান হইতে রামানন্দ রায়কে বিদায় দান করিলেন। এ-পর্য্যন্ত তিনি রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। বিদায়কালে রামানন্দের প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল; তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল; তিনি বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ

তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৌর সদলে উৎকল রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে গমন করিলেন। এখানে উৎকলাধিপতির জনৈক কর্ম্মচারী চৈতন্যদেবের প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের অবস্থানের ব্যবস্থা ও সেবার আয়োজন করিয়া দিলেন। রাজকর্ম্মচারী প্রভুকে বলিলেন, "ইহাই উৎকল রাজার সীমান্ত প্রদেশ; নিকটবর্ত্তী পিছিলদা নদীর পরপার হইতে মন্থপ যবন রাজার অধিকার। আপনারা এখানে দিন কয়েক অপেক্ষা করুন। মুসলমানাধিপতির সহিত একটা সন্ধি করিয়া লই। তৎপর আপনাদিগকে পিছিলদা পার করাইয়া দিব। পর পারে যাত্রীদিগের বিচরণ নিরাপদ নহে।" ইতোমধ্যে মন্থপের এক হিন্দু চর ছদ্মবেশে প্রভুর দর্শনার্থে আগমন করে। সে চৈতন্য প্রভুর অসাধারণ ঈশ্বরানুরাগ ও তদীয় শিষ্যবর্গের জীবনের অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া রাজার নিকট গমন করতঃ সে সকলের উল্লেখ করিতে করিতে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল, এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া প্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণবের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। এরূপ শক্তি যিনি মানবের অন্তরে সঞ্চার করিতে সমর্থ, তিনি নরলোকের অতীত। এই বিশ্বাসে মন্থপরাজ চৈতন্যের দর্শন-লালসায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া দিলেন। যবনরাজ আপন কর্ম্মচারীকে এই উপলক্ষে উৎকলের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইবে বলিয়া উৎকল-সীমান্ত-রাজকর্ম্মচারী মহাপাত্রকে জ্ঞাপন করিলেন। মন্থপ-প্রেরিত লোক আসিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণে প্রণত হইয়া যবনরাজের দর্শনেচ্ছা জ্ঞাপন করিল। মহাপাত্র মন্থপরাজার লোককে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন, "যবনরাজ নিরস্ত্র চার পাঁচ জন লোক সঙ্গে লইয়া প্রভুর দর্শনে এখানে আগমন করিতে পারেন।" মদ্যপকর্ম্মচারী যবনরাজের সন্ধি স্থাপনের বাসনাও জ্ঞাপন করিল। যবনরাজ দূতমুখে মহাপাত্রের সম্মতি জানিয়া শ্রীচৈতন্য দর্শনে আগমন করিলেন এবং অনেক দূর হইতে

তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। মহাপাত্র প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন করিলেন। যবনরাজ প্রভুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমি যদি যবনকুলে জন্মগ্রহণ না করিয়া হিন্দু হইতাম তাহা হইলে আমি তোমার পবিত্র শ্রীচরণে স্থান পাইতাম।" প্রভু তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে বলিলেন। যবনরাজ প্রভুর কৃপায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "যদি আমার পরিত্রাণের জন্য কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তাহা হইলে আমাকে কৃপা করিয়া তোমার সেবার অধিকারী কর। আমি বৈষ্ণব-নিন্দা প্রভৃতি অনেক অপরাধে এ জীবন কলঙ্কিত করিয়াছি; সে-সকল পাপ হইতে আমি মুক্তিলাভ করি।" এমন সময় মুকুন্দ দত্ত মুসলমানাধিপতিকে বলিলেন, "প্রভুর গঙ্গা-পথে যাইবার যদি ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলে এ-সময় বিশেষ উপকার করা হয়।" তাঁহার পক্ষে শ্রীচৈতন্যের ন্যায় লোকের এই উপকার অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া মন্তপরাজ তৎক্ষণাৎ মুকুন্দের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেদিন প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরদিবস যবনরাজ প্রভুর গমনের জন্য একখানি সুন্দর সুসজ্জিত তরণী পাঠাইয়া দিলেন।

তখন স্থলপথ ও জলপথ দস্যুভয়ে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। এ নিমিত্ত যাত্রীদিগের রক্ষার জন্য সৈন্যপূর্ণ আরো দশখানি তরণী সঙ্গে লইয়া যবনরাজ স্বয়ং যাত্রিদলের সহিত গমন করিতে লাগিলেন; এবং পিছিলদা পর্য্যন্ত যাইয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের তরণী অবশেষে নদ নদী ও বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া পানিহাটি গ্রামে উপস্থিত হইল। প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া নাবিকদিগকে কৃপাসাটি দান করিলেন। চৈতন্যপ্রভুর আগমনবার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। পথে এত জনতা হইয়াছিল যে, রাঘব পণ্ডিত লোকের ভিড় ঠেলিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে আপন ভবনে লইয়া আসিলেন। তথায় একদিন অবস্থানের পর

তিনি কুমারহাটি শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিয়া অবশেষে বাচস্পতির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রভুর দর্শন-লালসায় তথায় বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল।

যিনি সতত হৃদয়মাঝে আপনার ইষ্টদেবতার দর্শনলালসায় ব্যাকুল, তাঁহার নিকট এত জনতা বিশেষ কষ্টকর বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। তিনি গোপনে বাচস্পতির গৃহ হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। কিন্তু যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, বাচস্পতির গৃহে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, অনেকেই তাঁহারই উপর দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল যে, তিনিই গৌরাঙ্গকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। গৌরাঙ্গ কোথায় চলিয়া গেলেন, বাচস্পতি মহাশয় তাহা কিছুই জানেন না। একদিকে লোকের গঞ্জনা, অপর দিকে গৌর-বিরহের ক্লেশ, এই সকলে তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া পড়িল। তাঁহার চক্ষু দিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল। যিনি চারিদিকে ভক্তির সুবিমল আলোকে আলোকিত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কি গোপনে থাকিতে পারেন? অল্প সময়ের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, তিনি কুলিয়াগ্রামে (১) মাধব দাসের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রভু এখানে এক সপ্তাহকাল বাস করেন। এই কয়েক দিবস গৌরচন্দ্রের দর্শনাভিলাষী হইয়া সহস্র সহস্র লোক গ্রাম গ্রামান্তর হইতে কুলিয়ায় আগমন করিতে লাগিল।

লোকের পারাপারের জন্য নদীবক্ষে বহু তরণী রাখা হইল। কিন্তু জনতা এত অধিক হইয়া পড়িল যে, বহুসংখ্যক নৌকাসত্ত্বেও তাহাতে স্থান সঙ্কুলন হইল না। অনেক লোক কলস প্রভৃতির সাহায্যে নদী

(১) কুলিয়া—পূর্ব্বে নবদ্বীপের পরপারেই কুলিয়াগ্রাম ছিল। পূর্ব্বনবদ্বীপ এখন গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন। বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রায় অধিকাংশ স্থলই এখন কুলিয়া।

পার হইতে লাগিল। গ্রামের পথে আর স্থান না হওয়ায়, অনেকে বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক একবার নবদ্বীপের গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিল। নানা স্থানে মহোৎসবের ন্যায় মেলা বসিয়া গেল।

প্রভু তৎপর সদলে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে গমন করেন। আচার্য্য শচীদেবীকে এখানে আনয়ন করেন। তিনি আচার্য্যভবনে আগমন করতঃ পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলেন। নবদ্বীপ হইতে বহুসংখ্যক লোক এই উপলক্ষে শান্তিপুরে আগমন করে। গৌর দশ দিবস আচার্য্যভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই দশ দিবস যেন তাঁহার ভবনে একটি মহোৎসব হইয়াছিল। গৌরজননী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিমাইকে ও তাঁহার ভক্তদলকে খাওয়াইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। এখানে ধনশালী গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র আজন্ম সাধু রঘুনাথ দাস আগমন করতঃ প্রভুর দর্শনলাভে চরিতার্থ হন।

প্রভু তৎপরে বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলিগ্রামে আগমন করেন। সুয়েদহুসেন সা তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। গৌর যেখানেই যাইতেন সেইখানেই বহুলোকের সমাগম হইত। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী রামকেলিগ্রামে তিনি উপস্থিত হইলে গৌড়াধিপতি প্রভুর আগমনবার্ত্তা ও তাঁহার প্রচারপ্রণালীর বিষয় শ্রবণ করিয়া, তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীকে গৌরের প্রভাব সম্বন্ধে বলেন, "আমি অর্থ ব্যয় করিয়াও আমার কর্ম্মচারীদিগের এমন আনুগত্য লাভ করিতে সমর্থ হই না; আর শত শত লোক বিনা অর্থে এ ব্যক্তির আদেশ পালন ও পরিচর্য্যা করিয়া আপনাদের জীবন সফল হইল মনে করিতেছে।" মুসলমান উপাধিধারী বীরখাস ও দবিরখাস নামে গৌড়াধিপতির দুই জন কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা ভক্ত ও ধর্ম্মানুরাগী। অনেক

দিন হইতে শ্রীচৈতন্যের প্রতি অনুরাগী হইয়া ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, মুসলমানাধিপতিকে বিশ্বাস নাই। হয় ত কোন সময় কোন বিপদ ঘটাইতে পারেন। তাঁহারা এইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গকে রামকেলি হইতে অন্যত্র গমন করিবার জন্য পরামর্শ দান করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা অপূর্ব্ব ভগবৎপ্রেম, উচ্চতর শিক্ষা ও বৈরাগ্যের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, রূপ সনাতনের নাম তাঁহাদিগের মধ্যে চিরদিনই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত থাকিবে। যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেন। দেহান্তের সময় তিনি তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যান। অনিরুদ্ধের দুই পত্নীর গর্ভে রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই সহোদর জন্মগ্রহণ করে। রূপেশ্বর কনিষ্ঠ সহোদর হরিহর কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া মাতা ও পত্নীসহ পৌরস্ত দেশে আসিয়া বাস করেন। এখানে তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম পদ্মনাভ। পদ্মনাভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, গঙ্গাতীরে বাস করিবার মানসে নবহট্ট (নৈহাটি) গ্রামে আসিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। পদ্মনাভ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, এইজন্য যাগযজ্ঞানুষ্ঠানে পরমানন্দেই সময় অতিবাহিত করিতেন। ইঁহার আঠারো কন্যা ও পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পঞ্চপুত্রের সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমার। ইনি অতি ধীর ও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুসমাজের উৎকট জাত্যভিমানের জন্য কুমার যবন দর্শন করিলে, ধর্ম্মনষ্ট হইল মনে করিয়া তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। কিন্তু জানি না কেন, ইনি গ্রামের আত্মীয়স্বজনের অপ্রিয় ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া বাখরগঞ্জে আসিয়া বাস করেন, এবং যশোহরের মধ্যে ফতোয়াবাদে গৃহনির্ম্মাণ করেন। এই স্থানেই রূপ সনাতন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনাতন জ্যেষ্ঠ, রূপ মধ্যম ; বল্লভ বা অনুপম নামে তাঁহাদের আর এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি কনিষ্ঠ।

রূপ ও সনাতন বাল্যকালে সংস্কৃতভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। সনাতন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহোদর বিদ্যাবাচস্পতির নিকট যথানিয়মে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কোন পুস্তকে শিক্ষাগুরু বিদ্যাবাচস্পতির নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বল্লভও সংস্কৃতশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। রূপ সনাতন যেমন সুপণ্ডিত তেমনি ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ইঁহাদের বুদ্ধিও প্রখর ছিল। তৎকালে সুয়েদ হুসেন সা বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গৌড়েশ্বর রূপ ও সনাতনের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় শ্রবণ করিয়া, সনাতনকে সচিবের ও রূপকে রাজ্যের অন্য কোন উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত করেন। ভ্রাতৃদ্বয় মুসলমান রাজসরকারে কার্য্যভার গ্রহণে বড় প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু যদি তাঁহাদিগের প্রতি কোন উৎপীড়ন হয়, এই ভয়ে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অল্পকালমধ্যে গৌড়েশ্বর উভয় ভ্রাতার কার্য্যদক্ষতা দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বল্প করে অনেক জমিদারী প্রদান করেন। তাঁহারা গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলিগ্রামে আপনাদিগের বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, তাঁহারা পণ্ডিত ও সাধুদিগের সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন।

রূপ সনাতন বাটীর সম্মুখে কদম্ববৃক্ষ-পরিবেষ্টিত শ্যাম ও রাধাকুণ্ড নামে দুইটি জলাশয় খনন করিয়া তন্নিকটে উপবেশন করতঃ হরিগুণ ধ্যান ও কীর্ত্তনে রত হইতেন। সনাতন রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যের সমস্ত ভার মস্তকে গ্রহণ করিয়াও "হংসদূত" ও "পদাবলী" নামক দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। যে সময় শ্রীচৈতন্য হরিনামের মধুর কীর্ত্তনে বঙ্গের নানাস্থানের লোকদিগকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেছেন, ভক্তির সুধারসে শুষ্ক কঠোর বৈদান্তিক-

দিগের হৃদয় অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিপথাবলম্বী করিতেছেন, সে সময় চৈতন্যচন্দ্রের পবিত্র সহবাস লাভ করিবার জন্য রূপ সনাতনের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু রাজকার্য্যের গুরুতর ভারে লিপ্ত থাকায় তাহা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় মনে করিয়া, তাঁহারা হৃদয়ের পিপাসা নিবারণের জন্য দীনভাবে তাঁহার নিকট পত্র লিখিতেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের ব্যাকুলতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পত্রদ্বারা এই শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবা স্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

কোন কুলনারী অন্য পুরুষে আসক্তা হইয়া গৃহকর্ম্মে রত থাকিয়াও যেমন অন্তরের ভিতর প্রেমরস আস্বাদন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বিষয় কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও সেই ভগবানের মধুর রসে সতত চিত্তকে নিমগ্ন রাখিবে। ধর্ম্মানুরাগী ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীচৈতন্যের উপদেশানুসারেই বিষয়ের মধ্যে হরিপ্রেমানুরাগী হইয়াই বাস করিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রাকালে যখন রামকেলি (১) গ্রামে আগমন করেন, তখন রূপ সনাতন তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া, গভীর নিশীথ সময়ে দীনবেশে হরিদাস ও নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। গৌর ভক্তদ্বয়কে দর্শন করিয়া পুলকিত অন্তরে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। রূপ সনাতন অতি দীনভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে চৈতন্যচরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আমরা অতি হীন, মহাপাপী, বিষয় কূপে ডুবিয়া রহিয়াছি। কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করিব, তাহার উপায় বলিয়া দিন।" শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের প্রার্থনায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,

(১) রামকেলি—মালদহ হইতে ৮।৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সনাতন গোস্বামি-খোদিত সনাতনসাগর ও রূপ গোস্বামিখোদিত রূপসাগর আজও উক্ত গ্রামে এই ভক্তদ্বয়ের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিতেছে। এখানে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিবসে ভক্তদিগের মহোৎসব হইয়া থাকে।

"শীঘ্রই হরি তোমাদের বন্ধন মোচন করিবেন।" অবশেষে গৌর শিষ্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে যাবনিক নামের পরিবর্ত্তে ইহাদিগের দুই ভ্রাতার রূপ ও সনাতন নাম হইল,—সকলেই এই নামেই ইঁহাদিগকে সম্বোধন করিবে।" দবিরখাস ও সাকার মল্লিকের প্রতি কৃপাশীর্ব্বাদ ও তাঁহাদিগের নূতন নামকরণে সকলের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল; তাঁহারা হরিধ্বনিতে নিস্তব্ধ নৈশগগন বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। বিদায় লইবার সময় সনাতন বলিলেন, "প্রভো! নির্জ্জনতা সম্ভোগ মানসে বৃন্দাবন যাইতেছেন, কিন্তু এত জনতার মধ্যে আপনি বৃন্দাবন-যাত্রার সুখ কিরূপে সম্ভোগ করিবেন? এ সময় এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই ভাল বলিয়া আমার বিবেচনা হয়।"

পরদিন প্রভাতে প্রভু কানাইয়ের নাট্যশালায় (১) আগমন করিলেন। তিনি যেখানেই যান, প্রবল জনস্রোত তাঁহার অনুগমন করে। প্রভু দেখিলেন সনাতন এ অবস্থায় তাঁহাকে বৃন্দাবন গমন করিতে নিষেধ করিয়া সৎবুদ্ধিরই পরিচয় দান করিয়াছেন; চৈতন্য তাঁহার বাক্যের যুক্তি-যুক্ততা অনুভব করিয়া বৃন্দাবন-গমনের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু নীলাদ্রি যাইবার পূর্ব্বে তিনি পুনরায় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। পুত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে শচীদেবী অদ্বৈতভবনে আগমন করেন; এবং স্বয়ং রন্ধনাদি করিয়া সকলকে আহার করান। প্রভু এখানে দশ দিবস অবস্থান করিয়া ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনাদি করতঃ নীলাচলাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রভু নীলাচল পথে যাইতে যাইতে বরাহনগর (২) নামে কোন গ্রামে

(১) কানাইয়ের নাট্যশালা (কানাঞির) গৌড়ের নিকটে রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দূরে।

(২) বরাহনগর—কলিকাতার নিকটে। এক ক্রোশের কিছু অধিক।

উপস্থিত হন। সেই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, ইনি সুপণ্ডিত। চৈতন্যদেব, তাঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং বিপ্রকে বলিলেন, "আমি তোমার মুখে যেরূপ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিলাম, অন্য কাহারো মুখ হইতে এমন মিষ্ট পাঠ আর শ্রবণ করি নাই।" শ্রীচৈতন্য বিপ্রগৃহে গভীর নিশীথ সময় পর্য্যন্ত ভাগবত শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিতে যাপন করিয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন; যাইবার সময় তিনি ব্রাহ্মণকে ভাগবতাচার্য্য উপাধি দান করেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন বিহার

শ্রীচৈতন্য নীলাদ্রিতে উপনীত হইয়া বৃন্দাবনগমনের প্রতিবন্ধকতার কথা বন্ধুদিগকে অবগত করিলেন। তিনি রামানন্দ ও দামোদরকে বলিলেন, "আমি এবার কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকীই বনপথে গমন করিব স্থির করিয়াছি। তোমরা এ বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না; সন্তুষ্টচিত্তে, আমাকে তথায় যাইবার অনুমতি প্রদান কর।" প্রভুর বৃন্দাবনগমনের একান্ত বাসনার বিষয় সকলেই অবগত ছিলেন, এখন তাঁহার সে বাসনা চরিতার্থ হওয়ার পক্ষে বিশেষ সহায়তার একান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায় তাঁহারা বলিলেন, "এখন বর্ষাকাল নিকটবর্ত্তী; বাহির হইলে পথে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে; বর্ষান্তে শরতের প্রারম্ভে বহির্গত হওয়াই ভাল। আর ঐ দুর্গম পথে গমন করিতে হইলে, তোমার সেবার জন্য দুই একজন লোক সঙ্গে থাকা চাই। প্রভু বলিলেন, সঙ্গীদিগের

মধ্যে একজনকে সঙ্গে লইলে অপরেও আমার সাথী হইতে চাহিবে।” পরামর্শদাতারা বলিলেন, “বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি তোমার সঙ্গে গৌড় হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন ভাল ব্রাহ্মণ সেবক আছে। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যেরও তীর্থভ্রমণের বাসনা আছে; ইঁহাদিগকে তোমার সাথী করিয়া লইলে, তোমারও সাহায্য হইবে, আর ইঁহারাও তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার সেবাতে ও তীর্থদর্শনে আপনাদিগের জীবনকে সার্থক বিবেচনা করিবে।” প্রভু তাঁহাদিগের কথায় কোন উত্তর দান না করিয়া নীরব রহিলেন। শরৎকাল সমাগত হইলে, চৈতন্যদেব এক দিবস জগন্নাথ দর্শন ও তদীয় আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ঊষাকালে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তদীয় সহচরকে সঙ্গে লইয়া অজ্ঞাতসারে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। নির্জ্জন বনপথে সেই হৃদয়বিহারী হরির মধুময় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিবেন, এই তাঁহার হৃদয়ের বাসনা। গৌর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবের সাধারণ গতায়াতের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক কটক সহর ডাহিনে রাখিয়া বনপথে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর জঙ্গলের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ভগবৎ-প্রেমিকেরা চিরদিনই সকল দেশে ও সকল স্থলে, নির্জ্জন প্রকৃতির সঙ্গ উপভোগে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। আজ ভগবদ্ভক্তদিগের শিরোভূষণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৃন্দাবন যাত্রাকালে গহন বনে বিহগকূজিত বিটপি-শ্রেণীর মধ্য দিয়া, মনের উল্লাসে আপনার ইষ্টদেবতার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, এই নিবিড় জঙ্গলে, তিনি ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র-জন্তু সকলের মধ্য দিয়া যখন গমন করিতে লাগিলেন, তখন তাহারাও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, আপনাদের হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন হরিনামামৃত রসে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে লাগিল। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, এক দিবস একটা ব্যাঘ্র পথিমধ্যে শয়ন করিয়াছিল, চৈতন্যদেব ভাবে বিভোর হইয়া চলিতে চলিতে, উহার

গাত্রে তাঁহার চরণ স্পর্শিত হইলে, প্রভু তাহা শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণে দেহ মন পবিত্র করিতে বলিলেন। ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আর একদিন প্রভু অরণ্য মাঝে নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় এক হস্তীর দল জলপানার্থ সেই নদীতে আগমন করিল; তিনি অঞ্জলি ভরিয়া, হস্তি-যূথের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিলেন। তাহাদের গাত্রে জলবিন্দু নিপতিত হইলে, তাহারা ভাবে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, কেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠনিঃসৃত বংশীর মধুর ধ্বনির ন্যায় হরিনাম শ্রবণে কুরঙ্গের দল আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল। ময়ূর ও অরণ্যের বিহগকুল মধুর হরিগুণ কীর্ত্তন করতঃ আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। প্রভুর আগমনে ঝারিখণ্ড (১) অরণ্যের তরু লতা সকলও যেন কৃষ্ণপ্রেমের মধুর আস্বাদনে বিভোর হইয়া, হরিধ্বনি করিতে লাগিল। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, এ সকল ঘটনা, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের চাক্ষুষ দর্শনের প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

বনপথে অসভ্য ভীলদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী অতিক্রম করিয়া তাঁহা-দিগকে গমন করিতে হইয়াছিল। যিনি গৌড়দেশ, দক্ষিণ রাজ্য ও উৎকল-বাসীদিগকে হরিপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি নিরক্ষর অর্দ্ধ উলঙ্গাকৃতি ভীলদিগকেও সেই প্রেমের অধিকারী করিয়া তুলিতে লাগিলেন; তাহারাও প্রভুর আগমনে হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

যাত্রিদল আনন্দিত মনে নির্জ্জন বনে গমন করিতে লাগিলেন। প্রভু

(১) ঝারিখণ্ড—বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে জঙ্গলময় স্থান

নির্ঝরিণীর উষ্ণ জলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন, বনের কাষ্ঠখণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া শীত নিবারণ করিতেন। তাঁহারা যখন কোন জনপদে গমন করিতেন, তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সময়ে সময়ে দীর্ঘকাল বনপথে গমনের জন্য, ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। ভট্টাচার্য্য বনজাত বিবিধ শাক লইয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন। প্রভু অতি প্রফুল্ল মনে শাকান্ন ভোজন করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি মনের এই আনন্দের আবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। একদিন হৃদয় খুলিয়া বলভদ্রকে বলিলেন, "দেখ ভট্টাচার্য্য, আমি অনেক দেশে গেলাম, ইহার পূর্ব্বেও অনেককে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন দর্শন করিব স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু সনাতনের সৎপরামর্শে আমি সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া, আমাকে এ নির্জ্জন পথে লইয়া আসিলেন। আহা! তাঁহার কি অপার করুণা! আমি বনপথে বিচরণ করিয়া যে সুখ অনুভব করিতেছি, তাহা আমি আর জীবনে কখন করি নাই। শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণা ভিন্ন জীবনে কোন সুখই লাভ হয় না।" বলভদ্র বিনম্রভাবে বলিলেন, "প্রভো! আমি অধম পামর, তুমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তুমি যে কৃপা করিয়া, আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিলে, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য—তুমি আমাকে সঙ্গে আনিয়া কাককে গরুড়ের সম্মান দান করিলে।"

শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে সমভিব্যাহারীদিগের সহিত কাশীধামে উপনীত হইলেন। মধ্যাহ্নে যখন তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানার্থ গমন করেন, তখন তপন মিশ্রও স্নানার্থ তথায় আগমন করেন। প্রভু যখন পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তখন তপনমিশ্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়, এ বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মিশ্র প্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলে, প্রভু তাঁহার হস্ত ধরিয়া উত্থিত করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন দান করিলেন।

বহুদিন পরে প্রভুকে সন্ন্যাসাবস্থায় দর্শন করিয়া মিশ্রের চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। স্নানান্তে বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শনানন্তর মিশ্র প্রভুকে আপন ভবনে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু তপন মিশ্রের ভবনে গমন করিলে, মিশ্র-পরিবারস্থ সকলে, যেন আনন্দ-নীরে ভাসিতে লাগিল; এবং তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া, পাদোদক পান করিল। বলভদ্র প্রভুর জন্য রন্ধন করিলেন। ভোজনান্তে প্রভু শয়ন করিলে, মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ তাঁহার চরণ-সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর পরিচিত চন্দ্রশেখর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি কাশীতে লিখনকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। চন্দ্রশেখর প্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য প্রভুও প্রেমভরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লইলেন। চন্দ্রশেখর ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভো, এ স্থলে মায়াবাদ অদ্বৈতবাদ ও শুষ্ক বেদান্তের কথা ভিন্ন আর কোন প্রসঙ্গই শুনিতে পাইবেন না। কেবল মিশ্র আমাকে হরিকথা শুনাইয়া আমার প্রাণ শীতল করিয়া থাকেন; আমরা নিত্যই আপনার অনুপম চরিত্রের গুণানুকীর্ত্তন করি।"

তৎকালে কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামী বৈদান্তিকদিগের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে বেদান্ত শিক্ষা দান করিতেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দ স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে এক পরম ভক্ত এখানে আগমন করিয়াছেন। এই পরম রূপবান সন্ন্যাসীর মধ্যে দেব-বাঞ্ছিত ভক্তির সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে, তিনি কখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে নৃত্য করেন, কখন ক্রন্দন করেন। ইঁহাকে দেখিলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ বিপ্রের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দেবোপম গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া, হাস্য

করিতে করিতে বলিলেন, 'গৌড়দেশের এক ভাবুক সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর শিষ্য, ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে লোককে বিমোহিত করেন; এবং দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে লোক নাচাইয়া বেড়ান, তাহা শুনিয়াছি। এই ভাবুক সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও নাকি মোহিনীশক্তিপ্রভাবে ভাব-রসের রসিক করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু কাশীধাম ভাবপ্রধান স্থান নয়; এখানে তাঁহার ভাবকালী বিক্রয় হইবে না।'

বিপ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি প্রকাশানন্দের ঈদৃশ ভাব দর্শন করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে, প্রভুর নিকট আসিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'কাশীধামে ভাবকালী বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছি, যদি বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইব, অথবা সুবিধা হইলে স্বল্পমূল্যেও বিক্রয় করিব।'

প্রভু বারাণসীধামে অবস্থানকালে সুবুদ্ধি রায়কে হরিনাম গ্রহণ করিতে বলিয়া তাঁহার পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেন। সুবুদ্ধি রায় একসময়ে গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার অধীনে সৈয়দ হুসেন শা কর্ম্ম করিতেন। একবার এক দীঘি কাটাইবার ভার সৈয়দ হুসেনের উপর অর্পিত হয়; সুবুদ্ধি রায় তাঁহার কার্য্যের কোন ত্রুটির জন্য তাঁহার পৃষ্ঠে চাবুক আঘাত করেন। সময়ে সৈয়দ হুসেন, গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। হুসেন শার পত্নী, স্বামীর প্রতি সুবুদ্ধি রায়ের প্রহারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে বলেন। হুসেন শা বলিলেন, "সুবুদ্ধি রায়ের নিকট হইতে আমি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি তাঁহার প্রাণ বিনাশরূপ অপরাধে অপরাধী হইতে পারিব না।" কিন্তু হুসেন শার পত্নী বৈরনির্য্যাতনের জন্য পুনঃপুনঃ স্বামীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পত্নীর অনুরোধ আর উপেক্ষা করিতে না পারিয়া হুসেন শা সুবুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়ার জল ছড়াইয়া দেন। সুবুদ্ধি রায় জাতিভ্রষ্ট হইয়া ঘৃণায়

ও লজ্জায় চিরদিনের জন্য আপন আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করেন। তথায় তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রার্থনা করাতে, তাঁহারা তপ্ত ঘৃত পানে জীবন বিনাশ করাই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করেন। সুবুদ্ধি রায়, হিন্দু পণ্ডিতদিগের এই ব্যবস্থা পালনে বিমুখ হইয়া, মনের দুঃখে কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। যখন শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে আগমন করেন, তখন সুবুদ্ধি রায় তাঁহার নিকট আসিয়া আপনার অবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার অবস্থার বিষয় শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'তুমি সর্ব্বদা হরিনাম কর, ইহাই তোমার কার্য্যের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।' সুবুদ্ধি রায় প্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হরিনামামৃত রসপানে ও দীনদুঃখীদিগের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

গৌর কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে গমন করেন। এখানে যমুনাদর্শনে তাঁহার এমন ভাবোদয় হইল যে, তিনি তাহাতে ঝম্পপ্রদান করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ জলে ঝম্পপ্রদান করিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করিলেন। প্রভু তিন দিবস প্রয়াগে অবস্থিতি করিয়া বহু লোককে কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী করিয়া, মথুরাধামে গমন করিলেন। এখানে বিশ্রামতীর্থে স্নান করিয়া তিনি কেশবদর্শন করিয়া নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিলেন। এখানে এক বিপ্র তাঁহার সঙ্গে নৃত্য ও কীর্ত্তনাদি করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে বিশেষ ভক্ত বলিয়া তাঁহার প্রতীয়মান হইল। প্রভু তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মধ্যে আমি চমৎকার ভগবৎভক্তির ভাব দর্শন করিতেছি; তুমি এ মধুর ভক্তিভাব কোথা হইতে লাভ করিলে?" বিপ্র তদুত্তরে বলিলেন, "মাধবেন্দ্রপুরী একবার এখানে আগমন করিয়া, কৃপা করিয়া আমার গৃহে আতিথ্যস্বীকার করেন, এবং আমার হস্তের রন্ধন ভোজন করেন। তিনি গরীবের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করেন, এবং দীক্ষাদানে

আমাকে তাঁহার শিষ্য করিয়া যান।” গৌর মাধবেন্দ্রপুরীর কথা শ্রবণ করিয়া, বিস্ময় ও পুলকে পূর্ণ হইয়া সেই বিপ্রের চরণে প্রণিপাত করিলেন। শ্রীচৈতন্যের ঈদৃশ কার্য্য দর্শনে বিপ্র ভীত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “আমি সামান্য লোক, আপনি আমার চরণ স্পর্শ করিয়া আমাকে কেন অপরাধী করেন?” এই বলিয়া তিনি তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য বিপ্রকে বলিলেন, “মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী প্রভুর গুরু।” তখন বিপ্র প্রভুকে আপন ভবনে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলে বিপ্র তাঁহাদিগকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করিলে প্রভু ভোজন করিলেন। সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে সন্ন্যাসীরা ভোজন করেন না; কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। বিপ্র প্রভুর অপূর্ব্ব ভক্তি ও উদারতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে, এ আমার পরম সৌভাগ্য; তুমি ত আর মানুষ নও, তুমি সাধারণ বিধির অতীত।”

প্রভু যখন এই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন, তখন তাঁহার আগমনবার্ত্তা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল। বিপ্র প্রভুকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনের নানাস্থান দেখাইতে লাগিলেন। প্রভু বৃন্দাবনের চব্বিশ ঘাটে স্নান করিলেন, এবং মধুবন, তালবন প্রভৃতি দর্শন করিলেন। কথিত আছে, তিনি যখন বৃন্দাবনের পথ দিয়া গমন করিতেন, তখন গাভীগণ হাম্বারবে নিকটে আসিয়া তাঁহার গাত্র লেহন করিত; মৃগীগণও নির্ভয়ে তাঁহার মুখের দিকে অনিমিষলোচনে তাকাইয়া থাকিত। বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখা হইতে মধুরস্বরে সঙ্গীত করিত; ময়ূর সকল তাহাদের অনুরঞ্জিত পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে থাকিত; তরুলতাগণ প্রেমে বিভোর হইয়া পুষ্পবর্ষণ করত, তাঁহার অভ্যর্থনা করিত।

শুক-সারী বৃক্ষডালে বসিয়া রাধাকৃষ্ণের গুণাবলী কীর্ত্তনে প্রভুর হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করিত। এইরূপে বৃন্দাবনধাম প্রভুর আগমনে যেন এক নূতন আকার ধারণ করিল। জলস্থল যেন হরিপ্রেমরসে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন দর্শনে চৈতন্য প্রভুরও কৃষ্ণপ্রেম পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইল; সকল পদার্থই তাঁহার হৃদয়ের প্রেমপ্রস্রবণকে আরো উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতে লাগিল,—সকল পদার্থেই তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। একবার কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে যাইতে যাইতে ময়ূর দর্শনে তাঁহার কৃষ্ণস্মৃতি উদিত হইয়া উঠিল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাতে, তিনি চেতনা লাভ করিয়া, পথে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; কণ্টকে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরধারা বহিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য জলসেক প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রেমানন্দে নৃত্য গীত করিতে করিতে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়া আরিটগ্রামে উপনীত হইলেন। সেখানে গমন করিয়া, তিনি লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধাকুণ্ড কোথায়?" কেহ তাহার তত্ত্ব বলিতে না পারাতে, তিনি কুণ্ডের উদ্দেশ্যে এক ধান্যক্ষেত্রের জলে স্নান করিলেন।

বৃন্দাবনধাম চৌরাশী ক্রোশ। শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন গমনের পূর্ব্বে প্রকৃত বৃন্দাবন ক্ষেত্র বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান লোকে নির্ণয় করিতে পারিত না; তাঁহার সময় হইতেই বৃন্দাবনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল,—শ্রীকৃষ্ণের লুপ্ত কীর্ত্তি সকল পুনর্জ্জীবন লাভ করিল, বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

প্রভু তৎপর সুমোল সরোবর ও গোবর্দ্ধন গিরি দর্শন করেন। গোবর্দ্ধন গিরি দর্শনে কৃষ্ণলীলার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়পথে উদিত হইয়া তাঁহাকে প্রেমে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। তৎপর অন্নকূট, গোকুল (১)

(১) গোকুল—মথুরা হইতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

প্রভৃতি স্থল দর্শন করিয়া, তিনি পুনরায় মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এখানে আগমন করিলে, তাঁহার দর্শনের জন্য এত জনতা হইতে আরম্ভ হইল যে, তিনি নির্জ্জনতা লাভের জন্য অক্রূর তীর্থে গমন করিলেন। এখানে যমুনার নিকটে একটি তেঁতুল বৃক্ষ-তলে সুন্দর বসিবার বাঁধান বেদী ছিল ; বৃক্ষটি অতি পুরাতন। কৃষ্ণলীলার সময়ের বলিয়া পরিচিত। প্রভু এই রমণীয় স্থলেই আপনার অবস্থানের জন্য নির্ব্বাচন করিলেন।

বৃক্ষতলে বসিয়া, তিনি সম্মুখে পবিত্র যমুনার স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে রত থাকিতেন। জনকোলাহলশূন্য স্থানে তিনি তাঁহার প্রাণনাথকে লইয়া হৃদয়ে সম্ভোগ করিবেন, এই বাসনা তাঁহার প্রবল হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না। তাঁহার দর্শন-লালসা লোকের হৃদয়ে এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি যেখানেই গমন করিতেন জনস্রোত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিত। এই নির্জ্জন প্রদেশেও তাহা ঘটিল। যাহারা তাঁহাকে দেখিত, তাঁহার কণ্ঠ হইতে সুধামাখা হরিধ্বনি শ্রবণ করিত, তাহারাই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পথানুসরণ করিত ; বৃন্দাবনধামে তিনি বহুসংখ্যক লোককে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক করিয়াছিলেন। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে, শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় ?" আগন্তুক বলিল, "সে যে স্বয়ং আপনিই।" শ্রীচৈতন্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "বিষ্ণু বিষ্ণু ! জীবাধমকে কৃষ্ণ বলিও না।" অক্রূর তীর্থে বাস করিবার সময় কৃষ্ণদাস নামে এক রাজপুত প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার রূপগুণে এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, সে ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণানন্তর সংসার সুখ একবারে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন

করিল। এস্থলে অবস্থানানকালীন লোকে তাঁহাকে দর্শন করিয়াই যে হৃদয়ের পিপাসা নিবৃত্তি করিত তাহা নহে, বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে আপনাপন ভবনে ভিক্ষা গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল। বলভদ্র প্রতিদিন একটির অধিক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না।

অক্রূরে কিছুদিন অবস্থানানন্তর বলভদ্র, বিপ্র কৃষ্ণদাস প্রভুকে লইয়া প্রয়াগে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে প্রভু সঙ্গীদিগের ক্লান্তি দেখিয়া, বিশ্রামার্থ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। সেই সময় হঠাৎ এক গোপ বংশী বাজাইতে আরম্ভ করে; প্রভু বংশীধ্বনি শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ হইতে ফেন নির্গত হইতে লাগিল; সঙ্গীরা সহজে তাঁহার সংজ্ঞা উৎপাদন করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে দশজন পাঠান সৈন্য অশ্বারোহণে সেই দিক দিয়া গমন করিতেছিল, তাহারা সেই স্থলে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের সংজ্ঞাহীন অবস্থা দর্শনে মনে করিল, ইঁহার নিকট যাহারা বসিয়া রহিয়াছে ইহারাই অর্থলোভে এই ব্যক্তিকে ধুতরা খাওয়াইয়াছে; এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহারা বলভদ্র প্রভৃতিকে প্রাণদণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ফেলিল। অশ্বারোহী পাঠানদিগের বাক্যে সকলেই ভীত হইলেন। কিন্তু রাজপুত কৃষ্ণদাস নির্ভয়ে বলিলেন, "যিনি অজ্ঞানাবস্থায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, ইনি আমাদের গুরু; ইঁহার মৃগীরোগ আছে। কিছুক্ষণ পরেই প্রভু চেতনা লাভ করিবেন।" এই বলিয়া কৃষ্ণদাস বলিলেন, "এই গ্রামেই আমার বাড়ী; আমি যদি এখনই সংবাদ দেই তাহা হইলে দুইশত তুরুকী এখানে উপস্থিত হইবে এবং দুইশত কামানও আসিবে; তুরুকীরা, তোমাদের যাহা কিছু আছে সমস্ত কাড়িয়া লইবে। এই সকল ভদ্রলোক চোর নহে। তোমরাই বাটপাড়।" রাজপুতের মুখ হইতে এই সকল কথা শ্রবণে তাহারা ভীত হইয়া সকলের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীচৈতন্যের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়া গেল; তিনি

প্রেমাবেশে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া হরি হরি বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পাঠানগণ প্রভুর ঈদৃশ দেবভাব দর্শন করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। এই পাঠানদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি অদ্বৈতবাদ বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, প্রভু তাহার মত খণ্ডন করিয়া দিলেন। সে ব্যক্তি প্রভুর যুক্তি শ্রবণে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিল, "আমি অধম, আমাকে দয়া কর। আমি অনেক শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এতদিন আমি কোন পথ নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই; আজ আমার সকল সংশয় দূর হইল। তুমি মানব নও, সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ।" প্রভু তাহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে রামদাস নামে তাহার নামকরণ করিলেন। অশ্বারোহীদিগের মধ্যে একজন নবীনবয়স্ক রাজকুমার ছিলেন, প্রভু তাঁহারও পূর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে "বিজুলী" নাম রাখিলেন। এখন রাজকুমার বিজুলী ও রামদাস প্রভৃতি সকল পাঠানই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করিল, এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে কৃষ্ণোপাসক হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রূপ-সনাতন-সম্মিলন

বহুদিন হইতেই রূপ-সনাতনের হৃদয়ে সংসারত্যাগের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভু রামকেলি গ্রামে যখন গমন করেন, তখন রূপ-সনাতন তাঁহার দর্শন লাভে কৃতার্থ হন। প্রভু তাঁহাদিগের সংকল্পের সহায় হইয়া, তাঁহাদিগের প্রাণে বৈরাগ্যানল প্রদীপ্ত করিয়া দেন।

ভ্রাতৃদ্বয় গৃহে আগমন করিয়া বিষয়-বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রূপ-সনাতন গৌড়াধিপতির প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহারা জানিতেন, কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাহিলে রাজা কখনই অনুমতি প্রদান করিবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তরে যে অনলশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সনাতন রাজমন্ত্রী; তাঁহাকে সততই রাজধানীতে থাকিতে হইত। রূপ, রাজ্যের অন্যত্র কার্য্য করিতেন। তজ্জন্য তিনি গোপনে আপনার অভিলাষ সিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইলেন তিনি সমস্ত ধনসম্পত্তি নৌকা পূর্ণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় এক মুদির হস্তে দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতনের আবশ্যক হইলে তাঁহাকে উহা প্রদান করিতে বলেন। রূপ, বাটীতে গমন করিয়া সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও আত্মীয়দিগকে বণ্টন করিয়া দেন।

এদিকে সনাতন বিষয়-পিঞ্জর হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, রাজার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রাণে অসন্তোষ উৎপাদন করিতে না পারিলে, তাঁহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবার উপায় নাই। সনাতন পাৎসার নিকট নিজ শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া রাজকার্য্যে অবহেলা পূর্ব্বক গৃহে বসিয়া, ভাগবত অধ্যয়ন ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনায় সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। হুসেন শা রাজমন্ত্রীর অসুস্থতার কথা শ্রবণ করিয়া চিকিৎসার জন্য রাজবৈদ্য পাঠাইয়া দিলেন। বৈদ্য আসিয়া দেখিলেন, সনাতনের কোন পীড়ার লক্ষণই নাই; তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে রাজাকে তদনুরূপ সংবাদই প্রদান করিলেন। সনাতন সুস্থদেহে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থিতি , রতেছেন শুনিয়া, হুসেন শা কিছু বিস্মিত হইলেন, এবং ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিবার জন্য একদিন

তিনি স্বয়ং হঠাৎ সনাতনের ভবনে আগমন করিলেন। গৌড়াধিপতি আগমন করিলে, সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন। রাজা আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "তোমার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া বৈদ্য পাঠাইলাম, কিন্তু তিনি তোমার সুস্থতার সংবাদ প্রদান করিলেন। তোমাকে লইয়াই আমার সমস্ত কাজ; আমার যে সর্ব্বনাশ হইতেছে! তোমার মনের কি ভাব আমায় খুলিয়া বলিতে পার?" সনাতন বিনীতভাবে বলিলেন, "জাঁহাপনা! বিষয়কার্য্য করিবার আমার আর বাসনা নাই; আমা হইতে আপনার আর রাজকার্য্য চলিবে না, আপনি অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া কার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা করুন।" গৌড়াধিপতি সনাতনের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "তোমার ভাই রূপ যেন দস্যুর ন্যায় পলাইয়া গিয়াছে।" পরম বৈরাগী ও ভক্ত রূপের প্রতি গৌড়েশ্বরের ঐরূপ রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়া সনাতন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি স্বাধীন রাজা, দোষীর প্রতি আপনি যেরূপ শাস্তি উচিত মনে করেন, তাহাই বিধান করিতে পারেন।" সনাতনের এই বাক্য শ্রবণে গৌড়াধিপতি ক্রুদ্ধচিত্তে আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং সনাতনকে বন্দী করিতে আদেশ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

রূপ যখন বিষয়-সম্পত্তি সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য প্রভু কোথায় আছেন তাহা অবগত হইবার জন্য দুইজন ভৃত্য নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার বিষয় তাঁহাকে অবগত করিল। রূপ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় সনাতনকে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন।

বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা প্রয়াগে উপনীত

হইলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রভু তখন বিন্দুমাধব মন্দিরের নিকট বহুজনাকীর্ণ স্থানের মধ্যে প্রেমানন্দে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন ; তাঁহার নয়নযুগল হইতে বারিধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিতেছে। সমবেত লোকমণ্ডলীও তাঁহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া, উচ্চরবে ভক্তিভরে হরিধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে ; প্রেমাবেশে তাহারাও ভূতলে গড়াগড়ি দিতেছে। তাই চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা বলিতেছেন—

"কেহ কাঁন্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাতে।
প্রভু ডুবাইল প্রেমের বন্যাতে॥"

রূপ ও সনাতন এই বহুজনপ্রবাহ ঠেলিয়া প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বিশেষ সুবিধা নয় মনে করিয়া তাঁহারা জনমণ্ডলীর এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুর অপরূপ লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময় এক বিপ্র প্রভুকে আপনার ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তথায় প্রভু এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করিলে, রূপ ও বল্লভ দুইজনে দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে করিয়া দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রভু রূপকে দেখিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া 'উঠ, উঠ', বলিয়া, তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্থিত করিলেন এবং নিকটে বসাইয়া সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ, গৌড়াধিপতি কর্ত্তৃক তাঁহার কারাগারে বন্দী হইবার কথা জ্ঞাপন করিলে, প্রভু বলিলেন, "সনাতন কারামুক্ত হইয়াছে, শীঘ্রই আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে।"

রূপ ও বল্লভ প্রয়াগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রয়াগের সন্নিকটে যমুনার পরপারে বল্লভ ভট্ট নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস

করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আগমন করেন। ভট্ট আগমন করিলে শ্রীচৈতন্য, রূপ ও বল্লভের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিলেন। ভট্ট এই নবাগত ভক্তদিগকে আলিঙ্গন করিতে গেলে, তাঁহারা আপনাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে পলায়ন করিলেন। বল্লভ ভট্ট তাঁহাদিগের বিনয় ও ভগবন্নিষ্ঠা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভু বল্লভ ভট্টের সঙ্গে অম্বুলি গ্রামে গমন করিলেন। অম্বুলি গ্রাম যমুনার নিকটবর্ত্তী। প্রভু প্রসন্নসলিলা, কলনাদিনী যমুনার শ্যামল জলরাশি দর্শনে ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি এখানে উপস্থিত হইলে, বহুসংখ্যক লোক তাঁহার দর্শনার্থ আগমন করিতে লাগিল; এবং তাঁহার জীবনের অনুপম মাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত মধুময় ভক্তিপথের পথিক হইয়া পড়িল। যমুনার এরূপ সন্নিকটে প্রভু ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া, পাছে উহাতে ঝম্প প্রদান করেন, এই ভয়ে, বল্লভাচার্য্য তাঁহাকে পুনরায় প্রয়াগে আনয়ন করিলেন।

শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে রূপের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া, ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "রূপ! ভক্তিসিন্ধু অনন্ত গম্ভীর ও পারাপার-শূন্য। কেশাগ্র শত ভাগ করিয়া, উহা পুনরায় শত ভাগ করিলে যেরূপ হয়, জীবের স্বরূপ তদ্রূপ জানিবে। মানব অনেক সময়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অভেদ স্বীকার করিয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত ভ্রম। জীব ক্ষুদ্র, পরমেশ্বর অপরিমেয়, তিনি সর্ব্বগত, ও সৃষ্টিকর্ত্তা। জগৎ সৃষ্ট; তিনি শাসনকর্ত্তা, মানব শাসনাধীন। যাঁহারা ঈশ্বর ও জীব তুল্য মনে করেন, তাঁহারা বিশ্বনিয়ন্তার স্বরূপ সম্বন্ধে বড়ই অনভিজ্ঞ। মানব ও জীবজন্তুপূর্ণ এই বিশাল সংসার সেই অনন্ত স্বরূপের তুলনায়, অতি ক্ষুদ্রতম। নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যে মানবের সংখ্যা যৎসামান্য বলিলেই হয়; তাহার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ ও শবর আছে; বেদনিষ্ঠদিগের

মধ্যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই বেদবিহিত কর্ম্ম প্রতিপালন করে না; কেবল মুখেই বিদনিষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। ধর্ম্মাচারীদিগের মধ্যে অধিকাংশ কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি ধর্ম্মনিষ্ঠদিগের মধ্যে কেবল একজন মাত্র ব্যক্তিকে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলা যায়। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত; কোটি মুক্ত জীবের মধ্যে একজন প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত পাওয়াও দুর্ল্লভ। কৃষ্ণভক্তেরা কামনাশূন্য, অতএব শান্ত। যাঁহারা মুক্তিপ্রার্থী, সিদ্ধ ও ফলকামী, তাঁহারা অশান্ত।

যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্ত হন, এবং তদুপরি শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জলসেচন করেন, তাহা হইলে, সেই লতা, গোলোকে, শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করে; উহা হইতেই প্রেমফল উৎপন্ন হয়। বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তী যদি মস্তক উত্তোলন করে, তাহা হইলে, ভক্তি-লতা উৎপাটিত, ছিন্ন ও শুষ্ক হইয়া যায়।

যদি বিষয়-লালসা, মুক্তির বাসনা, প্রভৃতি উপশাখাগণ তৎসঙ্গে উত্থিত হয়, তাহা হইলে ভক্তি-লতাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে; এই জন্য অগ্রে উপশাখা সকল ছেদন করিয়া ফেলিব। ইক্ষুরস গাঢ় হইলে যেমন তাহা হইতে ক্রমে মিছিরি প্রস্তুত হয়, সেইরূপ সাধন ভক্তি হইতে রতি জন্মায়। এই রতি গাঢ় হইলে, তাহাকে প্রেম বলা যায়। প্রেম হইতে, প্রণয় অনুরাগ ভাব মহাভাব সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভক্তির প্রকৃতিভেদে রতিভেদ পাঁচ প্রকার; শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর। এই মাধুর্য্য রসে সকল রসেরই সমাবেশ হইয়া থাকে। হে রূপ! ভক্তির পথ ভাল করিয়া অবলম্বন কর। ভক্তিতেই প্রকৃত শান্তি।”

প্রভু রূপকে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া, বারাণসী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রূপ তাঁহার সহিত গমন করিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন, “বৃন্দাবনের এত নিকটে আসিয়া, উহা দর্শন করা

উচিত। তুমি এখন বৃন্দাবনে যাও, পরে গৌড় হইয়া নীলাচলে আম'র সহিত সাক্ষাৎ করিও।" এই বলিয়া, প্রভু ভট্টাচার্য্যের সহিত কাশীধামে যাত্রা করিলেন। রূপ, প্রভুবিরহে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি বল্লভকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

প্রভু, বারাণসী ধামে প্রবেশ করিবার সময়, চন্দ্রশেখর আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভো, আমি গত কল্য রজনীতে আপনার আগমনের স্বপ্ন দর্শন করিয়া, আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি প্রভুকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন। চৈতন্যদেবের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তপন মিশ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন। চন্দ্রশেখরের ভবনেই প্রভুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

রূপ যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন সনাতন বন্দিদশায় অবস্থিতি করিতেছেন। রূপ সনাতনকে লিখিলেন, আমি ও অনুপম শ্রীচৈতন্যের দর্শনাভিলাষী হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিতেছি; আমি মুদির নিকট দশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া গেলাম; তুমি ঐ মুদ্রা লইয়া, কারামুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিবে, এবং মুক্তি লাভ করিয়াই বৃন্দাবনে যাইবে। সনাতন ভ্রাতার পত্র পাইয়া প্রভুর নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, "মিঞাসাহেব, আপনি জানেন, কোন ব্যক্তির বন্ধন মোচন করিতে পারিলে, পরমেশ্বর তাহার সংসার-বন্ধন বিমোচন করিয়া দেন। আমি এজীবনে আপনার যে উপকার করিয়াছি, তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ আমাকে মুক্তি প্রদান করুন।" এই বলিয়া সনাতন তাঁহাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "আমি আপনাকে কারামুক্ত করিলে রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন; এবং সেজন্য আমাকেও

তাহার ফলভোগী হইতে হইবে।" সনাতন তদুত্তরে বলিলেন, "রাজা এখন যুদ্ধে যাইতেছেন, আর ফিরিবেন কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে, তিনি কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।" সনাতন তৎপরে সাত সহস্র মুদ্রা তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন; কারাধ্যক্ষ এবার আর লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি টাকাগুলি গ্রহণ করিলেন, এবং সনাতনকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার পরপারে রাখিয়া আসিলেন। সনাতন কারাগার হইতে যাইবার সময় ঈশান নামক এক বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে বৃক্ষরাজী-পরিবেষ্টিত পাতড়া নামক এক পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হন। এখানে ভূঞা নামক এক দস্যু বাস করিয়া পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত। ভূঞার নিকট এক গণক সতত বাস করিয়া, পথিকের নিকট কি আছে গণনা দ্বারা তাহা অবগত হইয়া দস্যুপতিকে জানাইত। সনাতন ঈশানকে লইয়া পাতড়া পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, জ্যোতিষী গণনাদ্বারা ঈশানের নিকট আটটি মোহর আছে, জানিয়া ভূঞাকে জানাইল। দস্যু অর্থলোভে সনাতনকে খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগের ভালরূপ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সনাতন রাজমন্ত্রী ছিলেন; তাঁহার বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ। তাঁহাদের প্রতি ভূঞার এরূপ যত্ন দর্শন করিয়া ভূঞার কার্য্যের উপর তাঁহার গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল; তিনি গোপনে ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট কিছু অর্থ আছে?" ঈশান বলিল, "আমার নিকট সাতটি মোহর আছে।" সনাতন বলিলেন, "ও কাল যম কেন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ?"

সনাতন ভূঞার হস্তে সাতটি মোহর প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমাকে পাতড়া পর্ব্বত পার করিয়া দাও; আমি রাজবন্দী, আমি প্রকাশ্য পথে যাইব না; নির্জ্জন বনপথে যাইতে চাই।" দস্যু তখন ঈষৎ হাস্য

করিয়া বলিল, "তুমি বেশ বুদ্ধিমান লোক, আমি গণকের দ্বারা তোমার নিকট আটটি মোহর আছে জানিয়াছিলাম ; আমি তোমার মোহর লইতে ইচ্ছা করি না।" সনাতন বলিলেন, "আমি উহা আমার নিকট রাখিয়া কি করিব, পথে অন্য দস্যু জানিতে পারিলে কাড়িয়া লইবে।" ভূঞা তৎপর সনাতনের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত লোক দিয়া, তাঁহাকে পাতড়া পর্ব্বত পার করিয়া দিতে বলিল। ভক্ত বিশ্বাসী সনাতন, তাহার সঙ্গে নিবিড় জঙ্গল ও পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভূঞার ভৃত্য সনাতনকে পর্ব্বতশ্রেণী পার করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল। কিয়দ্দূর গমন করিলে, সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে কি আর একটি মোহর আছে ?" ঈশান তাহা স্বীকার করিলে তিনি তাহাকে তথা হইতে ঐ মোহর লইয়াই বিদায় লইতে বলিলেন। ঈশান দেশের দিকে প্রত্যাগমন করিল।

বৈরাগী-ভক্ত সনাতন, হরিনাম করিতে করিতে একাকী গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তিনি মজঃফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুর নামক স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত দিল্লির বাদসার ঘোটকের মূল্য স্বরূপ তিন লক্ষ টাকা লইয়া যাইতেছিলেন। হাজিপুরে গৌড়েশ্বরের কর্ম্মচারীরা বাস করিতেন। শ্রীকান্তও একজন বিখ্যাত রাজকর্ম্মচারী। তিনি হাজিপুরে এক উদ্যানস্থিত প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এমন সময় হরিগুণ কীর্ত্তনের শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। কণ্ঠস্বর সনাতনের বলিয়া তাঁহার প্রতীয়মান হওয়াতে তিনি প্রাসাদ-ভবন হইতে দেখিলেন, সত্যই সনাতন, ছিন্ন কন্থা গাত্রে দিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীকান্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার আজ একি দশা ?" তিনি সনাতনকে মলিন ছিন্ন কন্থা পরিত্যাগ করিতে বলিয়া একখানি উৎকৃষ্ট শাল প্রদান করিলেন।

সনাতন তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে শ্রীকান্তের একান্ত অনুরোধে তিনি একখানি ভোট কম্বল গ্রহণ করিলেন। রাজমন্ত্রী অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সনাতন পথের ভিখারী হইলেন দেখিয়া, শ্রীকান্ত বিষাদিত অন্তরে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে আপনার বাসায় গমন করিলেন।

সনাতন ভোট কম্বল গায়ে দিয়া কিছু দিন পরে কাশীধামে উপনীত হইলেন। গৌরাঙ্গ দর্শনের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দুই হস্তে দুই গুচ্ছ ও দন্তে তৃণ করিয়া, চন্দ্রশেখরের বাটীর বহির্দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর নিকট এই সংবাদ প্রদত্ত হইল যে, একজন ফকির বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; প্রভুর আদেশে সনাতনকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল।

সনাতনের দর্শনে প্রভুর প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন বলিলেন, "আমি অধম নীচ জাতি; আমাকে স্পর্শ করিবেন না।" এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে বসাইয়া স্নেহময়ী মাতার ন্যায় তাঁহার গাত্রে আপনার সুকোমল হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "সনাতন, দৈন্য সম্বরণ কর! তোমার দীনতা দেখিয়া আমার বক্ষঃস্থল যেন ফাটিয়া যায়।" প্রভু সনাতনকে তাঁহার কারামুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় তাঁহাকে অবগত করিলেন। এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সনাতনকে কাশীতে অবস্থানকালীন তাঁহার ভবনে ভোজনের জন্য অনুরোধ করেন। সনাতন, তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া বলেন, আমি ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। সনাতন বারাণসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

বৈরাগ্য ও ভক্তিপথাবলম্বী সনাতনকে ক্ষৌর করাইবার জন্য, প্রভু চন্দ্রশেখরকে আদেশ করিলেন। ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হইল। স্নানান্তে

চন্দ্রশেখর, তাঁহাকে একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। কিন্তু সনাতন তাহা গ্রহণ না করিয়া একখানি পুরাতন বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। চন্দ্রশেখর নূতন সন্ন্যাসীর ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করিলেন। সনাতন পুরাতন বস্ত্রখানি পাইয়া তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশ পরিধান করিলেন, অপরার্দ্ধাংশ বহির্ব্বাস করিলেন। শ্রীকান্ত-প্রদত্ত ভোটকম্বলখানি তখনও পর্য্যন্ত তিনি ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু প্রভু বারবার সেই জিনিষটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সনাতন বুঝিলেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে এ মূল্যবান্ ভোটকম্বল ব্যবহার প্রভুর ভাল লাগিতেছে না; তিনি তৎক্ষণাৎ কিছু দূরে গমন করিয়া, এক দরিদ্রকে ঐ কম্বলখানি দিয়া তাহার ছিন্ন কন্থা গ্রহণ করিলেন; এবং উহা গাত্রে দিয়া প্রভুর নিকট আসিলেন। শ্রীচৈতন্য সনাতনের কার্য্যে অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিলেন, "কোন ভাল বৈদ্য কি রোগের শেষ রাখিয়া দেয়?"

প্রভু দুই মাস কাল কাশীধামে অবস্থিতি করিয়া সনাতনকে ভক্তি-তত্ত্ব শিক্ষা দান করেন। শ্রীকৃষ্ণই জগতের আদি কারণ, ও ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; তাঁহার নানা অবতার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এইরূপে ভক্তির অতি নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তাঁহাকে শিক্ষা দান করিলে, সনাতন বলিলেন, "আপনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট 'আত্মারামশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা আমার শুনিতে অত্যন্ত বাসনা হইতেছে।" গৌর বলিলেন, "আমি তখন কি পাগলামী করিয়া-ছিলাম, এখন আমার তাহা স্মরণ নাই।" তৎপর তাঁহার মনে কি এক উৎসাহের সঞ্চার হইল, তিনি ঐ শ্লোকের একষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। সনাতন প্রভুর অত্যাশ্চর্য্য শক্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে বাস করিয়া, নরনারীর কল্যাণের জন্য ভক্তি-গ্রন্থ রচনা,' ও লুপ্ত বৃন্দাবনের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সনাতন বলিলেন, "প্রভু. আমি ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিব আমার এমন কি

শক্তি আছে? আপনি যদি কৃপা করেন তবেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" গৌরসুন্দর তাঁহার গ্রন্থ রচনার জন্য মূল সূত্র সকল রচনা করিয়া দিলেন। সনাতন প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

কাশীধাম দণ্ডী সন্ন্যাসীদিগের লীলাক্ষেত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই শুষ্ক জ্ঞানালোচনায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। ভক্তির সুমিষ্ট রসাস্বাদনে ইঁহাদের সেরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্য যখন বারাণসীতে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি ইঁহাদিগের সঙ্গে মিশিতেন না। একাকী কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ও সনাতনের শিক্ষায় দিন অতিবাহিত করিতেন। প্রকাশানন্দপ্রমুখ দণ্ডী সন্ন্যাসীরা চৈতন্যকে ভাবুক বলিয়া তাঁহার নিন্দা ঘোষণা করিতেন। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "প্রকাশানন্দের শিষ্যেরা সর্ব্বদাই আপনার নিন্দা করিয়া থাকে।" প্রভু তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। একদিন এক বিপ্র প্রভুর নিকট আসিয়া বলিল, "আজ প্রকাশানন্দ স্বামী, ও এ-স্থানের সমস্ত দণ্ডী ও সন্ন্যাসী মিলিত হইবেন; আপনাকে সেই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আপনি অদ্য মধ্যাহ্নে সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।" শ্রীচৈতন্যদেব যথাসময়ে সভাতে উপস্থিত হইলেন। সভাগৃহ বহু লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চৈতন্য সভায় প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। প্রকাশানন্দ তাঁহাকে আপনার নিকট মধ্যস্থলে বসিতে বলিলে, প্রভু অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি সামান্য লোক, উচ্চস্থলে বসিবার উপযুক্ত নই।" প্রকাশানন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার নিকটে বসাইলেন। সভাতে কাশীর প্রধান পণ্ডিতগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। অদ্বৈতবাদসম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইলে, প্রভু একে একে অদ্বৈতবাদের সপক্ষের যুক্তিগুলি খণ্ডন করিতে লাগিলেন। জীব ও ব্রহ্ম যে এক হইতে পারে না, এ

বিষয়ে তিনি অতি যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন করিলে, তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দর্শনে পণ্ডিতমণ্ডলী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বৈদান্তিকদিগের শিরোভূষণ প্রকাশানন্দ স্বামী বেদান্তের নিগূঢ় ও সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণে অবাক্ হইয়া রহিলেন। সকলেই একতানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। প্রভু গৃহে আসিয়া চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে, হাসিয়া বলিলেন, "আমার ভাবকালী এখানে বিক্রয় হইবে না শুনিয়াছিলাম; কিন্তু বিক্রয় হইয়া গেল দেখিতেছি।" গৌরের শিষ্যবৃন্দ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

প্রভু একদিন বিন্দুমাধব মন্দিরের সম্মুখে শিষ্যগণ সহ প্রমত্তভাবে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় প্রকাশানন্দ স্বামী প্রভুর নৃত্য ও তাঁহার স্বর্গীয় রূপমাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। প্রভুও তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, "আপনি জগদ্গুরু, আমি আপনার শিষ্যস্থানীয় হইবার উপযুক্ত নই।" প্রকাশানন্দ বলিলেন, "তুমি মানব নহ; সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।" অবশেষে উভয়ে সেখানে উপবেশন করিলেন। তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। শ্রীচৈতন্য প্রকাশানন্দের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। বৈদান্তিকচূড়ামণির জ্ঞানগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল; তিনি মধুর ভক্তিরসের রসিক হইয়া শ্রীচৈতন্যের পথাবলম্বী হইলেন!

শুষ্ক বারাণসী ভূমিতে ভক্তির স্রোত বহিতে লাগিল; হরিনামের মধুর ধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন,—

"সব কাশীবাসী করে নামসংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসী প্রভু করিল নিস্তার ॥"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নীলাচলে রূপের আগমন

শ্রীচৈতন্য প্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আগমন করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণাবধি ছয় বৎসর কাল নানাস্থান পরিভ্রমণে অতিবাহিত হইল। এখন হইতে অবশিষ্ট অষ্টাদশ বর্ষ তিনি নীলাদ্রিতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে বর্ষে বর্ষে রথোৎসবের সময় ভক্তগণ পুরুষোত্তমে আগমন করিয়া, চারি মাস কাল অবস্থান পূর্ব্বক, প্রভুর সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনায় ও কীর্ত্তনাদিতে যাপন করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহারা বিশ বৎসরকাল এইরূপে নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ বৎসরের মধ্যে শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রভু সর্ব্বদা ভগবৎ-প্রেম-রসেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। এই প্রেমবিহ্বলতায় তিনি কখন ভূমিতে মুখ ঘষড়াইতেন; সময়ে সময়ে প্রলাপ বাক্য বলিতেন; অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিতেন, এবং কৃষ্ণ-বিরহে সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

প্রভু নীলাচলে আসিবার পূর্ব্বেই রূপ প্রয়াগে প্রভুর নিকট তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়া বল্লভের সহিত বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে রূপের মনে নাটক রচনার বাসনা উদিত হয়, এবং সেখানেই তিনি পুস্তকের সূচনা করেন। তৎপর দুই ভ্রাতায় বারাণসী হইয়া গৌড়দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু বল্লভ এইখানেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। রূপ নবদ্বীপে গিয়া শুনিলেন, প্রভুর ভক্তবৃন্দ বাৎসরিক রথোৎসব করিবার জন্য নীলাচলে যাত্রা করিতেছেন, তিনিও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; প্রভুর

নিকট নীলাদ্রির পুণ্যভূমিতে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণভক্ত পরম বৈরাগী রূপ মনের আনন্দে বন, উপবন ও নদনদীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন; বিশ্রামার্থ যখন কোন পান্থশালায় উপস্থিত হইতেন, তখন মনের কল্পনাগুলি লিখিয়া রাখিতেন। উৎকল দেশে আসিবার সময় রূপ সত্যভামাপুর নামে কোন গ্রামে বিশ্রামার্থ রাত্রি যাপন করেন। তিনি যখন নিদ্রায় মগ্ন, তখন স্বপ্নে কোন সুন্দরী নারী তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া বলেন, নাটক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রচনা কর। তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। রূপ সেই স্বপ্নদৃষ্টা দেবীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পুস্তকের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নীলাচলে আগমন করিলেন, এবং ভক্ত হরিদাসের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। হরিদাস রূপকে দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিদিন হরিদাসের আশ্রমে আগমন করিতেন। তিনি যখন তথায় আগমন করিলেন, তখন রূপ প্রভুর দর্শনমাত্র চরণে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। হরিদাস প্রভুকে বলিলেন, "রূপ তোমাকে প্রণাম করিতেছে।" তখন প্রভু রূপের হস্ত ধরিয়া ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপর প্রভু তাঁহাকে সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "সনাতনের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই—আমি প্রয়াগে আসিয়া শুনিলাম তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন।" রূপ তৎপর বল্লভের পরলোক-গমনের কথা প্রভুকে জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু তাঁহার প্রিয় বল্লভের পরলোকগমনের সমাচার পাইয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সে সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন—সকলের আগমনে পুরুষোত্তমে যেন ভক্তির ঢেউ বহিতেছিল। রূপ এই ভক্ত সম্মিলনের সময় উপস্থিত হইয়াছেন। গৌর অতুল ঐশ্বর্য্যত্যাগী পরমভক্ত রূপের সহিত অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তদিগের পরিচয় করিয়া দিলেন। শ্রীরূপও গৌড়ীয় ভক্তদিগের সঙ্গে পরিচিত হইয়া পরম পুলকিত চিত্তে

ও বিনয়াবনত মস্তকে সকলের চরণ স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

রথযাত্রার উৎসব আরম্ভ হইল। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও প্রভু ভক্তগণসহ গুণ্ডিচা সংস্কার করিয়া আইটোটা আসিয়া কয়েকদিন ক্ষেপণ করিলেন। যখন জগন্নাথদেব রথারোহণে গুণ্ডিচার দিকে গমন করেন, তখন প্রভু রথের অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গমন করিবার সময় একটি শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। সেই শ্লোকের ভাবার্থ অন্য কেহ বুঝিতে সক্ষম হইলেন না; কিন্তু ভাবগ্রাহী রূপ গোঁসাই প্রভুর শ্লোকের ভাবার্থ বুঝিয়া সেই সময় একটি শ্লোক রচনা করেন। পরদিবস তিনি তালপত্রে সেই শ্লোকটি লিখিয়া চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিয়া সমুদ্রে স্নান করিতে গেলেন। এমন সময় প্রভু আসিয়া চালের বাতায় তাল পত্র দেখিয়া উহা লইয়া পাঠ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন। রূপ স্নানান্তে আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়া বলিলেন, "তুমি কিরূপে আমার মনের ভাব বুঝিয়া এমন চিত্তাকর্ষক শ্লোক রচনা করিলে?" রূপ গোঁসাই বলিলেন, "প্রভো! তুমিই আমাকে কৃপা করিয়াছ; নতুবা তোমার হৃদয়ের ভাব আমি কিরূপে অবগত হইব?"

চাতুর্ম্মাস্য করিয়া গৌড়ীয় ভক্তেরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রায় রামানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে স্বরূপ গোস্বামীর পরিচয় করিয়া দিলেন। একদিন সর্ব্বজনসমক্ষে প্রভু রূপকে তাঁহার স্বরচিত নাটক পাঠ করিতে বলিলেন। রূপ প্রথমতঃ আপনার রচিত গ্রন্থের বিষয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ করিয়া কিছুক্ষণ মস্তক নত করিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রভুর অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে; তিনি অবশেষে, উহা পাঠ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহার নাটকের বিষয় শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি ভাবগ্রাহী সুপণ্ডিত লোক সকল তাঁহার রচনার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রূপ গোস্বামী তৎপর নীলাচলে এক বৎসর অবস্থিতি করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন, এবং তথায় দুই ভ্রাতায় ভক্তিবিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডবিধান

পুরুষোত্তমে ভগবান আচার্য্য নামে একজন সুপণ্ডিত পরম বৈষ্ণব বাস করিতেন। ইঁহার পিতার নাম শতানন্দ খান। শতানন্দ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিয়াও ইনি বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন। তদীয় পুত্র ভগবান আচার্য্য ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যদেবের বড় অনুরক্ত ছিলেন। ভগবান আচার্য্য সুপণ্ডিত ও ভক্ত হইয়াও রন্ধন-কার্য্যে বড় সুপটু ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিবিধ ব্যঞ্জন দ্বারা ভোজন করাইতেন। একদিন প্রভুকে ভোজন করাইবার জন্য ভগবান আচার্য্য ছোট হরিদাসকে শিখি মাইতির ভগিনী বৃদ্ধা ধর্ম্মপরায়ণা মাধবী দাসীর নিকট হইতে এক মণ ভাল তণ্ডুল আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। হরিদাস আচার্য্যের কথানুসারে তাহাই করিলেন। ভগবান সেই তণ্ডুলের অন্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। প্রভু যখন আচার্য্যের ভবনে আহার করিতে বসিলেন, তখন অন্নের সুগন্ধিতে মুগ্ধ হইয়া ভগবানাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চাউল কোথায় পাইলে?" আচার্য্য বলিলেন, "ছোট হরিদাসকে

আমি শিখি মাইতির ভগিনী, মাধবী দাসীর নিকট হইতে চাহিয়া আনিতে বলি, হরিদাস তাহার নিকট হইতে এই চাউল আনিয়াছে।" প্রভু তখন কিছু না বলিয়া ভোজনান্তে গৃহে গমন করিয়া ভৃত্য গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "ছোট হরিদাসকে আজ হইতে এখানে আসিতে নিষেধ করিও!"

ছোট হরিদাস সুন্দর কীর্ত্তন করিতে পারিতেন, সেজন্য তিনি প্রভুর বাসায় থাকিয়া মধুর কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রাণে আনন্দ বিধান করিতেন। কীর্ত্তনীয়া হরিদাস নারীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছলেন বলিয়া প্রভু তাঁহার মুখাবলোকন করিবেন না বলিয়া স্থির করিলেন। হরিদাস যখন শুনিলেন, মাধবী দাসীর নিকট হইতে তিনি চাউল আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রভু আর তাঁহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয়-মন যেন দমিয়া যাইতে লাগিল। প্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হওয়ার ন্যায় তাঁহার শিষ্যদিগের এসংসারে নিদারুণ কষ্ট আর কিছুই ছিল না। ছোট হরিদাস এ কঠোর দণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া অনাহারে কয়েক দিবস কাটাইয়া দিলেন। প্রভুর অন্যান্য ভক্ত-দিগের মধ্যে হরিদাসের প্রতি দণ্ডের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল। অনেকেই হরিদাসের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার সংকল্প অনুসারেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত রহিলেন; পরন্তু বলিলেন, "আমাকে এরূপ অনুরোধ করিলে, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাইব। বৈরাগী হইয়া যেব্যক্তি প্রকৃতি-সঙ্গ করিতে চায়, আমি তাহার মুখ দেখিতে চাই না।"

হরিদাসের জন্য কেহ অনুরোধ করিলে, প্রভু এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া আর কেহ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহসী হইলেন না। ধরাধামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গ

হইতে বঞ্চিত হইয়া ছোট হরিদাস মৃতের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন মনের দুঃখে ও ক্লেশে হরিদাস গৌর বিহনে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই স্থির সংকল্প করিয়া প্রয়াগে গমন করিলেন; এবং ইহলোকের সকল সম্বন্ধ ঘুচাইয়া ত্রিবেণীর খরতর স্রোতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

এ মরজগতে মানবের দেহান্ত হইলে যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মার ও মনের সদ্‌গুণরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে। ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অকৃত্রিম স্নেহ প্রভৃতি সদ্‌গুণ চিরতরে ধ্বংস হইতে পারে না। ছোট হরিদাসের দুই দিনের শরীর ধ্বংস হইল বটে, কিন্তু এ জগতে কীর্ত্তন করিয়া যে ধর্ম্মাত্মার হৃদয়ে তিনি সুধা বর্ষণ করিতেন এবং নিজেও সে সুখে ও আনন্দে ভাসিয়া যাই-তেন, তিনি কি মরণান্তে সে সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইবেন? কথিত আছে, হরিদাস ত্রিবেণীর জলে জড়দেহ বিসর্জ্জন দিয়া দিব্যদেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার ইহলোকের পরমগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া নিশীথ সময়ে মধুর স্বরে বিভুগুণ-গানে তাঁহার চিত্ত হরণ করিতেন।

এমন সময় একদিন প্রভু তাঁহার পরিত্যাজ্য ছোট হরিদাসকে দেখিবার জন্য বাসনা প্রকাশ করেন, এবং সেজন্য তাঁহাকে তাঁহার নিকটে আনিবার জন্য ভক্তদিগের প্রতি আদেশ করেন।

তাঁহারা বলিলেন, "এক বৎসর পূর্ণ হইল, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা কিছুই জানি না।" প্রভু নীরব রহিলেন। একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি সমুদ্রে স্নান করিতে গমন করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহারা সুমধুর হরিগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন। কণ্ঠস্বরে তাঁহারা কীর্ত্তনীয়া হরিদাসেরই কণ্ঠধ্বনি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তাঁহারা চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, তথায় হরিদাস বা

অন্য কোন মানব নাই। হরিদাস অশরীরী হইয়া বিভুনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া, এক ব্যক্তি বলিলেন, "হরিদাস হয় ত বিষাদে আত্মঘাতী হইয়া, ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া এইরূপে অবস্থিতি করিতেছে!" স্বরূপ দামোদর তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "হরিদাস আজীবন কৃষ্ণনামকীর্ত্তনে ও প্রভুর সেবাতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তিনি কি আর নিকৃষ্টজন্ম লাভ করিতে পারেন? এ সকলের পশ্চাতে প্রভুর লীলা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়াই বোধ হইতেছে।" ইতোমধ্যে প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব পুরুষোত্তমে আগমন করিয়া ছোট হরিদাসের ত্রিবেণীতে দেহত্যাগের বার্ত্তা প্রদান করিল। হরিদাসের এইরূপ দেহত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন। চৈতন্য প্রভু যখন শ্রীবাসাদির নিকট হইতে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি "স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্" এই বাক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রভুর প্রতি দামোদরের উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যদিও সন্ন্যাসী কিন্তু তিনি প্রেমের অবতার। বালক যুবা বৃদ্ধ সকলেরই প্রতি তাঁহার প্রেম ধাবিত হইত। পুরুষোত্তমে একটি সুন্দর পিতৃহীন ব্রাহ্মণকুমার সতত তাঁহার নিকট আসিত। বালকেরা যেখানে ভালবাসা লাভ করে, সেইখানেই তাহাদের মন ধাবিত হয়। পিতৃহীন সরল সুন্দর ব্রাহ্মণ কুমারটিকে প্রভু অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিন্তু স্বরূপ দামোদরের তাহা সহ্য হইত না। ব্রাহ্মণতনয়টির জননী ছিল; সে অল্পবয়স্কা পতিহীনা সুন্দরী যুবতী। স্বরূপ ভাবিলেন, এই ব্রাহ্মণ বালকের প্রতি প্রভুর স্নেহ দর্শনে লোকে অন্যরূপ ভাবিতে পারে। এই জন্য তিনি একদিন প্রভুকে বলিলেন, "তুমি অন্যকে উপদেশ দিতে পার; কিন্তু তুমি কেমন গোঁসাই এবার সব লোকে তাহা ভাল বুঝিবে। লোকের মুখ ত চাপা দিতে পারিবে না।" প্রভু বলিলেন, "দামোদর! তুমি

কি বলিতেছ ?" দামোদর বলিলেন, "তুমি ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে অত্যন্ত ভালবাস ; উহার মা বিধবা, সুন্দরী যুবতী , আর তুমিও পরম সুন্দর যুবা পুরুষ। বালকের মা তপস্বিনী হইলেও, লোকে ইহা লইয়া কাণা-কাণি করিতে পারে।" এই সকল কথা বলিয়া দামোদর মৌনাবলম্বন করিলেন। চৈতন্যদেব বুঝিলেন যে, যাহাতে লোকের মিথ্যা ধারণায়, তাঁহার জীবনের মহান্ কার্য্যের কোন ব্যাঘাত না হয়, সে জন্য দামোদর তাঁহার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীর ন্যায়ই তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন। প্রভু দামোদরের বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া, তিনি যে তাঁহার হিতৈষী তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে প্রভু স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি নবদ্বীপে থাকিয়া আমার জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ কর। তোমার ন্যায় ব্যক্তিই এই কার্য্যের উপযুক্ত।" স্বরূপ দামোদর প্রভুর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া নবদ্বীপে গমন করতঃ শচীমাতার ভবনে তাঁহাদিগের অভিভাবকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সনাতনের নীলাদ্রিতে আগমন

রূপ গোস্বামী কিছুকাল নীলাদ্রিতে প্রভুর সহবাসে থাকিয়া, গৌড়-দেশে গমন করিলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর সনাতন গোস্বামী মথুরাধাম হইতে পুরুষোত্তমে আগমন করিলেন। তিনি এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিবার সময়, একাকী ঝারিখণ্ডের পথ দিয়া আসিয়াছিলেন। এই ঘননিবিষ্ট বৃক্ষ-লতাদিপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলের ভিতর দিয়া আসিবার সময় কখন যৎকিঞ্চিৎ আহারে কখন বা অনশনে তাঁহাকে দিন যাপন করিতে হইয়াছিল। পথের অন্যবিধ ক্লেশের ত কথাই নাই। এই অস্বাস্থ্যকর ঝারিখণ্ডের পথে

চলিতে চলিতে তিনি কণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার গাত্র হইতে রক্ত ও রস বহির্গত হইতে লাগিল। শরীরের এই অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি ভাবিলেন, এরূপ কণ্ডুরোগাক্রান্ত হইয়া জগন্নাথ দর্শন ও প্রভুর নিকটে বাস করা সম্ভবপর নহে। অতএব এ জীবন না রাখাই শ্রেয়স্কর। সনাতন স্থির করিলেন, রথযাত্রার দিন জগন্নাথদেব ও প্রভুকে দর্শন করিতে করিতে রথচক্রের নিম্নে এ দেহপাত করিয়া ভবধাম পরিত্যাগ করিবেন। এই সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তিনি পুরুষোত্তমে আগমন পূর্ব্বক ভক্ত হরিদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভক্ত হরিদাস তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ সনাতন হরিদাসের বাসায় প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার অনুগত ভক্ত হরিদাসের বাসায় অনেক সময় আগমন করিতেন। ইতোমধ্যে প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সনাতন ও হরিদাস ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। প্রভু সনাতনকে দেখিয়া, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইলে, সনাতন পশ্চাৎপদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমাকে ছুঁইবেন না ; আমার সমস্ত অঙ্গ কণ্ডুরসে পূর্ণ।" প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুত ধাবিত হইয়া সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। গৌরের গৌর অঙ্গ কণ্ডুরসে পূর্ণ হইয়া গেল। সনাতন প্রভুর প্রেম দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গনানন্তর তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া, রূপের পুরুষোত্তমে আগমন ও তাঁহার দশমাসকাল অবস্থিতি ও বল্লভের ইহলোক হইতে অবসৃত হইবার কথা জ্ঞাপন করিলেন। সনাতন কনিষ্ঠ ভ্রাতার গঙ্গালাভের কথা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দিন কয়েকের মধ্যে প্রভু হরিদাসের বাসায় আসিয়া সনাতনকে অকস্মাৎ বলিলেন, "সনাতন! দেহত্যাগ করিলেই কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, দেহত্যাগ করিলেই যদি কৃষ্ণকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমি কোটিবার

দেহত্যাগ করিতাম। ভক্তিবিহনে তাঁহাকে কিছুতেই লাভ করা যায় না। সনাতন! তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, এখন তোমার দেহের উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার; তুমি স্বইচ্ছায় তোমার দেহ বিনাশ করিতে পার না। তোমার দ্বারা আমি অনেক কার্য্য করাইব স্থির করিয়াছি। তুমি লোককে ভক্তিতত্ত্ব, কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব, ও বৈরাগ্যশিক্ষা দান করিবে; লুপ্ত বৃন্দাবন তীর্থ উদ্ধার করিবে। আমি নীলাচলে বাস করি। তোমার দেহে যে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে; তুমি এ দেহ বিনাশ করিতে চাও?" সনাতন প্রভুর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তোমার হৃদয়ের মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে? তুমি আমাকে যেমন নাচাও আমি তেমনিই নাচিয়া থাকি।" প্রভু তৎপর হরিদাসকে বলিলেন, "দেখ হরিদাস! সনাতন পরের দ্রব্য বিনষ্ট করিতে চায়। তুমি ইহাকে এমন কার্য্য করিতে নিষেধ করিও।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভো! তোমার হৃদয়ের মহৎ ভাব কে বুঝিতে পারে, কাহার জীবনের কি কার্য্য তুমি না জানাইলে সে কিরূপে জানিতে পারিবে?" প্রভু তৎপর উভয়কে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া ভোজনার্থ গমন করিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা নামক স্থানে গমন করেন। তথায় যাইয়া তিনি সনাতনকে ডাকিয়া পাঠান। সনাতন প্রভুর আহ্বানে পরম পুলকিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। যমেশ্বর টোটা যাইবার দুইটি পথ। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সম্মুখে সিংহদ্বার দিয়া; অপরটি সমুদ্রের তট দিয়া। সিংহদ্বার দিয়া যে পথ, সেটি বৃক্ষচ্ছায়ায় সুশীতল; সমুদ্রের উপকূল দিয়া যে পথ, সেটি রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া থাকে। সনাতন এই নিদাঘকালে মধ্যাহ্ন সময়ে সাগরতটে উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া যমেশ্বর টোটায় গমন করিলেন। জ্বলন্ত অনলসম বালুকার উত্তাপে সনাতন গোঁসাইয়ের পায়ে ফোস্‌কা পড়িয়া গেল। সনাতন যমেশ্বর টোটায় গমন করিলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি

কোন্ পথ দিয়া এখানে আসিলে ?" সনাতন বলিলেন, "সমুদ্রের উপকূল দিয়া।" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিংহদ্বারের পথ দিয়া কেন আসিলে না ?" সনাতন বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি নীচ জাতি, অতি অধম ; যে পথে ভক্তেরা গমন করেন, আমি সে পথ দিয়া কিরূপে চলিব ?" প্রভু সনাতনের এই বিনয় দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু পরে বলিলেন, "সনাতন ! মর্য্যাদা রক্ষা নিতান্ত আবশ্যক ; বৈষ্ণবের পক্ষেও উহা রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে লোকে উপহাস করে।" এই বলিয়া তিনি দুই বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহার কণ্ডুপূর্ণ দেহ বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

কিছুদিন পরে রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড় হইতে ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন। গৌর সনাতনের সঙ্গে অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের পরিচয় করিয়া দিলেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গৌরভক্তেরা পরমানন্দে নৃত্য কীর্ত্তন ও প্রীতিভোজনে যাপন করিলেন। রথোৎসব সমাপনান্তে গৌড়ীয় ভক্তগণ স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, প্রভু সনাতনকে বলিলেন, "এখানে কয়েক মাস অবস্থিতি কর, তৎপর আমি তোমায় বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিব।" সনাতন প্রভুর সঙ্গে এক বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া, নামকীর্ত্তন ও ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনগমনের সময় প্রভু যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিলেন, তিনি সেই পথ দিয়াই বৃন্দাবন যাইতে প্রস্তুত হইলে, বলভদ্র তাঁহাকে সেই সকল পথের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিয়া দিলেন। সনাতন নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সনাতন বৃন্দাবনে গমন করিলে, কিছুদিবস পরে রূপ ও বল্লভের পুত্র জীব গোস্বামী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা তিনজনে মিলিত হইয়া ভক্তিবিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রঘুনাথ দাস সম্মিলন

যে সকল সাধুপুরুষ বৈষ্ণব ইতিবৃত্তকে আপনাদিগের ভক্তি, নিষ্ঠা, বৈরাগ্য প্রভৃতি মহৎ গুণের দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, রঘুনাথ দাস তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ধন-জন-গৌরবে গৌরবান্বিত সপ্তগ্রামে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামে পরম ঐশ্বর্য্যশালী দুই সহোদর বাস করিতেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সৈয়দ-হুসেন শার অধীনে সপ্তগ্রামের করসংগ্রহের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে বার্ষিক বিশ লক্ষ মুদ্রা কর আদায় হইত; এই বিশ লক্ষ সংগৃহীত মুদ্রা হইতে নবাব সরকারে বার লক্ষ মুদ্রা প্রদত্ত হইত, অবশিষ্ট আট লক্ষ ইঁহারা প্রাপ্ত হইতেন। এই মুদ্রা এখনকার প্রায় আশী লক্ষ মুদ্রার সমতুল্য বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

হিরণ্যদাসের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। গোবর্দ্ধন দাসের কেবল একমাত্র রঘুনাথ নামে একটি পুত্র ছিল। রঘুনাথ এই ধনসম্পন্ন গৃহে কিরূপ যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গোবর্দ্ধন দাস সন্তানকে বাল্যকালে রীতিমত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। এই অতুল ঐশ্বর্য্য-মধ্যে রঘুনাথ বাল্যজীবনেই সংসারের প্রতি অনাসক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্তানের ঈদৃশ ভাব দর্শনে মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলেই চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। যখন কোন মহাপুরুষ মানবাত্মাতে ধর্ম্মের নবশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য অভ্যুদিত হন, তখন তাঁহার প্রভাব চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে; শ্রীচৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া

শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে আগমন করেন, তখন তাঁহার দর্শনার্থ বহুলোক সমবেত হইয়াছিল; রঘুনাথ দাসও সে সময় তাঁহার দর্শনের জন্য অদ্বৈত-ভবনে গমন করিয়াছিলেন। যাইবার সময় গোবর্দ্ধন দাস সন্তানের সঙ্গে কয়েকজন ভৃত্য ও বিবিধ দ্রব্যসম্ভার দিয়া তাঁহাকে সুসজ্জিত দোলা-রোহণে প্রেরণ করিলেন। রঘুনাথ অদ্বৈত-ভবনে গমন করিয়া, কয়েকদিন তথায় অবস্থানানন্তর শ্রীচৈতন্যের মধুর ভক্তিভাব দর্শন ও তাঁহার উপদেশ লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বৈরাগ্যের যে অনলশিখা তাঁহার হৃদয়ে প্রধূমিত হইতেছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যের সহবাসে আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাঁহার হৃদয় সততই বিষয়ের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এ সময় শ্রীচৈতন্য পুরুষোত্তমে বাস করিতেন। রঘুনাথ তাঁহার সহবাসে থাকিবার জন্য সময়ে সময়ে গৃহত্যাগ করিয়া গোপনে পলায়নের চেষ্টা করিতেন। গোবর্দ্ধন দাস তাঁহাকে গৃহে রক্ষা করিবার জন্য, প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাহারা সততই তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিত। রঘুনাথ দুই তিনবার পুরুষোত্তমে যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না।

মাতা পিতা বেশ বুঝিলেন, ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি রঘুনাথের কিছুমাত্র আসক্তি নাই। ইতঃপূর্ব্বেই গোবর্দ্ধন দাস পুত্রকে সংসারানুরাগী করিবার জন্য এক সুন্দরী নারীর সহিত তাঁহাকে পরিণীত করিয়াছিলেন। যখন রঘুনাথ উত্তরোত্তর বৈরাগ্য-প্রণোদিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন রঘুনাথের জননী একদিন স্বামীকে বলিলেন, "ছেলে পাগল হয়েছে, এখন উহাকে বাঁধিয়া রাখা উচিত।" গোবর্দ্ধন পত্নীর বাক্য শ্রবণে বলিলেন, "এই সম্পত্তি ও পরমাসুন্দরী নারী যাহাকে বাঁধিতে পারিল না, সামান্য রজ্জুর বন্ধনে তাহাকে কি বাঁধিতে পারা যায়?"

গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাসের দিন এইরূপেই কাটিতে লাগিল। যাঁহার প্রাণবিহঙ্গ মুক্তভাবে ভক্তসঙ্গে হরিগুণ কীর্ত্তনে দিনযামিনী যাপন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে—সংসারের পিঞ্জর কি আর তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? রঘুনাথ এখন বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়াও বৈরাগী; বলবান রক্ষকদিগের দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও তিনি মুক্ত।

শ্রীচৈতন্য যখন এক বৎসর পরে পুনরায় শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে আগমন করেন, তখন রঘুনাথ পিতাকে চৈতন্য-দর্শনেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, তিনি যদি তাঁহার এ ইচ্ছা সাধনের প্রতিবন্ধকতা করেন, তাহা হইলে তিনি এ দেহ পরিত্যাগ করিবেন। গোবর্দ্ধন দাস সন্তানের এই প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কিছু না বলিয়া, তাঁহাকে লোকজন ও বিবিধ দ্রব্য সঙ্গে দিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। গৌর রঘুনাথকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি রঘুনাথের ব্যাকুলতা দর্শনে তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা সকলই অবগত হইয়া বলিলেন, "এখন অনাসক্ত ভাবে সংসারে বাস কর। অন্তরে বৈরাগ্য রক্ষা করিয়া বিষয় সম্ভোগ কর; ক্ষিপ্তের ন্যায় কার্য্য করিও না, মর্কট বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিবে। ভগবান তোমার বিষয়-বন্ধন মোচন করিবেন। আমি যখন বৃন্দাবন দর্শন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিব তখন তুমি তথায় গমন করিও।"

রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কয়েক দিন বাস করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন; কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সংসার পরিত্যাগের জন্য কোন বাহ্য উদ্যোগ প্রকাশ করিতেন না। প্রভু তাঁহাকে অনাসক্ত ভাবে সংসারে বাস করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অন্তরে বৈরাগ্য ধারণ করতঃ, বিষয় বিভবের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের পরিবারস্থ সকলে রঘুনাথের এইরূপ ভাব দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ের বৈরাগ্যানল ক্রমে প্রশমিত হইতেছে।

এ সময় নিত্যানন্দ পানীহাটি গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেন। একদিন রঘুনাথ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে, নিত্যানন্দ তাঁহাকে চিঁড়া মহোৎসবের আয়োজন করিতে বলেন। বহুসংখ্যক লোক এই মহোৎসবে যোগ দিয়া, পরিতোষ পূর্ব্বক দুগ্ধ, চিঁড়া, দধি, ক্ষীর, মিষ্টান্ন আহার করে। এই উপলক্ষে তিনি অর্থদানও করিয়াছিলেন; নিত্যানন্দের জন্য একশত মুদ্রা ও সাত তোলা স্বর্ণদান করেন। নিত্যানন্দ রঘুনাথের ব্যাকুলতা দর্শনে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই তাঁহার বিষয়-বন্ধন মোচন হইবে।

রঘুনাথের অন্তরের মধ্যে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা কি নির্ব্বাপিত হয়? উহা মানব-চক্ষুর অগোচরে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ওদিকে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন দর্শনান্তে পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রঘুনাথের নিকট এ সংবাদ অবিদিত রহিল না; তাঁহার প্রাণ এখন চৈতন্য প্রভুর দর্শন লালসায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একদিন যখন সকলে নিশীথে নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে সুখে বিশ্রাম করিতেছে, তখন রঘুনাথ শয্যা পরিত্যাগ করতঃ গৃহত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। সাধারণ পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিলে, পাছে, তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তজ্জন্য তিনি জঙ্গলাকীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রভাতকালে রঘুনাথের দর্শন না পাইয়া পরিবারের মধ্যে ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলেই বুঝিলেন, রঘুনাথ পলায়ন করিয়াছে।

সে সময় গৌড়ীয় ভক্তদিগের নীলাচলে গমনের সময়। সেজন্য গোবর্দ্ধন দাস যাত্রীদিগের পরিচালক শিবানন্দ সেনের নামে একখানি পত্র দিয়া কয়েকজন লোক তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। গোবর্দ্ধন

দাসের লোকেরা বহুদূর গিয়া নীলাচলগামী গৌড়ীয় ভক্তদিগের সাক্ষাৎ পায়। শিবানন্দ সেনের হস্তে গোবর্দ্ধন দাসের পত্র প্রদত্ত হইল। শিবানন্দ তদুত্তরে জানাইলেন, রঘুনাথ তাঁহাদের সঙ্গে আগমন করেন নাই। প্রেরিত লোকেরা শিবানন্দ সেনের পত্র লইয়া সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমন করিলে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের পরিবারের মধ্যে বিষাদের ছায়া নিপতিত হইল। মাতা পিতা ও পিতৃব্যের প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল; আত্মীয়স্বজনেরা দুঃখে আকুল হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথের অল্পবয়স্কা পত্নীর হৃদয়ে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে?

এ দিকে রঘুনাথ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। কি খাইব, সে চিন্তা তাঁহার নাই। কখন আহার মিলিত কখন বা অনাহারেই দিন ক্ষেপণ করিতেন। এইরূপে তিনি দ্বাদশ দিনে নীলাচলে উপনীত হইলেন। এই দ্বাদশ দিবসের মধ্যে তিনি তিন দিন মাত্র আহার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণসহ উপবিষ্ট হইয়া কথাবার্ত্তায় রত রহিয়াছেন, এমন সময় রঘুনাথ দাস তথায় উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ রঘুনাথকে দর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে ও প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া বলিলেন, 'পরমেশ্বর তোমাকে বিষয়-কূপ হইতে মুক্তিদান করিলেন, তাঁহার কি অপার করুণা!'

রঘুনাথ অনাহারে ও পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে অত্যন্ত শান্ত দেখিয়া, স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন, "রঘুনাথ পথে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে; আমি তোমার হস্তে ইহাকে অর্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে ভালরূপ আহারাদি করাইয়া ইহার শরীরকে সুস্থ করিতে চেষ্টা করিবে।" দামোদর প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনাথকে লইয়া বিশেষ যত্ন করিয়া, তাঁহার শরীর সুস্থ করিতে যত্নবান হইলেন। এবং বিবিধ খাদ্য দ্রব্য আনয়ন করিলেন। কিন্তু পাঁচ দিবস পরে এরূপ ভোজন

আর তাঁহার ভাল লাগিল না ; তিনি মনে করিলেন, ইহাতে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইবে। তিনি সেজন্য জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে যাইয়া অন্যান্য লোকের ন্যায় ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। লোকে যখন শুনিল, অতি ধনাঢ্যগৃহের সন্তান রঘুনাথ এইরূপে সাধারণ লোকের ন্যায় ভিক্ষা করিতেছেন, তখন সকলে তাঁহাকে অধিক পরিমাণে ও বিশিষ্টরূপে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। রঘুনাথ সে জন্য সিংহদ্বারে ভিক্ষাগ্রহণ বন্ধ করিয়া দিলেন।

পুরুষোত্তমে যে সকল প্রসাদ বিক্রীত না হইত তাহা বিক্রেতারা ফেলিয়া দিত। রঘুনাথ গভীর রজনীতে সেই সকল পরিত্যক্ত পচা অন্ন হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতগুলি অন্ন গ্রহণ করিতেন এবং সেগুলি ধৌত করতঃ একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহাই ভক্ষণ করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথের এইরূপ ভোজনের কথা শ্রবণ করিয়া, একদিন রঘুনাথের ভোজ্য হইতে এক গ্রাস অন্ন ভক্ষণ করিয়া বড় প্রীতি লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন, "রঘুনাথ অতি সুখাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে।"

একদিন রঘুনাথ প্রভুর নিকট উপদেশপ্রার্থী হইলে, তিনি বলিলেন, "গ্রাম্য কথা শুনিবে না, ও বলিবে না ; সুখাদ্য আহার করিবে না, ও ভাল বসনও পরিধান করিবে না এবং সর্ব্বদা রাধাকৃষ্ণের উপাসনাতেই রত থাকিবে। সংক্ষেপে তোমাকে এই কয়েকটি কথা বলিলাম।" এই সকল কথা বলিয়া তিনি এই শ্লোকটি বলিলেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরি ॥

তৃণ হইতেও নীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইবে, এবং নিজে অমানী হইয়া অপরকে সম্মান দান করিবে।

কিছুদিন পরেই গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন। প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত রঘুনাথের পরিচয় করিয়া

দিলেন। শিবানন্দ সেন রঘুনাথ দাসকে বলিলেন যে, "তোমার পিতা তোমার অনুসন্ধানের জন্য দশজন লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং আমার নামে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু তোমার কোন অনুসন্ধান না পাইয়া, তাহারা নিরাশ মনে ফিরিয়া গিয়াছে। আমিও তোমার বিষয় কিছু অবগত নই বলিয়া তোমার পিতার পত্রের উত্তর দিয়াছি।"

রথোৎসব আরম্ভ হইল। রঘুনাথ দাস ভক্তদিগের নৃত্য কীর্ত্তনাদি দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। ভক্তগণ চারিমাস কাল নীলাচলে থাকিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। গোবর্দ্ধন দাসের নিকট রঘুনাথের নীলাচলে পৌঁছিবার কথা উপস্থিত হইল। তিনি সন্তানের জন্য চারিশত মুদ্রা প্রেরণ করেন। রঘুনাথ এই অর্থের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য মাসে দুইদিন করিয়া, শ্রীচৈতন্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এই নিমন্ত্রণে অষ্টপণ কড়ি ব্যয় হইত। কিছুদিন পরে রঘুনাথের মনে হইল, বিষয়ীর অর্থে প্রভুকে এরূপ ভাবে নিমন্ত্রণ খাওয়ান কর্ত্তব্য নয়; সেজন্য তিনি নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন। একদিন প্রভু স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রঘুনাথ কেন আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিল?' স্বরূপ বলিলেন, 'রঘুনাথ বলেন, আমি বিষয়ীর দ্রব্য লইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করি, ও নিমন্ত্রণে প্রভুর মন পরিতৃপ্ত হয় না; কেবল আমার অনুরোধে তিনি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এজন্য আমি নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছি।' শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ ঠিকই করিয়াছে; বিষয়ীর অন্নগ্রহণে মন মলিন হয়, এবং মন মলিন হইলে, কৃষ্ণভজনের ব্যাঘাত জন্মে।"

এই পরম ভক্ত ও বৈরাগী পুরুষ পুরুষোত্তমে বাস করিয়া অনুদিন নাম কীর্ত্তন ও সাধন ভজনেই রত থাকিতেন। আহার নিদ্রায় প্রায় তাঁহার চারিদণ্ড সময় অতিবাহিত হইত। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরও তিনি কিছুদিন পুরুষোত্তমে বাস করেন, তৎপরে প্রভুর শোকে এত

অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়া, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে নিম্নে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিবেন, এই স্থির করিয়াছিলেন। রঘুনাথ বৃন্দাবন গমন করিলে রূপ ও সনাতন তাঁহার এই সঙ্কল্প অবগত হইয়া, তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। রঘুনাথ অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনে বাস করিয়া পুস্তকাদি প্রণয়ন ও নাম ধ্যান ও নাম কীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতলেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ দাসের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ইনি তাঁহারই নিকট হইতে প্রভুর জীবনের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বল্লভভট্টের আগমন ও গর্ব্বচূর্ণ

বর্ষান্তরে যখন বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্যপ্রভুর ভক্তেরা পুরুষোত্তমে আগমন করেন, সে সময় প্রভুর পূর্ব্বপরিচিত বল্লভভট্টও একবার পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন। ভট্ট আগমন করিয়া প্রভুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। প্রভুও তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। ভট্ট নানারূপে প্রভুর স্তুতিবাদ করিলে, শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী; কৃষ্ণভক্তি কিরূপ তাহা কিছুই জানি না।"

ভট্টের মনে ধারণা ছিল যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ যেমন বুঝিতে সমর্থ, অপরে সেরূপ বুঝিতে সমর্থ হয় না। তিনি সেজন্য একদিন চৈতন্য

প্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আমি ভাগবতের একখানি টীকা রচনা করিয়াছি ; আপনি যদি দয়া করিয়া শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমি বড় সুখী হই।' শ্রীচৈতন্য পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতেন যে, ভট্টের ভাগবত সম্বন্ধে বিশেষ অধিকার আছে বলিয়া, তাঁহার চিত্ত গর্ব্বিত ; সেজন্য তিনি ভট্টের কথার উত্তরে বলিলেন, 'আমি ভাগবত ভাল বুঝি না, এবং উহা শ্রবণেরও আমার বিশেষ অধিকার নাই।' ভট্ট অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। পণ্ডিতদিগের নিকট ভাগবতের টীকা শুনাইয়া, প্রশংসা লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি প্রভুর অন্যান্য শিষ্যদিগের নিকট যাইয়া ব্যাখ্যা শুনাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু কেহই তাঁহার রচিত ভাগবতের টীকা শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। প্রভুর উপেক্ষাতেই সকলে তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদিন ভট্ট গৌরাঙ্গ সভায় আগমন করিয়া বলিলেন, 'পতিব্রতা নারী কখন মুখে পতির নাম উচ্চারণ করে না ; তোমরা কৃষ্ণকে পতি বলিয়া স্বীকার কর ; তবে তোমরা কিরূপে তাঁহার নাম রসনায় গ্রহণ কর ?' প্রভু ভট্টের কথার উত্তরে বলিলেন, "স্বামীর আজ্ঞা পালনই পতিব্রতার ধর্ম্ম। পতির ইচ্ছা, সর্ব্বদা আমরা তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া জীবন কৃতার্থ করি। এজন্য তাঁহার আজ্ঞা আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি না।"

আর এক দিবস ভট্ট গৌরাঙ্গ সভায় আসিয়া বলিলেন, "শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের টীকা আমি উপযুক্ত বিবেচনা করি না ; আমি উহার ভালরূপ একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছি।" শ্রীচৈতন্য ভট্টের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'যে স্বামীকে মানে না, সে কুলটা নারী।' ভট্ট প্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধোদ্দীপ্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি গৌরাঙ্গ সভায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিবেন। কিন্তু আশায় নিরাশ হইয়া, তাঁহার গর্ব্বচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্বে আম্বুলি গ্রামে তিনি

প্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, এখন যে সে কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সে কেবল নিজেরই দোষে। এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

"অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥"

প্রভু বলিলেন, "তুমি পণ্ডিত, শ্রীধর স্বামীর টীকার উপর দোষারোপ করিয়া গর্ব্ব করা ভাল নয়। শ্রীধরস্বামী জগদ্গুরু; তাঁহারই প্রসাদে ভাগবতের তাৎপর্য্য লোকে বুঝিতে সক্ষম হয়। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া টীকা রচনা করিলে, সে টীকা লোকে গ্রহণ করিবে না। তাঁহারই অনুগত হইয়া টীকা রচনা কর এবং কৃষ্ণানুগত প্রাণ হইয়া জীবন অতিবাহিত কর। জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, নাম সংকীর্ত্তন কর, অচিরে ভগবৎকৃপা লাভে জীবন সফল হইবে।"

বল্লভভট্ট প্রভুর বাক্যে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়া, তাঁহাকে ও তদীয় শিষ্যবৃন্দকে আপন ভবনে নিমন্ত্রণ করেন। গৌর শিষ্যবৃন্দসহ ভট্টের বাটীতে গমন করিলেন। তিনি পরিতোষপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন। ভট্ট, পুরুষোত্তমে বাস করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রমুখ ভক্তদলের নৃত্য কীর্ত্তনাদি দর্শনে বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন; তাঁহার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি প্রভুর আজ্ঞায় গদাধর পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভোজন সঙ্কোচ

মাধবেন্দ্রপুরীর রামচন্দ্র নামে এক শিষ্য ছিল। রামচন্দ্র এমন ভক্ত গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াও আপনার জীবনকে মিষ্ট ও মধুর করিতে

সমর্থ হন নাই। ব্যাকুলাত্মা মাধবেন্দ্র একদিন কৃষ্ণবিরহে অস্থির হইয়া 'কবে মথুরা গমন করিয়া, সেরূপ দর্শন করিব,' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন; এমন সময় রামচন্দ্র বলিলেন, 'ব্রহ্মবিৎ হইয়া কি এমন করিয়া ক্রন্দন করিতে হয়?' মাধবেন্দ্র শিষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'আমি মনের কষ্টে অস্থির, এ সময় আমাকে উপদেশ দানের আবশ্যক নাই, তুই এখান হইতে দূর হইয়া যা, আমি আর তোর মুখ দেখিতে চাই না।' কর্কশস্বভাব রামচন্দ্র তথা হইতে বহির্গত হইয়া অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথারীতি ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। রামচন্দ্র যে কেবল কর্কশভাষী তাহা নহে, সকল সাধুদের নিন্দা করিয়া বেড়ান তাঁহার এক কার্য্য ছিল। তিনি সততই সাধু পুরুষদিগের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া তাঁহাদিগের দোষ কীর্ত্তনে আনন্দ লাভ করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার এই ঘৃণিত প্রকৃতির বিষয় অবগত ছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রতি মিষ্ট ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। রামচন্দ্র পুরীতে আগমন করিলে, জগদানন্দ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া, চর্ব্ব, চোষ্য লেহ্য পেয় দিয়া ভোজন করাইলেন। রামচন্দ্র পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া জগদানন্দকে আহার করিতে বলিলেন, এবং তাঁহার ভোজনের সময় এটি খাও, উটি খাও, বলিয়া তাঁহাকে ভালরূপে আহার করাইলেন। ভোজনান্তে জগদানন্দ আচমন করিলে, বিশ্বনিন্দুক রামচন্দ্র বলিলেন, 'শুনিয়াছিলাম, চৈতন্যেরা অত্যন্ত আহার করে, আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, সন্ন্যাসীর পক্ষে এত ভোজন কি ভাল?' চৈতন্য সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত ভোজনাপরাধে রামচন্দ্রের দোষী করিবার প্রয়াসের কথা প্রভুর কর্ণগোচর হইল। তিনি এই সাধু নিন্দুকের স্বভাবের বিষয় সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া, এ বিষয়ে কোন কথাই বলিলেন না।

এইরূপে রামচন্দ্র পুরীতে বাস করিয়া পরনিন্দায় ও পরচর্চ্চায়

সময় কাটাইতে লাগিলেন। একদিন শ্রীচৈতন্যদেবের বাসায় আগমন করিয়া কতকগুলি পিপীলিকা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাত্রাবত্র ঐক্ষবরসমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসী নামিন্দ্রিয়লালসৈতি ব্রুবন্নুত্থায়গতঃ।" ভাবার্থ,—'রাত্রিতে মিষ্ট দ্রব্য আসিয়াছিল, সেই জন্যই পিপীলিকা সকল এখানে বিচরণ করিতেছে। হায়! সন্ন্যাসীদিগের রসনার এত লালসা!' প্রভু রামচন্দ্র পুরীর এই উক্তি শ্রবণ করিলেন।

চৈতন্যপ্রভুর নিত্য ভোজনের জন্য চারিপণ কড়িতে জগন্নাথদেবের প্রসাদ ক্রয় করা হইত। তাহা হইতে গোবিন্দ ও কাশীশ্বর প্রসাদ পাইতেন। রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ হইতে আমার জন্য পিণ্ডা ভোগের এক চতুর্থাংশ অন্ন ও পাঁচগণ্ডা কড়ির ব্যঞ্জন ক্রয় করিবে। ইহার অধিক আমাকে আর কিছু দিবে না। আনিলে, আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না।" প্রভুর এই ভোজন-সঙ্কোচের কথা তাঁহার ভক্তদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে তাঁহাদের মস্তকে যেন বজ্র নিপতিত হইল। পাপিষ্ঠ রামচন্দ্রের বাক্যে প্রভুর ভোজন এত সঙ্কোচ হইলে, তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে, এই চিন্তায় তাঁহারা আকুল হইয়া পড়িলেন। প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচ করিলে, তাঁহার প্রসাদভোজী গোবিন্দ ও কাশীশ্বর অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। চৈতন্যদেবের অন্যান্য শিষ্যেরাও প্রভুর জন্য একপ্রকার অনাহারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সকলেই রামচন্দ্র পুরীর ঘৃণিত বাক্যের জন্য তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন চলিয়া গেলে, একদিন রামচন্দ্র প্রভুকে দেখিয়া বলিলেন, 'শুনিয়াছি তুমি না কি ভিক্ষা সঙ্কোচ করিয়াছ? সেই জন্যই তোমাকে এত শীর্ণ দেখিতেছি। শরীরকে নষ্ট করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়। অনাসক্ত ভাবে বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া, আহারাদি করা সন্ন্যাসীর

পক্ষে সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।' রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া, ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন, "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্ত স্বপ্নাবমোধস্য যোগাভবতি দুঃখহা।" ভাবার্থ,—যে ব্যক্তি নিয়মিত আহার বিহার ও কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, এবং যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিতরূপেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই যোগ সাধনের দ্বারা সুখ শান্তি লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন।

বিনয়ের ও সরলতার অবতার শ্রীচৈতন্যদেব রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'আমি অজ্ঞ বালকের ন্যায়, আমি তোমারই শিষ্য। কিরূপে কল্যাণ হয়, তাহা তুমিই আমাকে শিক্ষা দাও।' কয়েকদিন পরে রামচন্দ্র নীলাচল হইতে চলিয়া গেলে, শ্রীচৈতন্যের শিষ্যেরা পূর্ব্বের ন্যায় আহারাদি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুকে তাঁহারা অর্দ্ধাশন ভোজনের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার

ভবানন্দের পুত্র রায় রামানন্দের সহোদর গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ম্মচারী ছিলেন। উৎকলের মধ্যে মালজ্যাঠা দণ্ডপাঠের কর সংগ্রহের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। হিসাব নিকাশের সময় গোপীনাথের নিকট হইতে দুই লক্ষ কাহন কড়ি অনাদায় হওয়াতে রাজবিধানানুসারে নিম্নে খড়্গ রাখিয়া মাচার উপর হইতে তাঁহাকে ফেলিয়া দেওয়া স্থির হইল। ভবানন্দের পুত্রের এই বিপদের সময় কোন

কোন ব্যক্তি প্রভুর নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিতে বলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি সন্ন্যাসী; রাজার টাকা অপচয় করিলে, রাজা শাস্তি দিবেন, আমি এ বিষয়ে কি করিতে পারি?' এমন সময়ে একজন আসিয়া বলিল, গোপীনাথ ও বাণীনাথকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রভু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধন-দশায় বাণীনাথ কি করিতেছে? সংবাদদাতা বলিল, 'বাণীনাথ হরিনাম জপ করিতেছে।' অবিলম্বে আর এক ব্যক্তি প্রভুর নিকট আসিয়া বলিল, 'গোপীনাথের প্রাণবধের সবই ঠিক হইয়াছে; এখনই মাচার উপর হইতে তাঁহাকে নিম্নস্থিত খড়্গের উপর নিক্ষেপ করা হইবে।' প্রভু তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'আমি সন্ন্যাসী, আমি এ বিষয়ে কি করিব? যাঁহাকে ডাকিলে, মানুষ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করে, এখন তোমরা তাঁহাদিগের উদ্ধারের জন্য সেই বিপদভঞ্জন হরিকে স্মরণ কর।'

যখন গোপীনাথকে মাচার উপর হইতে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে, তখন রাজমন্ত্রী হরিচন্দন উৎকলাধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া গোপীনাথের প্রাণরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন; এবং বলিলেন, 'বাকী টাকা, তাঁহার ঘোটকাদি বিক্রয় করিয়া, রাজকোষে জমা দেওয়া যাইবে।' রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'গোপীনাথের টাকার জন্য, আমি তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা প্রদান করি নাই, টাকা আদায় করিতে বলিয়াছি; বড় জানা ঐরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া, টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছিলেন।' প্রতাপ রুদ্র গোপীনাথের মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করিয়া, রাজমন্ত্রীকে গোপী-নাথের নিকট হইতে বাকী টাকা আদায়ের ভার প্রদান করিলেন। গোপীনাথ মুক্তি লাভ করিলেন।

কয়েকদিন পরে কাশীমিশ্র প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি

বলিলেন, এখানে বিষয়ীদিগের কার্য্যে আমাকে বড় উত্যক্ত হইতে হয়, আমি এখান হইতে আলালনাথে গিয়া বাস করিব মনে করিয়াছি। কাশীমিশ্র বলিলেন, ভবানন্দের পরিবারবর্গকে তুমি অত্যন্ত স্নেহ কর, সেজন্য বিপদের সময় গোপীনাথের কর্ম্মচারীরা আসিয়া তোমাকে জানাইয়াছিল। তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিও না। আর তোমার নিকট বিষয়-সংঘটিত প্রস্তাব না আসে, সেজন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা পাইব।

কাশীমিশ্রের ভবনে রাজা প্রতাপরুদ্র নিত্য আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণবন্দনা করিতেন। রাজা মিশ্রভবনে উপস্থিত হইলে, মিশ্র বলিলেন, 'গোপীনাথকে চাঙ্গের উপর হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইবে স্থির হইলে, প্রভুর নিকট গোপীনাথের কর্ম্মচারীরা এ সংবাদ দান করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষার উপায় বিধান করিতে বলে; প্রভু কোনরূপ বিষয়-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না; সেজন্য এই সমাচার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি এ বিষয়ে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়া বলেন, 'গোপীনাথ অপরাধী হইয়া রাজদণ্ড ভোগ করিবে, আমি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না।' কাশীমিশ্র রাজাকে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, বিষয়-সংঘটিত ব্যাপার তাঁহার নিকট উপস্থিত না হয়, সেজন্য তিনি আলালনাথে গিয়া বাস করিতে চান।

উৎকলাধিপতি বলিলেন, গোপীনাথের জীবননাশের আজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। গোপীনাথ পুরুষোত্তম জানাকে অপমান করিয়াছিল বলিয়া তিনি বাকী টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাকে ঐরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন, ভবানন্দ ও তাঁহার পুত্রদিগকে আমি স্নেহের চক্ষেই দর্শন করি, রামানন্দকে রাজমাহেন্দ্রীর ও গোপীনাথকে মালজ্যাঠা দণ্ডপাঠের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলাম; কখন তাহাদের নিকট হইতে হিসাব দেখিতে চাই নাই। যাহা হউক, আমি গোপীনাথের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিব না। তুমি প্রভুর চরণ ধরিয়া

তাঁহাকে এখানে থাকিতে বলিবে। আমি তাঁহার জন্য দুই লক্ষ কাহন কড়ি কি তাঁহার জন্য আমি রাজ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি। কাশীনাথ মিশ্র রাজার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, প্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না; মনে করিবেন, তাঁহারই জন্য, গোপীনাথকে টাকা দিতে হইল না। রাজা কাশীনাথ মিশ্রকে বলিলেন, তুমি প্রভুকে বলিবে, 'ভবানন্দ পরিবারের প্রতি স্নেহবশতঃ আমি গোপীনাথের দেয় টাকা গ্রহণ করিব না।'

কাশীনাথ মিশ্র প্রভুর নিকট যাইয়া, গোপীনাথ সম্বন্ধে রাজার সকল কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাকে নীলাচলে থাকিবার জন্য উৎকলাধিপতির একান্ত অনুরোধ নিবেদন করিলেন।

ভক্ত, উদারচেতা, দয়ালু উৎকলাধিপতি, গোপীনাথকে ডাকিয়া, পুরুষোত্তম জানা প্রভৃতির সম্মুখে বলিলেন, "তোমার নিকট আমার যত কৌড়ী প্রাপ্য আছে, তাহা সমস্ত ছাড়িয়া দিলাম। মালজ্যাঠা দণ্ডপাঠের ভার পূর্ব্বের ন্যায় তোমারই উপর রহিল। আর তোমার বেতন যাহা ছিল, তাহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিলাম; এবার হইতে আর রাজস্বের টাকা অন্যায়রূপে গ্রহণ করিবে না। প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আশীর্ব্বাদ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।" এই বলিয়া তিনি গোপীনাথের মস্তকে নেতধটী পরাইয়া দিলেন।

ভবানন্দ তৎপর পুত্রগণ সহ চৈতন্যদেবের নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, "কোথায় আমার পুত্র খড়্গে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, আর কোথায় আজ তাহার দ্বিগুণ বেতন বৃদ্ধি হইল; আর তাহার মস্তকে নেতধটী স্থাপিত হইল। এ সকলই তোমার কৃপা।" গোপীনাথ প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার অপূর্ব্ব করুণার কথা উল্লেখ করিলেন, এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের ভক্তিশিক্ষা

যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইবার সংকল্প করেন, তখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র কিছুকাল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া বিবিধ প্রকারে প্রভুর সেবাতে তৎপর ছিলেন। মিশ্রকে প্রভু অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একবার প্রদ্যুম্ন প্রভুর নিকট আগমন করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। প্রভু বলেন, রামানন্দ রায়ের কাছে গেলে তিনি তোমায় এ বিষয় ভালরূপ শিক্ষা দান করিবেন। তাঁহার কথানুসারে প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দের ভবনে গমন করিলেন। গিয়া শুনিলেন, রায় দুইটী অল্পবয়স্কা নারীকে উদ্যানের মধ্যে নাটক শিক্ষা দিতেছেন। রামানন্দ এই নারীদ্বয়কে স্নান করাইতেন, তাহাদের অঙ্গ মার্জ্জন করিতেন ও বস্ত্র পরাইয়া দিতেন। রায় অবিকৃত মনে এ সকল কার্য্য করিতে পারিতেন বলিয়াই লোকে বিশ্বাস করিত। রায় উদ্যান হইতে আসিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কিজন্য আগমন হইয়াছে? প্রদ্যুম্ন মিশ্র সেদিন তাঁহার নিকট আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কয়েকদিন পরে মিশ্র প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি মিশ্রকে রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, প্রদ্যুম্ন রায়ের নারীদ্বয়কে নাটক শিক্ষা দেওয়া, ও তাঁহাদিগের অঙ্গমার্জ্জনাদির কথা উল্লেখ করিলেন। চৈতন্য বলিলেন, আমি সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু কাষ্ঠের পুত্তলী দর্শনেও আমার চিত্তবিকার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু রায়ের দেহ অপ্রাকৃত—রায় জিতেন্দ্রিয়। তুমি তাঁহার নিকট পুনরায় গমন করিয়া ভক্তিতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা কর। প্রভুর আজ্ঞায় প্রদ্যুম্ন মিশ্র পুনরায় রায় রামানন্দের নিকট গমন করিয়া ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রায় রামানন্দ পরমানন্দে প্রদ্যুম্ন

মিশ্রের সহিত ভক্তি-তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আলোচনা করিতে করিতে রায় যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন; এবং হৃদয়ের আবেগ আর সংবরণ করিতে না পারিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মিশ্র রামানন্দের কৃষ্ণতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, ও ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ের গভীর জ্ঞান ও তাঁহার ভাবপ্রবণতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। মিশ্র সফলকাম মনে করিয়া শ্রীচৈতন্য প্রভুর নিকট সকল বিষয় জ্ঞাত করিলেন।

রাঘবের ঝালি

প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় যখন গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে আগমন করিতেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রভুর জন্য বিবিধ খাদ্য লইয়া আসিতেন। ভক্তদিগের পত্নীরা প্রভুর প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা বশতঃ এ সকল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন। বৎসরান্তে প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দ এই সকল খাদ্যবস্তুর দ্বারা গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। সকলেই আপনাপন নামে গোবিন্দের হস্তে খাদ্যদ্রব্য সকল প্রদান করিয়া প্রভুকে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদন করিবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানাইতে বলিতেন। গৌড় হইতে আনীত খাদ্যদ্রব্যাদির মধ্যে পানী-হাটীর রাঘব পণ্ডিতের পত্নী দময়ন্তী দেবী প্রভুর জন্য ফুলবড়ি, সুক্ত, বিবিধ প্রকার আচার ও নানাপ্রকার সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পেটরা ভরিয়া প্রেরণ করিতেন। এক এক পেটরা একাধিক বাহক বহন করিয়া আনিত। প্রভু সন্ন্যাসী, তিনি সকল বিষয়েই উদাসীন। একদিন গোবিন্দ প্রভুকে আনীত দ্রব্যাদির কিছু কিছু অংশ ভক্ষণ করিতে বলিলেন। তাহার মধ্যে নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার সামগ্রী ছিল। প্রভু এ সকলই হইতে প্রসন্নচিত্তে কিছু কিছু অংশ লইয়া ভক্ষণ করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর আহারের সময় কাহার কোন্ দ্রব্য তাহা প্রভুকে বলিতে লাগিলেন। সেদিন অনেক দ্রব্য আহারের পর গোবিন্দ বলিল, এখন

রাঘবের ঝুলি বাকি আছে; প্রভু অন্যদিন তাহা ভোজন করিবেন বলিয়া রাখিয়া দিতে বলিলেন। গৌড়ীয় ভক্তদিগের বাৎসরিক এইরূপ উপঢৌকনের মধ্যে রাঘব-পত্নী-প্রেরিত উপঢৌকনই বিবিধ প্রকার ও বহুল বলিয়াই বিবেচিত হইত। এইজন্য "রাঘবের ঝুলি" প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

হরিদাসের দেহত্যাগ

পুরুষোত্তমে শ্রীচৈতন্যের যে সকল শিষ্য জীবনের অনুপম সৌন্দর্য্য-গুণে সকলের চিত্ত হরণ করিতেন, ভক্ত হরিদাস তাঁহাদের মধ্যে উজ্জ্বল রত্নসম। হরিদাস অনুদিন হরিনাম জপে ও কীর্ত্তনে রত থাকিতেন। তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন।

হরিদাস মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উচ্চবংশের দেবচরিত্র ব্রাহ্মণের ন্যায় বহুলোকের নিকট হইতে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রাপ্ত হইতেন। হরিভক্ত পবিত্রচেতা ব্যক্তিরাই যে যথার্থ দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরাঙ্গই বঙ্গদেশে তাঁহার বাক্য ও কার্য্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রভু যবনকুলোদ্ভব হরিদাসকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। নিত্য তাঁহার দর্শনার্থ তাঁহার বাসায় গমন করিতেন। গোবিন্দ তাঁহারই আদেশে নিত্য ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের জন্য প্রসাদান্ন লইয়া যাইত। একদিন গোবিন্দ প্রসাদান্ন লইয়া হরিদাসের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া গুণগুণ রবে হরিনাম জপ করিতেছেন। গোবিন্দ তাঁহাকে ভোজনার্থ অনুরোধ করিলে, তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি নামের সংখ্যা

পূর্ণ করিতে পারিতেছি না, কিরূপে আহার করিব? তবে প্রসাদান্ন কিরূপে একেবারে গ্রহণ না করিয়া থাকিব?" এই বলিয়া, তাহা হইতে দুই চারিটি মুখে দিয়া পুনরায় নামজপে রত হইলেন। হরিদাস বৃদ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার প্রাণবিহঙ্গ এখন সংসারের পরপারে বিভুগুণ কীর্ত্তনের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। দুর্ব্বল শরীরে নাম জপের সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে না, এই তাঁহার গভীর দুঃখ। প্রভু হরিদাসের বাসায় আগমন করিয়া তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করাতে, হরিদাস তাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানাইয়া বলিলেন, "শরীর এক প্রকার সুস্থ আছে কিন্তু মনের অবস্থা ভাল নয়।" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি ব্যাধি, আমাকে খুলিয়া বল দেখি।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভো! নাম জপের নির্দ্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না এই দুঃখ।" প্রভু বলিলেন "নামমাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, লোকের মধ্যে তাহাও ঘোষণা করিলে, এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, নামজপের সংখ্যা অল্প করিয়া ফেল।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভো! আমি অস্পৃশ্য অধম নীচ জাতি; তোমারই কৃপাতে আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি; এবং অনেক উচ্চ অধিকার লাভও করিয়াছি। তুমি ত আর মানুষ নও; সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার; তুমি আপন ইচ্ছানুসারে মানুষকে কার্য্য করাও। প্রভো! বহুদিন হইতে আমার এই মনে হইতেছে যে, তুমি শীঘ্রই ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইবে। সে লীলা আমাকে আর দেখিতে না হয়, এই আমার বাসনা। অন্তিমকালে যেন তোমার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া, তোমার চাঁদবদন দেখিতে দেখিতে, এবং তোমার মধুময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমার দেহান্ত হয়। দয়াময়! তোমার নিকট আমার এই নিবেদন।"

"এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিত্তে॥

সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥
মোর ইচ্ছা এই যদি তোমার কৃপা হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥"

চৈঃ চরিতামৃত।

প্রভু হরিদাসের ব্যাকুল প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "হরিদাস, তোমার যে বাসনা, তাহা অবশ্য ভগবান পূর্ণ করিবেন। কিন্তু আমার কার্য্যই যে তোমাকে লইয়া; আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া তোমার উচিত নয়।" হরিদাস প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, "আমার মস্তকের মণিস্বরূপ এমন কত ভক্ত তোমার লীলার সহায় হইবে; আমার ন্যায় সামান্য একটি পিপীলিকা ইহসংসার হইতে চলিয়া গেলে, কোনই ক্ষতি হইবে না।"

বেলা অধিক হইয়া আসিলে, প্রভু স্নান-ভোজনার্থ গমন করিলেন। গৌর দেখিলেন, হরিদাসের ইহলোকের দিন ফুরাইয়া আসিল। তিনি তৎপরদিবস ভক্তগণসহ হরিদাসের বাসায় আগমন করিলেন। আসিয়া দেখেন, তাঁহার ক্ষীণ দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। তিনি হরিদাসের শরীরের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি যেমন রেখেছ আমি তেমনি আছি।" চৈতন্যদেব, ভক্তগণ সহ সেই মুমূর্ষু অনন্তধামের যাত্রী, ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের শয্যার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ দামোদর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি

নীলাচলের সমস্ত ভক্তই আজ ভক্ত হরিদাসের মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে সমবেত হইয়াছেন। কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু হরিদাসের বিচিত্র গুণাবলী স্মরণ করিয়া ভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সকলের সমক্ষে তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হরিদাস তখনও জীবিত আছেন। যাঁহাদের সঙ্গে তিনি এতদিন হরিগুণ কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, আজ বিদায়কালে তাঁহাদের চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

অবশেষে হরিদাস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সম্মুখে বসাইলেন, এবং তাঁহার পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া অনিমিষনয়নে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। হরিদাসের দেহান্ত হইলে, ভক্তদিগের কণ্ঠ হইতে হরিধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাসের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে মৃতদেহ সাগর-জলে লইয়া গিয়া স্নান করাইলেন, এবং সকলে তাঁহার পাদোদক পান ও চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন, "হরিদাসের অঙ্গস্পর্শে আজ হইতে সাগর মহাতীর্থ-রূপে পরিণত হইল।" তাঁহারা হরিদাসের মৃতদেহ কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরাইয়া, পুষ্পে সুসজ্জিত করিলেন ; এবং প্রসাদান্ন সঙ্গে দিয়া সাগর তটে, বালুকারাশির মধ্যে প্রোথিত করিলেন। অবশেষে সমাধির চতুর্দ্দিকে ক্ষণকাল কীর্ত্তন করিয়া ভক্তদল গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হরিদাসকে সমাধিস্থ করিয়া শ্রীচৈতন্য প্রভু তাঁহার মহোৎসবের জন্য সিংহদ্বারে ও সকল দোকানে গমন করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সকলেই প্রচুর পরিমাণে তাঁহাকে ভিক্ষা দান করিতে লাগিল। এই মহোৎসবে সকলে ভোজন করিতে বসিলে, প্রভু স্বহস্তে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। প্রভু এক এক জনের পাতে পঞ্চজনের

খাদ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। সকলেই হরিধ্বনি করিতে করিতে আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করিল। প্রভু ভোজনান্তে সকলকে চন্দন ও মালা প্রদান করিলেন; এবং অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে, সর্ব্বসমক্ষে হরিদাসের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

গৌড়ীয় নারীদিগের আগমন ও নানা কথা

ভক্তদিগের নীলাচলে আগমনের সময় উপস্থিত হইল। এবার গৌড়ীয়দিগের পত্নীরাও প্রভুর দর্শন লালসায় তাঁহাদিগের সঙ্গে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ সেন প্রতি বৎসরই যাত্রীদিগের পরিচালকরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। এবারও তিনি প্রায় তিনশত পুরুষ ও নারীর তত্ত্বাবধায়ক রূপে বহির্গত হইয়াছেন। পথে কোন স্থলে নদী পার হইবার সময় তিনি সকলের পারের কড়ি দিয়া পার করাইয়া দিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজের পারের ঘাটে কিছু বিলম্ব হইল। এদিকে যাত্রিদল অধিক দূর অগ্রসর হইয়া শিবানন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা অধিক হইতে লাগিল,—তাঁহারা কোথায় বাসা করিবেন, কি খাইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই সকল অসুবিধার মধ্যে তাঁহারা বড়ই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেনের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নিত্যানন্দ 'শিবানন্দের সব ছেলে মরুক', বলিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। রৌদ্রেতে সকলে বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে শিবানন্দ সেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসিবামাত্র নিত্যানন্দ শিবানন্দ সেনের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। শান্তস্বভাব শিবানন্দ পদাঘাতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, 'আমার সৌভাগ্য' এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে শিবানন্দের পত্নী অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে স্বামীকে বলিলেন, "নিত্যানন্দ গোঁসাই তোমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, 'তাহার তিন ছেলে মরুক' বলিয়া গালি দিয়াছেন।" শিবানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এতে কি রাগ বা দুঃখ করিতে আছে? এ যে গোঁসাইয়ের আশীর্ব্বাদ।"

যাত্রিদল এ দীর্ঘ পথ চলিয়া নীলাদ্রিতে উপনীত হইলে, প্রভু সকলকে সমাদর করিলেন। যাত্রিদলের সকলে যখন প্রভুর চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিতে লাগিল, তখন নদীয়াবাসী পরমেশ্বর মোদক তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে, প্রভু মোদককে দর্শন করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। মোদকের গৃহ প্রভুর বাটীর সন্নিকটে। গৌর বাল্যকালে মোদকের দোকানে মুড়কী, বাতাসা, সন্দেশ প্রভৃতি অনেক মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিতেন। শিবানন্দ সেনের একটি সাত বৎসরের পুত্র প্রভুকে প্রণাম করিলে তিনি তাহার নাম পুরীদাস রাখিলেন। এই বালকই ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্য-দেবের জীবনী রচনা করেন; এবং কবিকর্ণপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

নীলাচলে আবার আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। এবার ভক্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা আসিয়া প্রভুকে সকলেই একে একে বিবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ভোজন করাইতে লাগিলেন। মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। ভক্তেরা সস্ত্রীক চাতুর্ম্মাস্য করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে প্রভুর নিকট বিদায় লইতে আসিলে, তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিলেন, "তোমরা প্রতিবর্ষে কত কষ্ট করিয়া আমাকে দেখিতে এস। আমি নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়া প্রচার করিতে বলিয়াছি; এবং এখানে এত কষ্ট করিয়া আসিতে নিষেধ করিয়াছি; তিনি তবুও আমাকে দেখিবার জন্য এখানে

আসিয়া থাকেন। আমি তোমাদের এ প্রেমের ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। আমি সন্ন্যাসী, আমার এই দেহ ছাড়া আর কোন সম্বল নাই; তাহাও ত তোমাদের দান করিয়াছি।" সকলে প্রভুর এই স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জগদানন্দ পণ্ডিতের অভিমানভঞ্জন

পণ্ডিত জগদানন্দ কবিরাজ ছিলেন। তিনি প্রভুর আদেশে অনেক সময়ে শচীদেবীর অভিভাবক হইয়া নবদ্বীপে থাকিতেন। একবার বঙ্গদেশ হইতে নীলাচলে আসিবার সময় তিনি প্রভুর জন্য এক কলস সুগন্ধি তৈল লইয়া আসেন; এবং উহা গোবিন্দের হস্তে দিয়া প্রভুর গাত্রে ও মস্তকে মর্দ্দন করিতে বলেন। জগদানন্দ জানিতেন, ঐ তৈলের দ্বারা প্রভুর শরীর স্নিগ্ধ থাকিবে। গোবিন্দ প্রভুকে জগদানন্দ-প্রদত্ত তৈলের কথা বলিলে, প্রভু বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে তৈল ব্যবহার নিষিদ্ধ। তুমি ঐ তৈল জগন্নাথ দেবের প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য প্রদান কর।" জগদানন্দ এই কথা শ্রবণ করিলেন। পরদিবস জগদানন্দ আসিলে, প্রভু তৈলের কথা উত্থাপন করিয়া উহা জগন্নাথের সেবার জন্য ব্যবহার করিতে বলিলেন। জগদানন্দ ভিতরের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "আমি বঙ্গদেশ হইতে তৈল আনিয়াছি কে বলিল?" এই বলিয়া তিনি তৈলপূর্ণ কলস ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রভু আর কোন কথা বলিলেন না। পণ্ডিত কলসটি ভঙ্গ করিয়া আপন গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। তিন দিবস এই ভাবে কাটিয়া গেল। তৎপর শ্রীচৈতন্য জগদানন্দের অভিমান ভঞ্জনের জন্য তাঁহার বাটীর দ্বারের নিকট গিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আজ তোমার এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করিব।" জগদানন্দ অযাচিত প্রভুর এই অনুরোধ শ্রবণে পরম পুলকিত

চিত্তে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন, এবং প্রভুর ভোজনের জন্য রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। জগদানন্দ যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনি রন্ধনকার্য্যেও সুপটু ছিলেন। তিনি নানা প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন। প্রভু আহার করিবেন, এই আনন্দে তাঁহার প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে। প্রভু যথাসময়ে ভোজন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। জগদানন্দ তাঁহার আহারের জন্য পাত পাতিলে, প্রভু তাহার পার্শ্বে আর একখানা পাত পাতিয়া, জগদানন্দকে আহার করিতে বলিলেন। জগদানন্দ তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া বলিলেন, তাঁহার ভোজনের পর তিনি আহার করিবেন। জগদানন্দ বিবিধ ব্যঞ্জন দ্বারা প্রভুকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার রন্ধনের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "ক্রোধাভিভূত হইয়া বড় সুন্দর রন্ধন করিয়াছ।" পরে প্রভু জগদানন্দের নিকট বসিয়া তাঁহাকে আহার করাইয়া বাসায় আসিলেন।

প্রভুর কঠোর বৈরাগ্য দর্শন করিয়া জগদানন্দ সাধ্যানুসারে তাঁহাকে একটু সুখে রাখিতে যত্ন করিতেন। প্রভু কলার বাসনায় শয়ন করিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্লেশ হইতেছে মনে করিয়া, জগদানন্দ একখানি তুলার তোষক প্রস্তুত করিয়া গোবিন্দকে দিয়া প্রভুর শয্যা প্রস্তুত করিতে বলেন। প্রভু তোষক দর্শন করিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোষক কে দিয়াছে?" গোবিন্দ বলিল, "জগদানন্দ পণ্ডিত।" প্রভু বলিলেন, "তবে একখানা খাট আনিলেই ত হয়?" জগদানন্দ অত্যন্ত অভিমানী ইহা তিনি জানিতেন; সেজন্য আর কোন কথা বলিলেন না।

রঘুনাথ ভট্টের আগমন

শ্রীচৈতন্যদেব যখন কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন, তখন মিশ্রের পুত্র বালক রঘুনাথ তাঁহার পদসেবা করিতেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। এই বাল্যাবস্থায় ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সুমধুর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্ম ও ভক্তি ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। রঘুনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শ্রীচৈতন্য প্রভুর দর্শনার্থ নীলাচলে যাত্রা করেন। পথে যাইবার সময় রামদাস নামে এক প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। রামদাস যদিও রামোপাসক ছিলেন, তথাপি তরুণ-বয়স্ক যুবা রঘুনাথের ভক্তিভাব দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং রঘুনাথের তল্পি বহন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া, পুরুষোত্তমে লইয়া আসেন।

রঘুনাথ প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে প্রভু প্রথমতঃ তাঁহাকে চিনিতে সমর্থ হন নাই; পরে পরিচয়ে যখন তপন মিশ্রের পুত্র বলিয়া জানিলেন, তখন সানন্দচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন। রঘুনাথ প্রভুর সঙ্গে কিছুকাল বাস করিয়া ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তপন মিশ্রের পুত্রের ধর্ম্মনিষ্ঠা বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

রঘুনাথ কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় চৈতন্যদেব তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতে নিষেধ করেন; এবং ভাগবত পাঠ ও শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতে বলেন। ভক্ত রঘুনাথ ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রণোদিত অন্তরে প্রভুর উপদেশানুসারে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মাতাপিতার পরলোক গমনের পর রঘুনাথ পুনরায় নীলাচলে আগমন করিয়া কয়েকমাস অবস্থিতি করেন, এবং তৎপর প্রভুর আজ্ঞায়

বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে সনাতনাদি ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইয়া সাধন ভজন ও হরিগুণ কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করেন। বৈষ্ণবদিগের পূজ্যপাদ ছয়জন গোস্বামীর মধ্যে ইনি অন্যতম।

নারীর সঙ্গীত

একদিন চৈতন্যদেব যমেশ্বর টোটায় যাইতেছিলেন। দূরে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের এক দেবদাসী অতি মধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছিল। ধর্ম্মাত্মারা চিরদিনই সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যের কোমল-হৃদয় সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া পড়িল; তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। সঙ্গীত যে বামাকণ্ঠ হইতে উত্থিত হইতেছে, তাঁহার তখন সে জ্ঞান নাই। তিনি দৌড়িয়া যাইয়া, বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক যেই সেই গায়িকাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, অমনি গোবিন্দ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া 'স্ত্রীলোক' বলিয়া, দুই বাহু দ্বারা তাঁহাকে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। 'স্ত্রীলোক' এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র গৌরের চৈতন্য হইল। তিনি গোবিন্দকে বলিলেন, 'তুমি যদি আমাকে রক্ষা না করিতে তাহা হইলে, আমি আজ এ দেহ ত্যাগ করিতাম, তুমি আজ হইতে আমার নিকটে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিও।'

কোন নারীর ধর্ম্মনিষ্ঠা

একদিন অনেকেই জগন্নাথদেবের মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীচৈতন্যও তথায় উপস্থিত হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। এক উড়ীয়া নারী গরুড়ের উপর বসিয়া, নিবিষ্টচিত্তে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিতেছিল; কিন্তু তাহার পদদ্বয় প্রভুর স্কন্ধদেশে সংলগ্ন ছিল; গোবিন্দ ইহা দর্শন করিয়া স্ত্রীলোকটিকে তিরস্কার করিয়া তথা হইতে নামাইতে গেলে, প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, "ইঁহার দর্শনের

ব্যাঘাত উৎপাদন করিও না।” উড়ীয়া রমণী যখন দেখিল যে শ্রীচৈতন্য-দেবের স্কন্ধে তাহার চরণদ্বয় স্থাপিত রহিয়াছে তখন সে লজ্জায় ও দুঃখে তাহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রভু সেই নারীর একাগ্রতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “এ নারী যথার্থ ভাগ্যবতী, যদি ইহার ন্যায় আমার নিষ্ঠা থাকিত আমি নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতাম।”

গৌড়ীয় নারীদিগের আগমন ও নানা কথা

গৌরসংকীর্ত্তন

যখন বৎসরান্তে গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে আগমন করতঃ চারিমাস কাল তথায় বাস করিতেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে প্রতিদিন সায়ংকালে সংকীর্ত্তন হইত। একদিন ভক্তগণ সমবেত হইলে, অদ্বৈতাচার্য্য সকলকে বলিলেন, ‘এস আজ আমরা গৌরচন্দ্রের গুণাবলী কীর্ত্তন করি।’ আচার্য্য সেই মর্ম্মের একটি কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা বলিলেন, ‘প্রভু তাঁহার গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন।’ অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, ‘আমরা অন্য বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে পারি, কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁহার কোন কথা আমরা শুনিতে প্রস্তুত নই।’ অদ্বৈতাচার্য্যের কথায় সকলে সম্মত হইয়া, তাঁহারা আচার্য্য-রচিত সঙ্গীতটি উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ ও করতালের ধ্বনির সহিত তাঁহাদিগের কণ্ঠধ্বনি চারিদিক নিনাদিত করিয়া তুলিল। গৌর-গুণকীর্ত্তনে তাঁহারা আজ তাঁহার অবতারত্ব ঘোষণা করিলেন। গৌর কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অদ্যকার কীর্ত্তন অন্যান্য দিবসের ন্যায় হরিগুণকীর্ত্তন নহে; তাঁহারই গুণাবলী কীর্ত্তিত হইতেছে। অনন্ত ঈশ্বরে ও তাঁহাতে কত প্রভেদ ইহা স্মরণ করিয়া তিনি লজ্জায় ও ঘৃণায় আপনার বাসায় আগমন করতঃ শয্যায়

শয়ন করিয়া রহিলেন। কীর্ত্তনের সময় প্রভুকে চলিয়া আসিতে দেখিয়া কীর্ত্তনকারীরা কীর্ত্তনান্তে সদলে তাঁহার বাসায় আগমন করিলেন। প্রভু কীর্ত্তন শ্রবণে প্রীতিলাভ করেন নাই, ইহা অনুভব করিয়া কেহ আর সাহস করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন না। কেবল শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার চলিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রভু তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "কোথায় হরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে, না, সেস্থলে মানবের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে?" শ্রীবাস প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার করদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত করিলেন। শ্রীচৈতন্য এই ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীবাস বলিলেন, "সূর্য্যকে কি আবরণে আবৃত করিয়া রাখা যায়?" শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবাসের কথা শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এমন সময় চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট অঞ্চলের একদল লোক শ্রীচৈতন্যদেবের কুটীরের দ্বারে আগমন করিয়া প্রমত্তভাবে গৌর সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। শ্রীবাস তখন গৌরকে বলিলেন, "ঐ শোন, এখন কাহার মুখ বন্ধ করিবে?" গৌর নিরুপায় হইয়া নিরুত্তর রহিলেন।

ভক্ত কালিদাস

পরম ভক্ত রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি পিতৃব্য কালিদাস ঐশ্বর্য্যশালী ও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ভক্তদিগের প্রসাদ ভক্ষণ করিতে বড় ভালবাসিতেন। কালিদাস জাতিনির্ব্বিশেষে ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে তাঁহাদিগকে ভোজ্যবস্তু প্রদান করিতেন, এবং তাঁহাদিগের ভোজনাবশিষ্ট অংশ ভোজন করিতেন। তাঁহারা উহা প্রদানে স্বীকৃত না হইলেও তিনি ছাড়িতেন না। বর্ষান্তরে বঙ্গদেশের ভক্তগণ যখন নীলাচলে আগমন করেন, তখন কালিদাসও তাঁহাদিগের সহিত আগমন করিলেন। তিনি একদিন ভুঁমিমালি জাতীয় ঝড়ু নামক

এক ভক্ত বৈষ্ণবকে আম্র ভক্ষণ করাইয়া তাহার নিকট হইতে ভুক্তাবশেষ প্রার্থনা করেন, কিন্তু সে উহা কালিদাসকে প্রদান করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি সে জন্য তাহার পরিবারে অনেকগুলি আম্র উপঢৌকন প্রদান করেন। তাহার পত্নী ঐ আম্র ভক্ষণ করিয়া উহাদের অষ্টিকাদি একটা গর্ত্তে ফেলিয়া দেয়, কালিদাস তাহা অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল আঁঠি ও খোলা চুষিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। ভক্তের প্রসাদ লাভ করিতেছি ভাবিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল।

কালিদাসনীলাচলে অবস্থিতিকালে, শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন লাভ এবং তাঁহার প্রসাদান্ন লাভ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

প্রেমবিকার ও সাগরে পতন

ভক্ত হরিদাসের তিরোভাবের পর হইতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণিমার সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি সততই বিরহ-যাতনায় অস্থির হইয়া, দিনযামিনী যাপন করিতেন। স্নানাহার কেবল অভ্যাসবশতই সম্পন্ন হইয়া যাইত। তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে ভক্তবৃন্দ ভীত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ভাব-তরঙ্গ ক্রমে বর্দ্ধিত হইত। ক্রমে যত রাত্রি অধিক হইত ততই তিনি যেন সেই তরঙ্গে ভাসমান হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। সায়ংকালে তাঁহার কুটীর মধ্যে রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী তাঁহার অনুগত শিষ্যবৃন্দ সমবেত হইয়া তাঁহাকে যেন চেতনাবস্থায়

রাখিবার জন্য প্রয়াসী হইতেন। কেননা, প্রভু একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িতেন। একদিন সায়ংকালে প্রভু ব্যাকুল হইয়া স্বরূপ ও রামরায়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ শক্তির কথা শুনিতে চাও? ঐ অপরূপ রূপমাধুরী লোভে মুগ্ধ হইয়াই আমি বেদবিহিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া যোগি-সাজে সাজিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।" তাই চৈতন্যচরিতামৃতে—

"রায় স্বরূপের কণ্ঠে ধরি, কহে "হাহা! হরি! হরি!"
ধৈর্য্য গেল হইল চপল।
শুন বান্ধব! কৃষ্ণের মাধুরী,
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদ ধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী॥"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে তিনি কৃষ্ণবিরহে অস্থির হইয়া পড়িলেন—ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। বাহ্যজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া, প্রভুকে ভিতরের কুটীরে লইয়া গেলেন। রায় রামানন্দ সময়োচিত একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। স্বরূপ মধুর কণ্ঠে পূর্ব্বরাগের একটি গীত আরম্ভ করিলেন। প্রভু সঙ্গীতে চেতনালাভ করিলেন; এবং সহস্র কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রূপের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। স্বরূপ ও রামানন্দ রায় ভাবিলেন, তাঁহাদের আশা সেদিন পূর্ণ হইল। কেননা, প্রভু চেতনা লাভ করিয়াছেন, আর তাঁহাদের মনে হইল অন্তকার রাত্রিতে প্রভু আর সংজ্ঞাহীন হইবেন না। তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া, রায় রামানন্দ গৃহে গমন করিলেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারদেশে শয়ন করিয়া রহিলেন।

প্রভু উচ্চৈঃস্বরে হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ স্বরূপ প্রভুর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে না পাইয়া কপাট খুলিয়া দেখেন, তিনি গৃহের

মধ্যে নাই। অথচ গৃহের তিন দিকের কপাট বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা ব্যাকুল চিত্তে প্রভুর অনুসন্ধানে ধাবিত হইয়া দেখেন, প্রভু সিংহদ্বারে অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। শিষ্যবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার কর্ণকুহরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নাম শ্রবণে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন। চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি সিংহদ্বারে কিরূপে আসিলেন, আশ্চর্য্যান্বিতভাবে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করাতে স্বরূপ বলিলেন, 'গৃহে গিয়া সকল কথা বলিব।' এই বলিয়া, তিনি তাঁহার হস্ত ধরিয়া গৃহে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাদের অসাক্ষাতে অর্গলবদ্ধ গৃহের মধ্য দিয়া সিংহদ্বারে তাঁহার গমনের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। প্রভু এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন।

একদিন সাগরে স্নান করিতে যাইবার সময়, দূর হইতে চটক গিরি দর্শনে, উহা গোবর্দ্ধন গিরি বলিয়া প্রভুর প্রতীয়মান হওয়াতে, কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল; তিনি বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতিতে সেই দিকে ধাবমান হইলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়া, তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল, তিনি চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া, বালুকার উপর বসিয়া পড়িলেন।

ভক্তেরা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখেন, প্রভু সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সাগরতটে পড়িয়া রহিয়াছেন; তাঁহার নয়নদ্বয় জলে ভাসিয়া যাইতেছে, এবং শরীরের লোমকূপের মধ্য দিয়া রক্ত নির্গত হইতেছে। ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যদেবের চৈতন্য উৎপাদন করিতে, ভগবদ্ নামোচ্চারণ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই জানিয়া, ভক্তেরা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য, কর্ণের নিকট মৃতসঞ্জীবনী হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। গৌর চেতনা লাভ করিলেন।

এইরূপ সময় একদিন প্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ স্বরূপ ও রামরায়ের নিকট কৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিতে করিতে, ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, এমন সময় রায়

কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদ্যাপতি ও গীতগোবিন্দ হইতে ভাল ভাল অংশ পাঠ করিতে লাগিলেন এবং সুগায়ক স্বরূপ মধুর সঙ্গীত ধরিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কিছু সুস্থির হইয়া সাগরের দিকে ধাবিত হইলেন, যাইতে যাইতে, তিনি একটি উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। ভাগবতে আদি রাসলীলার সময়ে একবার শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে লইয়া, পলায়ন করিলে, গোপীগণ কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া তরুলতা, ও বৃক্ষদিগের নিকট গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন

প্রভু প্রমোদোদ্যানে প্রবেশ করিতেই রাসলীলার সেই ছবি তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি ভাগবতের দশমস্কন্ধের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে, গোপীগণের ন্যায় তাঁহার প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন,—

"চূতপিয়ালপনসাসন কোবিদার
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্র কদম্বনীপাঃ
যেঽন্যে পরার্থভাবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥

'হে চূত! হে পিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্বু! হে অর্ক! হে বিল্ব বকুল! হে আম্র! হে কদম্ব! হে নীপা! হে অপরাপর বৃক্ষ সকল! তোমরা যমুনাতীর্থবাসী, পরোপকারের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আমরা কৃষ্ণবিরহে আত্মহারা হইয়াছি; কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, আমাদিগকে বলিয়া দাও।'

বৃক্ষসকল নীরবে দাঁড়াইয়া, গৌরের কৃষ্ণ-বিরহের কাতরোক্তি সকলই শ্রবণ করিল, কিন্তু কোন উত্তব দিল না। তখন তিনি ভাবিলেন, এ-সকল পুরুষ জাতি, ইহারা আমার কথায় কেন উত্তর দান করিবে! গৌর দেখিলেন, সম্মুখে মালতি, মল্লিকা, প্রভৃতি নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাঁহার মনে হইল ইহারা নারীজাতি, ইহারা অবশ্যই আমার

ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমার প্রাণবল্লভের সমাচার প্রদান করিবে, তাই তিনি গোপীদিগের ন্যায় ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।'
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥"

হে মালতি! মল্লিকে! জাতি! যূথিকে! তোমরা কি তোমাদের মাধবকে দেখিয়াছ? করস্পর্শে তোমাদের প্রীতি জানাইয়া তিনি কি এই পথে গিয়াছেন? তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ সুললিতছন্দে, তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলিতেছেন,—

"'আম্র! পনস! পিয়াল! জম্বু! কোবিদার!
তীর্থবাসী সবে, কর উপকার।
কৃষ্ণ তোমার ইঁহা আইল।? পাইলা দরশন?
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন।'
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান;
'এ সব পুরুষ জাতি সখার সমান;
এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়?
এই স্ত্রীজাতি লতা আমার সখী প্রায়
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পেয়েছে দর্শনে।'
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে ঃ—
'তুলসি! মালতি! যূথি! মাধবি! মল্লিকে!
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে?
তুমি সব হও আমার সখীর সমান;
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ'।"

অবশেষে কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া, তিনি সাগরতটে গমন করিলেন, এবং উপকূলস্থিত একটি কদম্ব বৃক্ষতলে,

'কৃষ্ণ পাইলাম কৃষ্ণ পাইলাম', বলিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। রায় রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতি সাথী হইয়াই বিচরণ করিতেছিলেন, এখন পূর্ব্ববৎ সঙ্গীত ও ভক্তিগ্রন্থের শ্লোকাদির দ্বারা প্রভুর চৈতন্যোৎপাদন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গৌরের অবস্থা এইরূপে কাটিতে লাগিল। উন্মাদের ন্যায় কখন প্রলাপ বাক্য বলেন, কখন ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বরূপাদির কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলেন, 'আমার সে কৃষ্ণধন কোথায় গেলেন! কোথায় গেলে আমি তাঁহার দেখা পাব!' রজনীতে তিনি নিদ্রা যাইতে পারিতেন না; দিব্যোন্মাদের সকল লক্ষণই তাঁহাতে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সাগরে পতন

শরৎকাল, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; চন্দ্রালোকে চারিদিক আলোকিত। গৌর কি এসময় স্থির থাকিতে পারেন? তিনি ভক্তগণসহ উদ্যানে উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি অদূরে আইটোটায় সাগরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। জ্যোৎস্নালোকে নীলাম্বুরাশির বক্ষ যেন ঝলমল করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনে হইল উহা পুরুষোত্তমের সমুদ্র নহে, উহা বৃন্দাবনের যমুনা। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সঙ্গীদিগের অগোচরে দ্রুতবেগে সেইদিকে ধাবিত হইলেন, এবং সাধ্বী প্রেমিকার ন্যায় তাঁহার সেই হৃদয়স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য সাগর-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই স্বরূপ গোস্বামী ও রামরায় চারিদিক চাহিয়া দেখেন, প্রভু অদৃশ্য হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই জানিতেন প্রভুর ভাবতরঙ্গ যেরূপ প্রবল হইয়াছে, তাহাতে কোন্ ঘটনায় যে তাঁহার জীবন সংশয় হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, এই জন্য তাঁহারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শিষ্যবৃন্দের নিকট ত্বরায় এ সমাচার প্রেরিত হইল। সকলেই উদ্বিগ্ন-চিত্তে প্রভুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ বা সাগরের কূলে কূলে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আর কেহ কেহ বা চিরায়ু পর্ব্বত প্রভৃতির দিকে গমন করিলেন। নিশা প্রায় অবসান হইয়া আসিল, প্রভুর দেখা নাই। এই দীর্ঘসময় অন্বেষণের পর, দর্শনে নিরাশ হইয়া, সকলেরই মন বিষাদের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তাঁহার দর্শনে তাঁহারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইলেন, এই হৃদয়বিদারক কথাই তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে উদিত হইতে লাগিল,—এবং বিষাদের মেঘকে আরো ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

ঘন বিষাদে মন আচ্ছন্ন হইলেও, তাঁহারা প্রভুর অন্বেষণে নিরস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। স্বরূপ গোঁসাই কয়েকজনকে লইয়া সাগরের তীরে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার যেন মনে হইল, প্রভু তাঁহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই।

এমন সময়ে তাঁহারা দেখিলেন, এক ধীবর জাল লইয়া গমন করিতেছে। গমনকালীন সে হরিবোল বলিতে বলিতে কখন হাসিতেছে, কখন কাঁদিতেছে ও কখন বা নৃত্য করিতেছে। তাহার এই অবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া রহিলেন; কেহই তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। স্বরূপ গোস্বামী ধীবরকে তাহার এইরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল, "আমি মাছ ধরিবার জন্য জলে জাল ফেলিয়া, তুলিয়া দেখি, আমার জালের মধ্যে একটা মরা মানুষ রহিয়াছে। সেই মৃতদেহ বাহির করিয়া ফেলিবার সময় আমি উহা ছুঁইয়া ফেলিলাম। তখন

হইতে ভয়ে আমার শরীর কাঁপিতেছে। এ ব্রহ্মদৈত্য কি ভূত তাহা কিছুই বলিতে পারি না। তাহার শরীর ও হাত পা খুব লম্বা। তাহার গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া ভয়েতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমি গরীব লোক, স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘর করি; আমি ভিন্ন তাহাদের আর কে দেখিবে? ভূত ঝাড়াইবার জন্য ওঝার বাড়ী যাচ্ছি। তোমরা ওখানে যেও না; তোমাদেরও ভূতে পাবে।" ধীবরের বাক্যে স্বরূপ গোস্বামী সকলই বুঝিলেন, তিনি ধীবরের পৃষ্ঠে তিনটি চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "তোমার ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে; আর কোন ভয় নাই।" সরল জালজীবী, স্বরূপ যথার্থ ওঝার কার্য্য করিল, মনে করিয়া নির্ভয় হইল। স্বরূপ বলিলেন, "তুমি যাঁহাকে জালে তুলিয়াছ, তিনি ভূত নহেন; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" ধীবর বলিল, "আমি কি আর তাঁহাকে চিনি না? এ তিনি নন।" স্বরূপ ও অন্যান্য শিষ্যবৃন্দ তৎপর তাহাকে লইয়া তাহার জালধৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, প্রভু অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অপরূপ রূপ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে আর চিনিবার উপায় নাই। তাঁহারা তাঁহাকে শুষ্ক কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরাইলেন। এবং সকলে মিলিয়া মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যে নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইত, সেই নামেই তিনি আবার চেতনা লাভ করিতেন। এখন সাগর-তটে, সুধামাখা হরিনামের মধুর ঝঙ্কারে সংজ্ঞাহীন গৌরসুন্দর চৈতন্য লাভ করিলেন।

গৌর চেতনা লাভ করিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে সমুদ্র-তটে আনিলে কেন?" তখন স্বরূপ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। আর বলিলেন, "তুমি সমুদ্রকে যমুনা ভাবিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের জলকেলি দেখিতেছিলে, আর আমরা তোমার জন্য সমস্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।" গৌর স্বরূপের কথায় যেন একটু লজ্জিত হইলেন। তৎপর শিষ্যেরা প্রভুকে সমুদ্রে স্নান করাইয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

লীলা সমাপ্তি

অনুদিন প্রেমোন্মত্তভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু এই মত্ততার অবস্থায়ও তিনি জননীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে বিরত হন নাই। ভক্তেরা বঙ্গদেশ হইতে বৎসরান্তে আগমন করিলে, তিনি জননীর সংবাদ লইতেন, এবং তাঁহারা যখন প্রত্যাগমন করিতেন, তখন মাতৃবৎসল গৌর তাঁহার জন্য প্রসাদান্ন ও বস্ত্র প্রেরণ করিয়া, ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইতে বলিতেন। তিনি পণ্ডিত জগদানন্দের উপরই জননীর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি প্রভুর আজ্ঞাবহ হইয়া নবদ্বীপে শচী-দেবীর ভবনেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। জগদানন্দ নীলাচলে আসিবার সময় শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের অনুমতি গ্রহণের জন্য গমন করিলে, আচার্য্য জগদানন্দকে নীলাচলে গিয়া, প্রভুকে তাঁহার কোটি নমস্কার জানাইয়া, তাঁহার রচিত একটি তরজা বলিতে অনুরোধ করিলেন।

জগদানন্দ নীলাচলে আসিয়া, প্রভুকে অদ্বৈতাচার্য্যের প্রণাম জানাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য আপনাকে এই তরজাটি জানাইতে বলিয়াছেন ;—

'বাউলকে কহিও লোক হইল আউল ;
বাউলকে কহিও, হাটে না বিকায় চাউল,
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥'"

প্রভু আচার্য্যের এই তরজা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। এ তরজার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রভুর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কেহ

সমর্থ হন নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরাও ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না।

প্রভু তখন বিরহ-যাতনায় অস্থির; এমন সময় এই তরজা শ্রবণ করিলেন। উহা শ্রবণের পর হইতেই তাঁহার সেই প্রেমভাব আরো বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি কখন রামানন্দের ও কখন স্বরূপের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেন;—অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে নাক মুখ ঘষড়াইয়া, রুধিরধারায় বদনমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ফেলিতেন। প্রভুর এই মহাভাবের লক্ষণ দর্শন করিয়া, স্বরূপ, রামানন্দ রায়, প্রভৃতি দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন। তিনি কখন গৃহত্যাগ করিয়া দেহপাত করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা শঙ্কর পণ্ডিতকে সমস্ত রজনী, তাঁহার নিকট শয়ন ও তাঁহার সেবা করিবার জন্য ভারার্পণ করিলেন। স্বরূপ প্রভৃতিও প্রভুর দেহ রক্ষার জন্য সতত সতর্ক থাকিতেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রাণ এখন সকল ভূতেতেই শ্রীহরির অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। এই মহাভাবের অবস্থাতে তিনি সুনীল আকাশে, হরিৎবর্ণ শস্যক্ষেত্রে, বৃক্ষ ও লতাদিতে, গিরিশৃঙ্গে ও নীলাম্বু বক্ষে, যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, সকল পদার্থই যেন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার জীবন-নিধি কৃষ্ণধনকে প্রকাশ করিয়া দিত। তিনি কৃষ্ণরূপ-সাগরে তন্ময় হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকেই সেই রূপ দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ধাবিত হইতেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি জগন্নাথ বল্লভ নামক এক মনোহর কুসুমোদ্যানে সায়ংকালে বিচরণ করিতে গেলেন। চন্দ্রমার রজতকিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত। কাননের চতুর্দ্দিক নানাজাতীয় কুসুমতরু সকল ফুটন্ত ফুলে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; তদুপরি, বিমল চন্দ্রকিরণে তাহাদের সৌন্দর্য্য আরো ফুটাইয়া তুলিতেছে। কত পাখী মনের উল্লাসে বৃক্ষশাখায় বসিয়া, সুমধুর কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া গান করিতেছে; প্রকৃতির

এই মনোহর সৌন্দর্য্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব মনের উল্লাসে বৃক্ষরাজির তলে তলে গমন করিয়া, প্রেমানন্দে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কুসুমোদ্যান তাঁহার নিকট বৃন্দাবনের নিধুবন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া বংশী বাজাইতেছেন; সে মূর্ত্তি দর্শনে, সে বংশীর রব শ্রবণে, তাঁহার চিত্ত বিমোহিত হইয়া পড়িল,—যমুনার উজানের ন্যায় তাঁহার ভাবতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। প্রবল তুফানে যেমন তরিকে ডুবাইয়া দেয়, প্রবল ভাবের স্রোত তেমনি তাঁহার চিত্তকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিল। তিনি ভাবাবেশে হতচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। অবশেষে শিষ্যেরা জানিতে পারিয়া, নামকীর্ত্তনে তাঁহার চৈতন্যোদয় করিলেন।

স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ সততই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। প্রভুও তাঁহাদিগের সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করিয়া, তৃপ্তিলাভ করিতেন। একদিন প্রভু স্বরূপ ও রামানন্দ রায়কে বলিলেন, "দেখ, নাম সংকীর্ত্তন ভিন্ন জীবের আর গতি নাই; নাম সংকীর্ত্তনেই মানবের সকল অমঙ্গল বিদূরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমোদয় হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে, তাঁহার হৃদয়ে বিষাদ ও দৈন্য ভাব উপস্থিত হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে স্বরচিত কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

'নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি।
দুর্দ্দৈবমীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ॥'

হে ভগবন্! তুমি স্বীয় নাম বহুধা করিয়া তাহাতে আবার শক্তি সঞ্চার করিয়াছ, এবং এতদূর কৃপা করিয়াছ যে, সে সকল স্মরণ করিতে, কালাকাল বিচার বা কোন নিয়মের প্রয়োজন নাই। তথাপি আমার ও সংসারের লোকদিগের এমন দুর্ভাগ্য যে, সে মধুর নাম গ্রহণে রুচি

জন্মায় না। তৎপর নামমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া, নামগ্রহণের অধিকারী কে তাহা উল্লেখ করিলেন—

'তৃণাপদি স্থনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা, মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥'

যে ব্যক্তি তৃণাপেক্ষাও নীচ, তরুর স্থায় সহিষ্ণু—অর্থাৎ বৃক্ষ ছেদনকারীকেও যেমন ছায়া দান করে,—এবং যে ব্যক্তি নিরভিমান হইয়া অপরকে মান দান করে, সেই ব্যক্তিই হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই শ্লোক পাঠান্তে প্রভুর দৈন্যভাব আরো বাড়িয়া উঠিল, তিনি প্রেমে গদগদ স্বরে বলিলেন,—

'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥'

হে ভগবন্! আমি ধন জন যুবতী নারী বা কবিতারও রসাস্বাদন করিতে বাসনা করি না; যেন জন্মে জন্মে তোমার প্রতি অহৈতুকী প্রেম থাকে, আমার এই একান্ত প্রার্থনা।

এই শ্লোক পাঠান্তে প্রভুর প্রেমভাব আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন,—

'নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈ-র্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

হে পরমেশ! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন হইতে অশ্রু বর্ষিত হইবে; কবে গদগদ কণ্ঠে তোমার নাম উচ্চারণ করিব; এবং আমার সমস্ত অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইবে?

ক্রমে তাঁহার ব্যাকুলতা আরো বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি বলিলেন,—

'যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥

গোবিন্দ বিরহে এক নিমেষ আমার নিকট যেন এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে; বর্ষার ধারার ন্যায় আমার দুই চক্ষু হইতে বারিধারা নির্গত হইতেছে; এবং তিনি বিহনে সমস্ত সংসার যেন শূন্য বোধ হইতেছে।

প্রভুর বিরহজ্বালা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যতই হৃদয়-মধ্যে তাঁহার প্রাণনাথকে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সম্ভোগেচ্ছা আরো প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। গৌর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত; তিনি এই প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় একাকী নির্জ্জনে তরুরাজী-বেষ্টিত কানন মধ্যে থাকিয়া তাঁহার হৃদয়নাথের সহবাস-সুখ লাভ করিতেই অধিক প্রয়াসী হইয়া উঠিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে প্রভু অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। গদাধরও প্রভুর প্রতি অচলা ভক্তিবশতঃ তাঁহাকে সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য যত্নবান থাকিতেন। আজন্ম সাধু ও চিরকুমার গদাধর যমেশ্বর টোটায় সাগর-তীরবর্ত্তী এক মনোহর কুসুমোদ্যানে বাস করিতেন। প্রভু অধিকাংশ সময় সে স্থলে গমন করিয়া, নামকীর্ত্তন ও গদাধরের ভাগবত পাঠ শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। বারিধি-তীরস্থ বৃক্ষলতাদি-পরিশোভিত এই মনোহর স্থানে প্রভুর ভাবোচ্ছ্বাসে কোন বিপদ ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদা তাঁহাকে আপনার নয়নপথে রাখিতে ব্যস্ত থাকিতেন। প্রভুর আদেশে গদাধর উদ্যানমধ্যে গোপীনাথের একটি মন্দির প্রস্তুত করেন। কথিত আছে, একদিন প্রভু উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপীনাথের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন গদাধর এক বৃক্ষতলে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে, প্রভুকে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না দেখিয়া গদাধরের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; তিনি তৎক্ষণাৎ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া, তাঁহার লীলা সম্বরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। যাঁহাকে নিমেষকাল না দেখিলে তাঁহাদের

প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িত, সেই গৌরাঙ্গদেবকে আর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। আকুল হৃদয়ে অশ্রুবারি ফেলিতে ফেলিতে নিমাইয়ের চিরসঙ্গী গদাধর একখানা খোলামকুচি লইয়া বালুকার উপর লিখিলেন,—

"কি কহিব কোথা যাব বাক্য নাহি সরে।
গোরাচাঁদ হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে॥" *

বৈষ্ণবেরা বলেন, গোপীনাথের দেহের সঙ্গে প্রভু আপনার দেহ মিশাইয়া দিয়া, মর্ত্ত্যলীলা সমাপ্ত করিয়াছেন। ১৪৫৫ শকের মাঘমাসে পূর্ণিমা তিথিতে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রভুর তিরোভাবের দিন নির্ণীত হইয়াছে।

ভক্তিধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, ভাগবতশ্রেষ্ঠ প্রেমের অবতার গৌরসুন্দর ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার ভক্তদল ভগ্নহৃদয় হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় ইহলোকে বাস করিতে লাগিলেন। গদাধর সেই দিন হইতে শোকে দুঃখে, কষ্টে কোন নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, রূপ ও সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবের সংবাদ শ্রবণাবধি দারুণ শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; এবং অচিরকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। পুরুষোত্তমে গৌড়ীয় ভক্তদিগের শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন ও রথোৎসবের আনন্দোৎসব বন্ধ হইয়া গেল। বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার চারিদিকেই বিষাদের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

কিন্তু গৌরচরিত্রের অসাধারণ, স্নিগ্ধ ও মধুময় প্রভাব বিনষ্ট হইবার

* বহুদিন পূর্ব্বে লেখক পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থানকালীন তিনি কোন ভক্ত-সঙ্গে বৈষ্ণবদিগের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত শ্রীচৈতন্য দেবের প্রসঙ্গ করেন। প্রভুর তিরোভাবের প্রসঙ্গে তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে গদাধরের বালুকার উপর উক্ত কবিতাটির রেখাপাতের কথা শ্রবণ করেন।

নহে। তিনি যে ভক্তির অমৃতময় প্রভাব প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা চিরদিনই প্রবাহিত হইয়া নরনারীর প্রাণকে সুশীতল করিবে। তিনি ভগবদ্ভক্তির যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়; সে আদর্শ চিরদিনই মানবকে অনন্ত সৌন্দর্য্য, আনন্দ, প্রেম ও পুণ্যের দিকে ধাবিত করিবে।

গৌর! তোমার অমিয়মাখা জীবন-চরিত পাঠে সংশয়বাদী, জড়বাদী ও নাস্তিক বুঝিবে যে, জড়াতীত এক বস্তু আছেন,—যিনি নরনারীর চিত্তকে হরণ করিতে পারেন—মুগ্ধ করিতে পারেন। তোমার শ্রীকৃষ্ণ জগতের আদিকারণ, নিয়ন্তা, ও পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিদিগের কথায়, সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তবে তাঁহারা সেই আনন্দময় পুরুষের রূপ নিজ আত্মাতে দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। তুমি সেই পরম পুরুষকে স্বামিরূপে হৃদয়ে দর্শন করিয়া ভগবদ্ লীলার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গেলে। ভাগবত বর্ণিত ভক্তির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ সকল তোমাতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ভক্ত ভিন্ন কি ভগবৎ লীলা দেখিতে সমর্থ হয়? গৌর! তুমি সেই লীলা দেখাইয়া গিয়াছ। তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ। তোমার লীলা বড়ই মধুর ও মধুর হইতেও মধুরতর। তোমার অমিয়-মাখা চরিত পাঠে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইবে; অভক্ত হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইবে, ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিষয়-লালসা খর্ব্ব হইবে; এবং তুমি ভগবৎ-ভক্তি ও প্রেমের অবতার স্বরূপ হইয়া চিরদিনই মানব-চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে; আর, নরনারী তোমার মধুর লীলার কথা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে, মধুর প্রেম ও ভক্তির রসাস্বাদন করিয়া, জীবনকে সুশীতল ও মধুময় করিতে সমর্থ হইবে।

সমাপ্ত